সাহিত্যপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৯৫ জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৯

CUK-401925-1-P30654

সাহিত্যপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র ১৩৯৫
জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সম্পাদক
বিজলীপ্রভা সাহা

প্রধান পরিচালক
চিত্তরঞ্জন সাহা

P30654

নিয়মাবলী

সাহিত্যপত্র
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

প্রকাশকাল ঃ বৈশাখ-আষাঢ়, শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ এবং মাঘ-চৈত্র।

রচনা ঃ নবীন ও প্রবীণ লেখকদের উন্নতমানের রচনা ছাপা হয়। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা প্রয়োজন। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। প্রকাশিত লেখার জন্য সম্মানী দেওয়া হয়। লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ সম্পাদক সাহিত্যপত্র ৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০।

মূল্য ঃ প্রতি কপি বারো টাকা। বার্ষিক মূল্য ঃ আটচল্লিশ টাকা।

গ্রাহক ঃ বছরের যে-কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ঢাকা নগরীর গ্রাহককে বাহক মারফত পত্রিকা পাঠানো হয়। বাইরের গ্রাহককে ডাকে পাঠানো হয়।

এজেন্সী ঃ দশ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩০%। পঁচিশ কপির জন্য কমিশন ৩৫%। এজেন্টদের কাছে প্রতিনিধি মারফত অথবা ভি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

কারিগরি তথ্য

পত্রিকায় সমগ্র আকার	৮½"×৫½"
মুদ্রিত পৃষ্ঠার আকার	৬½"×৪"
ছাপার রঙ	কালো

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০.০০ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০.০০ টাকা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	২৫০০.০০ টাকা
তৃতীয় প্রচ্ছদ	২০০০.০০ টাকা
চতুর্থ প্রচ্ছদ	৩০০০.০০ টাকা

পুস্তকসংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস করা হয়।

কলিকাতা বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার

সম্পাদকীয় বক্তব্য

একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রতি বছর যে-জিজ্ঞাসাটা বড় হয়ে ওঠে এ বছরেও সেটিই আমাদের সামনে আসছে। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে আর কত দেরি? বাংলাদেশে বাংলার প্রচলন ঘটবে না, তবে ঘটবে কোথায়?—এ আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু ঘটছে না যে সে-এক বাস্তব সত্য।

না-ঘটার একাধিক মাত্রা রয়েছে। প্রথমত শিক্ষা এখানে এখনো তেমন বিস্তার লাভ করেনি। সেই যে শতকরা বিশ-বাইশ জন, সেখানেই রয়ে গেছি আমরা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও মোটেই এগুতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়েনি। তিন বছরের কোর্স পাস করতে পাঁচ-ছয় বছর লাগছে এখন। এদিকে আবার সাধারণভাবে শিক্ষার এবং বিশেষভাবে উচ্চ-শিক্ষার অবমূল্যায়ন ঘটেছে দেশে। জাগতিক সাফল্য এখন আর শিক্ষা-নির্ভর নয়, এমনকি আগে যতটা ছিলো ততটাও নয়।

এরই মধ্যে সত্য আবার এই যে, উচ্চ পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থের অত্যন্ত বেশি অভাব রয়ে গেছে। বই লেখার ব্যাপারে যোগ্য লোকদের আগ্রহ কম; কেননা বই লিখে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ে না, অর্থাগম তো হয়ই না। উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত বই যাঁরা লেখেন দেখা যাচ্ছে তাঁরা ইংরেজিতে লেখাই পছন্দ করেন। আসলে বাংলায় লেখার চেয়ে ইংরেজিতে লেখা সহজ—কেননা পেছনে থাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামনে থাকে অন্যের নিদর্শন। বাংলায় বই লেখা কঠিন, বাংলায় বই লেখার পরে সম্মান পাওয়া কঠিনতর। সম্মান বিদেশ থেকে আসে, প্রধানত। এমনকি দেশী পাঠকও মনে করতে পারেন যে লেখক বাংলায় লিখছেন, ইংরেজি জানেন না বলে। তদুপরি লেখকের নিজের মনের মধ্যে যে হীনমন্যতাবোধ প্রবেশ করবে না তাই বা নিশ্চয় করে বলি কি করে।

না, নতুন বই তেমন লেখা হচ্ছে না। অনুবাদও তেমন হচ্ছে না। ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলন কঠিন হয়ে পড়ছে।

এখন ইংরেজিকে সর্বস্তরে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার ফলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে যে, ইংরেজিতে যারা পরীক্ষায় উত্তর দিচ্ছে তারাই ভালো করছে। কেননা তারা আসচে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবার থেকে, এবং তারা সুযোগ পাবে

ইংরেজিতে লেখা পাঠ্য ও সহায়ক পুস্তকগুলো অনায়াসে পড়বার। বলা বাহুল্য সকল পর্যায়েই ইংরেজিতে লেখা বইয়ের সংখ্যা অধিক, বাংলা বইয়ের তুলনায়। আর উচ্চ পর্যায়ে তো শতকরা পঁচানব্বইটি বই-ই ইংরেজিতে লেখা। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার দাঁড়াবে এই যে, ধনী ও দরিদ্র এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে যেমন বিভাজন রয়েছে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষিত ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে। কে জানে বাংলার মাধ্যমে পড়িয়ে পিতামাতারা পরে ব্যথিত হবেন কিনা ভুল করে ফেলেছেন মনে করে। আমরা আশা করবো এমনটা ঘটবে না ; কিন্তু এমনটি ঘটবার যে আশঙ্কা রয়েছে তাকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

পাঠ্যপুস্তক তো বটেই, যে কোনো পুস্তকের জন্যই কাগজ একটি অপরিহার্য উপাদান। দেশে সাহিত্য ও শিক্ষার বিকাশ চাইবো অথচ কাগজের দামের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে প্রতিহত করবো না এ কোনো কাজের কথা হলো না। কাগজের এই সঙ্কট বিশেষভাবে দেখা দেয় বছরের শেষের দিকে যখন পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রিত হয়, এবং একুশে ফেব্রুয়ারি এগিয়ে আসতে থাকে। 'মুক্তধারা' আয়োজিত একুশের শ্রেষ্ঠ সংকলনগুলোকে পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানে সেদিন বক্তারা এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, সঙ্কলনের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, যার একটি কারণ কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা। বন্যা লোকের ক্রয়ক্ষমতা আগের চেয়ে হ্রাস করে দিয়ে গেছে, তার ওপর কাগজের দাম বাড়ায় বইয়ের দামও বেড়ে গেলে বই কি করে বের হবে, কেমন করে আমরা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবো, সে-বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে বৈ কি।

তবু আমাদের চেষ্টা চলবেই, জীবনকে সমৃদ্ধতর করার লক্ষ্যে। সেই চেষ্টায় আমরা যতই সংঘবদ্ধ হতে পারি ততই মঙ্গল।

প্রচ্ছদ-শিল্পী পরিচিতি

আলোচিত-সমালোচিত শিল্পী অধ্যক্ষ হাসি চক্রবর্তীকে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি বললে ভুল হবে না। জন্ম ১৯৪৮ সালে। পেশায় শিক্ষকতা। নেশায় শিল্পের সাথে বসবাস। সেজন্য একান্ত নিজের অস্তিত্বে, রক্তমাংসে, আবেগ-অনুভূতির রংতুলিতে, রেখা-অরেখায় ক্যানভাসে যে ভাষা তুলে ধরার ব্রত তা নিজের বলে বেড়ালেও, আসলে সময়ের যন্ত্রণা-প্রত্যাশার। তিনি নিজেই বলেন অন্তর্মুখিতা তাঁর জীবন-বোধের একটি অন্তরঙ্গ উপমা। সেখানে অন্ধকার মায়াবী রাত, নীরব নিসর্গ, গভীর গাঢ় নিঃশ্বাস, মায়াময় ছায়া-প্রতিচ্ছায়া ঘুরে বেড়ায় তুলিতে আঁধারে আলোতে। বিষণ্নতা, দুঃখকষ্ট, হতাশা একাকিত্বের ছোঁয়া এবং আত্ম-জিজ্ঞাসার তীব্র তাড়না ছবির মেজাজকে করে রাখে সজীব। কখনো কখনো শুধু রঙের ব্যঞ্জনায় কোন কোন ছবি বিমূর্ততার ছায়া ফেলে মনোলোকে। কখনো কখনো অধিক রঙের উজ্জ্বলতা-উচ্ছলতা আচ্ছন্ন করে তোলে বিষয়কে। রঙের ছটা ব্যবহারে সাহসী হলেও সার্থকতা খুঁজতে হয় আত্মসমালোচনায়—শিল্পীকেই। হয় তো ক্ষণিকের জন্য হারাতে ভালবাসেন রোমান্টিকতায়। নিজস্ব বলয়ে গুটিয়ে থাকলেও জীবনী-শক্তির উৎস খোঁজেন সাহসিকতায়। নিজেকে আবিষ্কার করতে চান আলাদাভাবে অন্য এক বিস্ময়ে। বিস্ময় সৃষ্টি করতে চান রেখায় রেখায় বা ড্রইং-এ। অন্তর্মুখী মানুষের স্বভাবানুযায়ী আঁকতে থাকেন অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। 'Less is More' বা 'সামান্যই-অসামান্য' যেন তাঁর শেষ-সীমানা, রেখা-চিত্রের। শিল্পী হাসি চক্রবর্তীর রেখাচিত্রের অঙ্গীকার সেখানে। শিল্পীর বর্তমান ছবিটি তারই প্রতিচ্ছবি। একান্ত নির্জনতায় বসবাস করেও জীবনের উৎস খোঁজেন তিনি শক্তিতে। তাই হাতি আসে, আসে ঘোড়া, আসে লাশ, আশাবাদী মানুষের আত্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে। শিল্পী তাদেরই একজন।

মোস্তফা হারুন কুদ্দুস (হালী)

কলিকাতা বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

ব্যক্তিস্বাধীনতার কল্পকথা ও অবক্ষয়ী অপদর্শন ৫৮৩ যতীন সরকার
পাখিভাষার নৈর্ব্যক্তিকতা ৫৯৭ আবু জোবের
ঝড়-ঝঞ্ঝায় যাত্রা ৬০২ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

কবিতা

আমার পুত্রকে ৬০৭ খোন্দকার আশরাফ হোসেন
দশটি কাব্যিকা ৬০৯ সৈয়দ হায়দার
থাকতে পারি ৬১১ সাইফুল্লাহ্ খালেদ
সম্ভবত সূর্যাস্ত হবে ৬১১ মামুন নেসার য়াহমাদ
কোরিয়ার কবিতা ৬১৪ লী সুল জু'র কবিতা
অনুবাদ সমরেশ দেবনাথ

গল্প

বিত্তহীন বৃত্তে ৬১৫ হাবিব রহমান
সেই হুইল চেয়ার ৬২১ রফিকুর রশীদ

উপন্যাস

অজগর ৬২৫ হরিপদ দত্ত

অতীত

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও রবীন্দ্রনাথ ৬৩৬ ফজলুল হক

স্মরণ

আমৃত্যু আপসহীন কবি ৬৪১ আইয়ুব হোসেন

আলোকপাত

সাম্রাজ্যবাদী পীড়নের আর-এক রূপ ৬৪৭ বিনোদ দাশগুপ্ত

সাক্ষাৎকার

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সাথে ৬৬২ অনুবাদ আলম খোরশেদ

চলচ্চিত্র

হালের ছবি ৬৬৮ মনজুরুল আজিজ পলাশ

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

প্রয়োজন ভাষা-আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ইতিহাস ৬৭১ আবদুল হালিম

বিতর্ক

কবি একজন ক্ষতিকর ব্যক্তি ৬৮১ শহিদুজ্জামান

গ্রন্থ-সমালোচনা

সত্যের মুখোমুখি ৬৮৮ সৈয়দ আমীরুল ইসলাম

নির্বিরোধ নতুন পৃথিবীর জন্য ৬৯২ ফজলুর রহমান

খলিল জিবরানের মুক্তচিন্তা ৬৯৬ হেলাল আহমেদ

দায়বদ্ধ কবিতা ৭০০ শামসুল আরেফিন

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত ৭০৫ শান্তনু কায়সার

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ হাসি চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-শিল্পী পরিচিতি ঃ মোস্তাফা হারুন কুদ্দুস (হালী)

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

ব্যক্তিস্বাধীনতার কল্পকথা ও অবক্ষয়ী অপদর্শন

যতীন সরকার

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই, সেখানে ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের একেকটি নাটবল্টুর বেশি কিছু নয়, সেখানে রাষ্ট্র হৃদয়হীন একনায়ক মাত্র, সেই দৈত্যতুল্য একনায়কের নির্মম ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই বলিপ্রদত্ত ; সমাজতন্ত্রের এই বদ্ধ দুনিয়ার বাইরে আছে এক 'মুক্তবিশ্ব', যেখানে রাষ্ট্র আছে ব্যক্তির সার্বভৌমত্বকে নিশ্চিত করে তোলার জন্য, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য রাষ্ট্রনায়করা বসে আছেন গণতন্ত্রের যাদুদন্ড হাতে নিয়ে।

—এ-রকম অভিমত-পোষণকারী চিন্তাবিদ্‌রা 'মুক্তবিশ্বে'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। এঁরা-এঁদের চিন্তার অমৃতফল খাইয়ে প্রতিনিয়ত সঞ্জীবিত করে রাখেন ওই বিশ্বের রাষ্ট্রতরণীর মাঝিমাল্লাদের ; বিনিময়ে মাঝিমাল্লারাই দায়িত্ব নেন এঁদের ভরণ, পোষণ, রক্ষণ ও সম্মানিতকরণের। মুক্তবিশ্বে'র মুক্ত বাতাসেই শুধু নয়, সমাজতন্ত্রের দৈত্যপুরী (!)-তেও যখন সোলঝেনিৎসিন-শাখারভের মতো প্রহ্লাদদের জন্ম হতে দেখেন, তখন তো এঁরা আনন্দে একেবারে মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়েন। সেই আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের নগরে-বন্দরেও ; সেখানকার চিন্তাবিদ্‌দের চিন্তা রসসিক্ত হতে থাকে আটলান্টিকের ওপারের ধনকুবের প্রভুদের ঘন্টাবাদনের সঙ্গে সঙ্গেই।

আবার আশির দশকের শেষভাগে যখন পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের হাওয়া বইছে সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার প্রধান দেশটিতে, তখন তো সেদেশের রাষ্ট্রনেতাদের বক্তব্যের প্রকৃত ও বিকৃত উদ্ধৃতি দিয়েই প্রমাণ করা সম্ভব হচ্ছে যে, অন্তত এতাবৎকাল সমাজতন্ত্রী দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার বাষ্পমাত্রও ছিল না।

সমাজতন্ত্রী দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল কিংবা আছে কিনা, এ নিয়ে কোনো বিচারেই প্রবৃত্ত হতে চাই না এখানে। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দর্শন স্বীকৃত কি না,—আপাতত তা-ও আমাদের বিবেচ্য নয়। আমাদের অনুসন্ধান গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ঢক্কানিনাদকারী দেশগুলোতে অনুসৃত দর্শন সম্পর্কে। আমরা জানতে চাই ঃ আসলেই কি ধনতন্ত্রী দুনিয়ায় ব্যক্তির স্বাধীনতার স্বীকৃতি আছে ? কিংবা তার চেয়েও বড়ো কথা, ধনতন্ত্রের

তাত্ত্বিক ও দার্শনিকেরা কি ব্যক্তির স্বাধীনতা আদৌ সম্ভব বলে মনে করেন? ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার কোনো দার্শনিক রক্ষাকবচ কি আছে তাঁদের হাতে?

সত্য বটে, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির সত্তা ছিল প্রথা ও বিশ্বাসের অচলায়তনে বন্দী, সে সমাজে ভূপতিরাই ছিলেন নরপতি, সাধারণ কোনো নরের স্ব-অধীনতার প্রশ্নই ছিল সেখানে অবান্তর। গুরু-পুরোহিতরাই ছিলেন সে-সমাজের আসল দার্শনিক, ভূপতি ও নরপতিদের ঐশ্বরিক দর্শনের লক্ষ্যবিন্দু, সে-দর্শনে ব্যক্তি-নরের অকিঞ্চিৎকরতা তথা চির পরাধীনতারই ছিল উচ্চকন্ঠ ঘোষণা।

সেই ঘোষণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে উচ্চতর কন্ঠে একদিন অন্যতর ঘোষণা জারি করেছিলেন যাঁরা, তাঁরাই নতুন যুগের দার্শনিক। সেই যুগ ধনতন্ত্রের উন্মেষ যুগ। উন্মেষ যুগের ধনতন্ত্র ছিল অত্যন্ত তাজা ও বীর্যবান্। তরুণ ধনতন্ত্র সেদিন স্থবির সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল। সামন্ততন্ত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিরোধী অচলায়তন ভেঙে চুরমার করা ছিল তার লক্ষ্য, ব্যক্তির স্বাধীনতার শ্লোগানই ছিল তার সংগ্রামের প্রেরণা। 'প্রতিটি মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্ম নেয়, কিন্তু পরে সর্বক্ষেত্রে হয় অধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী'—ধনতন্ত্রী বিপ্লবের দার্শনিক রুশোর এই উচ্চারণ ব্যক্তির স্বাধীনতার বীজমন্ত্র হয়ে দেখা দেয় সেদিন। 'তোমার সব কথার সঙ্গেই হয়তো আমি ভিন্নমত পোষণ করি, কিন্তু তোমার প্রতিটি বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামে আমি প্রস্তুত'—ভোলটেয়ারের এই ঘোষণা ব্যক্তির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে করে তোলে অগ্নিগর্ভ। রাজা ও রাজপারিষদদল, ভূস্বামী ও তার তাঁবেদারবৃন্দ, পুরোহিত ও তার অন্ধ অনুসারীকুল—এক কথায় ব্যক্তিমানুষের অধিকারকে নির্মম আইনের, দুঃসহ শাসনের, নির্বোধ নিষেধের এবং দুঃশীল প্রথার নিগড়ে আটকে রাখে যে-সব শক্তি, সেই সব শক্তিকে উৎখাত করার লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছিল ধনতন্ত্রী বিপ্লবের অভিযাত্রা। কিন্তু হায়, সে-অভিযাত্রা মঞ্জিল স্পর্শ করতে না করতেই অভিযাত্রী দলের নেতৃত্বের স্বভাবে লাগলো উল্টো হাওয়া। ব্যক্তি-স্বাধীনতার শ্লোগান অবশ্যি ঠিকই রয়ে গেলো। কিন্তু কেবল শ্লোগানই। সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটানোর জন্যই বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের দলকে সাথে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন ধনতন্ত্রী বিপ্লবের প্রগল্‌ভ নেতারা। যাদের তাঁরা সাথে নিয়েছিলেন, তাঁদের ভেতর স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগানোর প্রয়োজন পড়েছিল নেতাদের নিজেদেরই স্বার্থে। কিন্তু যে-মুহূর্তে তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলো, অর্থাৎ সামন্তদের বদলে ধনিকদের হাতে এসে গেলো ক্ষমতার মসনদ, সে-মুহূর্ত থেকেই বঞ্চিত মানুষদের স্বাধীনতার

স্বপ্ন বিপজ্জনক হয়ে উঠলো তাঁদের জন্য। খোঁজ পড়লো সে-স্বপ্নকে ভোঁতা করে দেয়ার মন্ত্র ও মন্ত্রোচ্চারণকারী পুরোহিতদের। খোঁজ পাওয়া গেলো অচিরেই। আগেকার কালের পুরোহিতরা সকল মন্ত্র উচ্চারণ করতেন ঈশ্বরের নাম নিয়ে ; বলতেন, ঈশ্বরই যেমন নাচান তেমনি নাচে সকলে, কাজেই কোনো মানুষেরই স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কিন্তু নতুন কালের পুরোহিত অন্যরকম। এই অন্যরকম পুরোহিতদেরই অন্যতম জার্মান দার্শনিক ফ্রিড্রিক নীৎসে। মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে প্রথমেই ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করলেন তিনি। ঈশ্বরের মৃত্যুর পর তাহলে তাঁর এই দুনিয়াটার পরিচালক হবে কে? কেন? মানুষ। তবে, রাম-শ্যাম, রহিম-করিম, টম-ডিকের মতো সাধারণ গড়-পড়তা কোনো মানুষ নয়। মৃত ঈশ্বরের শূন্য আসন দখল করে নিতে পারে কেবল উঁচু ধরনের কোনো মানুষ, অসাধারণ অ-সামান্য মানুষ, অতিমানুষ—সুপারম্যান।

সুপারম্যানের স্তুতিকারক ফ্রিড্রিক নীৎসের এই দর্শন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না অবশ্যই। তবে সে স্বাধীনতা সব ব্যক্তির নেই। প্রকৃতির নিজের মধ্যেই রয়ে গেছে বৈষম্যের স্বীকৃতি, প্রাণীজগতের সর্বত্রই চলছে বাঁচার সংগ্রাম। বাঁচার সংগ্রাম তো চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় করে ক্ষমতা-বিস্তারের ইচ্ছাকে। প্রবল, প্রচণ্ড, দুর্দম সে-ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার বলে জয়লক্ষ্মী করতলগত হয় যার, সেই হয় প্রভু, সেই তো লাভ করে স্বাধীনতা। শুধু স্বাধীনতা নয়, অন্যকে অধিকার করার ক্ষমতা এবং অধিকারও। তাই সমাজে একই সঙ্গে শোষক ও শোষিতের কিংবা প্রভু ও দাসের অস্তিত্ব থাকাটা একান্তই সহজ, স্বাভাবিক, প্রকৃতিসঙ্গত বিধান। একারণেই সমাজের সকলের স্বাধীনতা থাকে না, থাকে কেবল বাঁচার সংগ্রামে বিজয়ী প্রভুর, যিনি বিজয়ের পুরস্কার হিসেবেই লাভ করেন শাসনের ও শোষণের স্বাধীনতা। বিজিতেরও ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে অবশ্যি ; সে-স্বাধীনতা বিজয়ী প্রভুর কাছে নত হওয়ার, শাসিত হওয়ার, শোষিত হওয়ার! যুক্তিবাদের উদারতাবাদের কিংবা মানবতাবাদের মতো ভাবধারার কাছে নতিস্বীকার করতে পারেন না কোনো বিজয়ী বীর। এ-সব মানবীয় দুর্বলতাকেই যদি প্রশ্রয় দেন, তবে আর অতিমানব হবেন কী করে তিনি? অতিমানবকে হতে হবে সবল, প্রবল, নির্মম, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন!

সকলেই জানেন, নীৎসে-কথিত এই অতিমানবের দর্শন একদিন ফ্যাসিবাদকে শক্তি যুগিয়েছিল। ধনতন্ত্র যেদিন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েও নিজেকে রক্ষা করতে পারে নি, উল্টে বরং তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতিগুলো প্রবল হয়ে সংকটকে তীব্র করে তোলে, এবং এ-ভাবেই সমাজ-বিপ্লব হয়ে ওঠে অত্যাসন্ন, তখনই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে সে-

বিপ্লবকে রোধ করার অপচেষ্টায়। নীৎসের অতিমানবের আদর্শেরই মূর্ত বিগ্রহরূপে দেখা দেয় হিটলার, যে-হিটলারের ভেতর মানবিকতার লেশমাত্রও নেই, যে আসলে একটা বর্বর মানবেতর প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্যি হিটলার-মুসোলিনী তোজোর অতি-মানবিক তথা দানবিক নেতৃত্বও ফ্যাসিবাদকে রক্ষা করতে পারে নি। ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত পতন যদিও ঘটে নি আজও, তবু ধনতন্ত্রী দুনিয়াও নীৎসের দর্শনকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে কোনো অতিমানবের অধীনতাকে মেনে নেয় নি।

তাই বলে মুসোলিনীয় বা হিটলারীয় ফ্যাসিবাদোত্তর এ-কালীন ধনতন্ত্রও ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতায় স্ব-প্রতিষ্ঠ করতে পারে নি, উদ্ভাবন করতে পারে নি ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো বলিষ্ঠ দর্শনও। তার বদলে বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে এমন সব অপদর্শনের, যে-সবের মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা তো দূরের কথা, কোনো আশ্রয়ের বা আশ্বাসেরও ইঙ্গিত নেই।

যেমন, ফ্রয়েডীয় দর্শন। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড নামক মনোচিকিৎসকের মতবাদ যদিও এ্যাকাডেমিক অর্থে কোনো প্রণালীবদ্ধ দর্শন নয়, এবং এর জন্মও হয় নি একেবারে হাল আমলে, তবু একালের পুঁজিবাদী চিন্তাজগতে এর প্রভাব সর্বাতিশয়ী। দর্শন কিংবা মনোবিদ্যার প্রাথমিক সূত্রও যার জানা নেই, সেও দু' চারটি ফ্রয়েডীয় বুলি বলে যেতে পারে অনায়াসে অবলীলায়। মুক্তবিশ্বের গরিষ্ঠ সংখ্যক দার্শনিকদের চিন্তাতেই ফ্রয়েডবাদের ছায়া পড়েছে কখনো প্রত্যক্ষে কখনো পরোক্ষে।

সেই ফ্রয়েডবাদ ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে কী বলে?

স্বাধীনতার সঙ্গে সচেতনতার সম্পর্ক একান্ত অপরিহার্য। কোনো মানুষ যদি পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে কাজ না-করতে পারে, যদি কাজ করে সম্মোহিত বা ভরগ্রস্ত হয়ে, তবে তাকে আমরা নিশ্চয়ই 'স্বাধীন' মানুষ বলি না। উন্মাদ বা মাতালের কার্যকলাপকেও স্বাধীন মানুষের কার্যকলাপ বলে আখ্যা দেয়া চলে না অবশ্যই। ফ্রয়েডবাদ কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত মানুষকেই এ-রকম ভরগ্রস্ত বা মাতালের সঙ্গে এক কাতারভুক্ত করে ফেলেছে। ফ্রয়েড আমাদের জানিয়েছেন ঃ প্রতিটি মানুষের মনের তিনটি প্রকোষ্ঠ,—(১) নির্জ্ঞান বা অচেতন, (২) অবচেতন ও (৩) সংজ্ঞান বা চেতন ; এর মধ্যে নির্জ্ঞানের দখলে মনের সাড়ে পনেরো আনা, সংজ্ঞান বা চেতন মন চলে নির্জ্ঞানের অমোঘ নির্দেশে। অর্থাৎ কোনো মানুষ সচেতন প্রয়াসে কিছুই করে না—করবার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। মানুষ ভাবেঃ সে বুঝি যুক্তি-বুদ্ধি খাটিয়ে বিচার-বিবেচনা করে তার সব কাজ করে যাচ্ছে। ফ্রয়েডবাদ অট্টহাস্য করে মানুষকে জানিয়ে দিয়ে যায়ঃ ভুল, সবই ভুল ; তুমি যাকে ভাবছো তোমার সচেতন ইচ্ছার কাজ বলে, সে

তো আসলে তোমাকে ঘাড়ে ধরিয়ে করিয়ে নিচ্ছে তোমার নির্জ্ঞান মন। তুমি তো নির্জ্ঞানের হাতে বন্দী নিতান্ত অসহায় একজন জীবমাত্র,—জীব না বলে সপ্রাণ ও সচল যন্ত্র বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। যন্ত্রের আবার স্বাধীনতা কী? মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা একেবারেই এক কল্পকথা। প্রতিটি মানুষের নির্জ্ঞান মন তাকে দিয়ে 'লিবিডো' নামক এক অশরীরী দানবের সেবা করিয়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। লিবিডোর সাধারণ অর্থ 'যৌনতা' হলেও এ-যৌনতা মোটেই সাধারণ নয়, নবজাত শিশু থেকে মরণ-পথযাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই এর অধীন। এ-কারণেই ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্ব 'সর্বরতিবাদ' (Pan-Sexualism) আখ্যাও পেয়ে আসছে। ফ্রয়েডের বিদ্রোহী শিষ্যদের কেউ কেউ এই সর্বরতিবাদের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু অমান্য করেন নি তাঁর নির্জ্ঞান-তত্ত্বকে। যেমন—ইয়ুং ব্যক্তি-নির্জ্ঞানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সমষ্টি-নির্জ্ঞানকে; এ্যাড্‌লার নির্জ্ঞানের খাদ্য হিসেবে দেখেছেন যৌনতার বদলে ক্ষমতালিপ্সাকে। অর্থাৎ ফ্রয়েডের মতো এ্যাড্‌লার বা ইয়ুংও ব্যক্তিকে নির্জ্ঞানেরই দাস করে রেখেছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো দর্শনেরই তাঁরা জন্ম দিতে পারেন নি।

পারেন নি একেবারে হাল আমলের নয়া-ফ্রয়েডিয়ানরাও। যেমন—কারেন হর্ণি ও এরিক ফ্রম।

ফ্রয়েডের 'সর্বরতিবাদের সমালোচনা করেছেন হর্ণি। যুক্তি-বিচারের নয়, সহজাত প্রবৃত্তির অধীন প্রতিটি মানুষ—ফ্রয়েডীয় মতবাদের এটিই সাধারণ কথা। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে, ফ্রয়েডের মতে, কামেচ্ছা ও মৃত্যু-ইচ্ছা—এ দুটোই প্রধান। করেন হর্ণি ফ্রয়েডীয় এই প্রকল্পকে অস্বীকার করলেন, কিন্তু শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখলেন নির্জ্ঞান-তত্ত্বকে। হর্ণি বললেন,—মানুষ মরতে চায় না, সে চায় নিরাপত্তা ও পরিতৃপ্তি, এবং মানুষের নির্জ্ঞান মন সেদিকেই তাকে চালিত করে; যুক্তি-বিচার দিয়ে মানুষ চলে না, চলে আবেগ বা প্রক্ষোভের তাড়নায়,—মানুষ মূলত প্রক্ষোভ-তাড়িত জীব। প্রক্ষোভ-তাড়িত মানুষ কি স্ব-অধীন হতে পারে কখনো? অর্থাৎ নয়া-ফ্রয়েডিয়ান কারেন হর্ণিও ব্যক্তির স্বাধীনতার কোনো দর্শন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলেন।

অনুরূপ ব্যর্থতা এরিক ফ্রমেরও। ধনতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থার নির্মম সমালোচনা করেছেন ফ্রম। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেন, ধনতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতা পুরোপুরিই হরণ করে নেয়। তিনি জানেনঃ ধনতন্ত্রী সমাজে মালিক বা শ্রমিক কেউই স্বাধীন নয়। মালিক বিত্তের বন্ধনে বাঁধা; যে-যন্ত্রসভ্যতার সে পত্তন করেছে, সেখানে সে নিজেই যন্ত্রের একটি প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে। যন্ত্রের এ-প্রত্যঙ্গ রূপে শ্রমিককে শোষণ করতে প্রতিটি

মালিক বাধ্য, কারণ এ-শোষণক্রিয়ার উপরই নিহিত তার অস্তিত্ব ; কাজেই মালিকও আসলে নিজের ইচ্ছামতো চলার অধিকারী নয়, অর্থাৎ সে-ও স্বাধীনতা-বঞ্চিত। অন্যদিকে শ্রমিক যখন সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করে শোষণ-মুক্তির জন্য, এরিক ফ্রম বলেন, তখন সে-ও কোনো মতেই স্বাধীন নয়। কারণ, প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর চিন্তাচেতনায় অন্য সব শ্রেণী বাধ্যকরীভাবে প্রভাবিত। শ্রমিকও চায় মালিকের মতোই বিত্তভোগী হতে, এবং বিত্ত দিয়েই ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটাতে। কাজেই, বোঝা যায়, ধনতন্ত্রের সমালোচনা করেও এরিক ফ্রম বিপ্লবী বনে যান নি, মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার দর্শনের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন নি! কার্ল মার্কস যে শ্রমিক শ্রেণীকে ভেবেছিলেন বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি বলে, এরিক ফ্রমের মতে, এটি একটি মহাভ্রান্তি। মার্কস মানুষকে যুক্তিনির্ভর জীব হিসাবে দেখেছিলেন। অন্য সকল ফ্রয়েডপন্থীর মতো ফ্রমের অবস্থানও কিন্তু মার্কসের বিপরীতেই। তাঁরও মতে, মানুষ মোটেই যুক্তিনির্ভর নয়, নির্জ্ঞানের অমোঘ নির্দেশেই সে পরিচালিত। 'মানুষমাত্রই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন'—ফ্রয়েডীয় এই প্রকল্পকে কিঞ্চিৎ শোধন করে নিয়ে ফ্রম বলতে চান যে, ধনতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থার অন্তরালবর্তী এক অদৃশ্য শক্তির অপরিহার্য প্রভাবের মুখে কোনো মানুষেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতা নেই। এ-অবস্থায় মানুষের নির্জ্ঞান মন তাকে সাধারণভাবে সমাজ-বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য করে, অথবা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত করায়। মার্কস সাধারণভাবে মানুষকে সুস্থ মানসিকতা-সম্পন্ন উন্নত প্রাণী হিসেবে দেখেছিলেন, কিন্তু ফ্রম দেখলেন,—সমাজের সব মানুষই মূলত নিউরোটিক। এই নির্জ্ঞান-চালিত নিউরোটিক মানুষ অবশ্যই স্বাধীন নয়, স্বাধীনভাবে যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনো সমাজ-বিপ্লব ঘটানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়!

পুরনো বা নয়া-ফ্রয়েডিয়ানদের মতো অন্য দার্শনিকেরা অবশ্য মানুষকে নির্জ্ঞানের দাস রূপে দেখেন নি। কিন্তু অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের সব দর্শনই মানুষের স্বাধীনতার বাণী শোনাতে অক্ষমতা দেখিয়েছে। ব্যক্তিকে সবকিছুর উপরে স্থাপন করে চরম ব্যক্তিস্বাধীনতার কোলাহল সৃষ্টি করেছে যে-অস্তিত্ববাদী দর্শন, শেষ বিচারে সে-ও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে এক করুণ পরিণতির পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। অস্তিত্ববাদ যদিও মানুষকে নির্জ্ঞান-তাড়িত জীব বলে আখ্যায়িত করে নি, কিংবা বলে নি যে মানুষ মূলতই হিংস্র ও অসৎ, তবু এ-দর্শনও রঙ-বেরঙের ফ্রয়েডিয়ানদের মতোই অ-যুক্তিবাদী। শুধু অ-যুক্তিবাদী নয়, একান্তভাবেই যুক্তি-বিচারের শত্রু, এবং শত্রু বিজ্ঞানেরও। বিজ্ঞানের শত্রু বলেই বস্তুনিষ্ঠার চেয়ে আত্মমুখী

(সাবজেকটিভ) চিন্তা-চেতনা অস্তিত্ববাদের কাজে বেশি গুরুত্ববহ। ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও নিরীশ্বরবাদী—এই দু'ধরনের অস্তিত্ববাদীর চিন্তায় পার্থক্য অবশ্যই আছে, কিন্তু সে-পার্থক্য মৌলিক নয় মোটেই। অস্তিত্ববাদী দর্শনের পূর্বসূরী রূপে অভিহিত 'জীবনের দর্শন' নামক যে-মতবাদ, যার উদ্ভব ঘটেছিল উনিশ শতকের ইউরোপে, তাতে জীবনের কোনো বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি,—এমনকি জীবনের কোনো বিজ্ঞান থাকতে পারে বলেই এ-মতবাদের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন না। বিজ্ঞান-ভাবনার বিপরীতে এঁদের কাছে জীবন হয়ে যায় অজ্ঞেয় রহস্যময়তায় পূর্ণ, এঁদের মতে জীবনের স্বরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় কিছুতেই, সহজাত ইন্টুইশনই নাকি জীবনকে উপলব্ধি করার একমাত্র পাথেয়। ইন্টুইশন তো আর মানুষের পক্ষে সমষ্টিগতভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তাই জীবনের উপলব্ধির জন্য ঢুকতে হবে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনার বিবরে। তাই, 'জীবনের দর্শনে'র উত্তরসূরী অস্তিত্ববাদীরাও ব্যক্তিগত ভাবনারই বিবরগামী। সে-বিবর থেকে তাদের মুক্তিলাভ অসম্ভব। ব্যক্তির অস্তিত্বকেই চূড়ান্ত সত্য রূপে ঘোষণা করে বলে মনে হতে পারে যে, অস্তিত্ববাদ বুঝি ব্যক্তিস্বাধীনতারই দর্শন। কিন্তু, কেমন ধরনের সে-স্বাধীনতা?

অস্তিত্ববাদের যিনি সবচেয়ে প্রবল প্রবক্তা, সেই জ্যাঁ পল সার্ত্রে তো ফ্রেড্রিক নীৎসের মতোই মনে করেন যে ঈশ্বর মৃত। মৃত ঈশ্বরের স্থান দখল করেছে যে-ব্যক্তিমানুষ, তার স্বাধীনতা তো একেবারে অবাধ। কারণ সে তার কাজের জন্য কারো কাজে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নয়, কারো প্রতি তার কোনো কর্তব্য নেই, কেউ কোনো দায়িত্বও দাবি করতে পারে না তার কাছে, তার সব দায়-দায়িত্ব একমাত্র নিজের প্রতি। সমস্ত সমাজ-সংসারের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বিদ্রোহী, বিদ্রোহী রূপেই সে স্বাধীন।

কিন্তু, এই বিদ্রোহী স্বাধীনতার স্বরূপ কী? অস্তিত্ববাদী বিদ্রোহ কি মানুষকে মানবীয়তার কোনো নতুন মাত্রা দিতে পেরেছে? কিংবা পেরেছে কি তাকে আত্মগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত করতে?

পারে নি যে, সার্ত্রের নিজের লেখাতেই তার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। তাঁর মতেঃ সুখস্পৃহা, মৃত্যুভয়, নৈঃসঙ্গ-চেতনা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা কিংবা জীবনকে অর্থহীন-মনে-হওয়া,—এ সব থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন এ-সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে নি, তেমনি পারে নি বা পারবে না সমাজতন্ত্রও। সার্ত্রের এই নৈরাশ্য থেকে তো মনে হয়, মানব-প্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্বে তিনিও বিশ্বাসী। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানভিত্তিক প্রবৃত্তিতত্ত্বের প্রবক্তা না-হয়েও তিনি মানুষকে আসলে প্রবৃত্তির দাসরূপেই উপস্থাপিত করেন, তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শন

ব্যক্তির স্বাধীনতার ঢক্কানিনাদ তুলেও অসহায়ত্ব ছাড়া ব্যক্তিকে আর কিছুই দিতে পারে নি। অস্তিত্ববাদী আলবেয়ার কামুকে মানবতার বলিষ্ঠ সমর্থক বলে প্রচার করেন যাঁরা, তাঁরাও কি কামুর রচনা থেকে মানুষের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতার কোনো তত্ত্ব উদ্ধার করতে পেরেছেন? কামুর 'বহিরাগত' নায়কদের 'নির্লিপ্ত' আচরণ কি ব্যক্তিস্বাধীনতার খুব উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে? 'মিথ অব সিসিফাস'-এ তিনি যখন আত্মহত্যার মতো আত্মরক্ষা তথা বেঁচে থাকাকেও একই রকম যুক্তিহীন বলে প্রতিপাদন করতে চান, তখন ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে যে-বোধের পরিচয় রাখেন, সে-বোধকে সুস্থ বলে মেনে নেয়া কি সুস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব?

অর্থাৎ নামে অস্তিত্ববাদ হয়েও এ-দর্শন কাজে যা করে তা নিখিল নাস্তির নান্দীপাঠ ছাড়া আর কিছুই নয়। না মেনে উপায় নেইঃ নীৎসের অতিমানবের দর্শন, ফ্রয়েড ও নয়া-ফ্রয়েডবাদীদের নানা রঙের নির্জ্ঞান-তত্ত্বীয় দর্শন, কিংবা ঈশ্বর বা নিরীশ্বরপন্থী সব রকমের অস্তিত্ববাদী দর্শন—সবই আসলে নিতান্ত অপদর্শন। এ-রকম সব অপদর্শনই অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের উপজ। পুঁজিবাদের নিগড়ে বন্দী দার্শনিকরা আত্মরতিতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, ভাবেন—এই বুঝি স্বাধীনতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি।

অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের তাত্ত্বিকতার একদিকে আছে একান্ত আত্মমুখী (সাবজেক্টিভ) ভাববাদ, অন্যদিকে যান্ত্রিক বস্তুবাদ। একদিকে আত্মসর্বস্বতা, অন্যদিকে বস্তুসর্বস্বতা। একদিকে ভাববাদী রহস্যময়তা, অন্যদিকে জড়বাদী যান্ত্রিকতা। নীৎসেপন্থী অতিমানববাদ, পুরনো বা নয়া ফ্রয়েডপন্থী নির্জ্ঞান-নির্ভর প্রবৃত্তিবাদ এবং জাসপাস,-হাইডেগার-সার্ত্রের সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসর্বস্ব অস্তিত্ববাদ—এ-সব মূলত ও স্বরূপত ভাববাদই। নানাভাবে এরা মনকেই সার্বভৌম করে তুলে ভাববাদী আত্মকণ্ডুয়ন চালিয়ে যাচ্ছে যখন, তখনই মন ও ভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ভয়াবহ এক যান্ত্রিক জড়বাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে 'আচরণবাদ-' (বিহেভিয়ারিজ্‌ম) নাম নিয়ে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে আচরণবাদের উদ্ভব ঘটে মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়াটসনের হাতে। আমরা যাকে বলি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ওয়াটসন তাকে বলেন দেহ তথা স্নায়ুমন্ডলীর ক্রিয়া বা আচরণ। চেতনা আর আচরণ—দুই-ই আচরণবাদীর দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন। কোনো জীবন্ত মানুষের শরীরে আলপিন ফুটিয়ে দিলে কিংবা আগুনের ছেঁকা লাগালে সে-মানুষটি কী ধরনের আচরণ করবে,—সে তো আমাদের সবারই জানা। তার মনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, ভালো লাগা বা মন্দ লাগা, নৈতিকতা বা অনৈতিকতা—কিছুই তার আচরণের

ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। বাইরের কোনো ঘটনার উদ্দীপক (স্টিমুলাস) এবং শরীরের ভিতরে তার সাড়া (রেসপন্স)—এই নিয়েই সকল প্রাণীর (সেরা প্রাণী মানুষেরও) আচরণ। এই আচরণই সবকিছু, আচরণের বাইরে মানবিক ক্রিয়া বলে কিছুই নেই। মন-টন সব ফালতু। ফ্রয়েড-পন্থীদের মন আর তার প্রকোষ্ঠ বিভাগ, নির্জ্ঞানের খেলা আর লিবিডোর লীলা,—আচরণবাদীর এক কোপেই সব খতম। তাই বলে আচরণবাদও কিন্তু মানুষকে স্বাধীন করে দিল না। তাকে আরো বেশি করে পরিবেশ ও পরিপার্শ্বের দাস বানিয়ে দিল বরং। তাই নয় শুধু। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তুলে দিল শক্তিশালী শাসক-শোষকের হাতে। আচরণ-বাদ যাঁর হাতে চূড়ান্ত পরিণতিতে উন্নীত, সেই বি. এফ. স্কিনার তো চান এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির আচরণ হবে নিয়ন্ত্রিত ; নিয়ন্ত্রক হবেন একজন ক্ষমতাশালী সর্বাধিনায়ক, যিনি একই সঙ্গে হবেন মহৎপ্রাণ ও নির্মম।

এই নির্মম মহৎপ্রাণ অধিনায়ক (benevolent tyrant) প্রতিটি ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এমন উদ্দীপকের ব্যবস্থা করবেন, যাতে ব্যক্তি তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে। ব্যক্তির যখন কোনো স্বকীয়তা থাকবে না, তখনই সে একটি পরিকল্পিত সমাজের উপ-যোগী হয়ে উঠবে। তেমন পরিকল্পিত সমাজে ব্যক্তি তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া আচরণই করবে, আত্মবিকাশের বা শোষণ-মুক্তির স্বাধীনতার জন্য হাঁসফাঁস করবে না, বেয়াদবি করবে না, কোনো বিরূপ আচরণ করবে না, সমাজে কোনো বিপর্যয়ও ঘটাবে না। যে-পদ্ধতিতে ব্যক্তির আচরণ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, মার্কিন মুল্লুকের হার্ভার্ডের মনস্তত্ত্ববিদ্ স্কিনার তার নাম দিয়েছেন,—'স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় পরাবর্ত' (operant conditioning)। অস্তিত্ববাদের প্রবক্তাবৃন্দ—যেমন সার্ত্রে ও কামু—যেরূপ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁদের দর্শনের মর্মকথাকে প্রকাশ করেন বি. এফ. স্কিনারও সেরূপ চেষ্টা করেছেন তাঁর আচরণবাদী অপারেন্ট কন্ডিশনিং তত্ত্বকে একটি উপন্যাসের আধারে রূপময় করে তুলতে। ১৯৪৮ সনে স্কিনারের একটি উপন্যাস বেরোয়, নাম—ওয়াল্ডেন টু (Walden Two)। উপন্যাসের নায়কের নাম—ফ্রেজিয়ার। ফ্রেজিয়ার আসলে তার স্রষ্টা স্কিনারেরই মুখপাত্র। ফ্রেজিয়ারই আসলে স্কিনার-কাঙ্ক্ষিত সেই নিষ্ঠুর মহদাশয় সমাজ-নায়ক বা রাষ্ট্রনায়ক, যে একটা গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষের আচরণ তার নিজের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নীৎসে বা সার্ত্রে যেমন ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করেছেন, স্কিনার তা করেন নি। তিনি ফ্রেজিয়ারের মতো নিষ্ঠুর মহদাশয় নায়ককেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করতে চান।

ওয়াল্ডেন টু'-র নায়ক থ্রেজিয়ার বলে, ঈশ্বর তার চেয়ে বয়সে বড়ো, শুধু এই একটি ব্যাপারেই সে ঈশ্বরের কাছে হার মানতে বাধ্য; এ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে সে ঈশ্বরের মতোই কিংবা তাঁর চেয়েও বেশি শক্তিধর। অর্থাৎ বর্তমান কালের পুঁজিবাদী সমাজ-নায়ককে দিয়ে স্কিনার অসম্ভবকে সম্ভব করতে চান; তাঁর অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং পদ্ধতি দিয়ে এমনভাবে সকল মানুষের মস্তিষ্ক ধোলাই করতে চান যে, কেউ আর পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী স্বাধীনতার কথা ভুলেও ভাববে না। স্কিনারের মতো আচরণবাদীরা এমনটি করা শুধু সম্ভব বলেই মনে করেন না, এর বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তাঁরা চালিয়েছেন। একালের শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আচরণবাদই সরকারী বিজ্ঞান। এ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার বোধই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

ব্যক্তির সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুঁড়িয়ে ফেলে পুঁজির মালিকদের স্বার্থকেই সার্বভৌম করে তোলার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে আজ পুঁজিতন্ত্রী দুনিয়ার সর্বত্র। থিয়েটার, সিনেমা, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন,—সব রকম মাস-মিডিয়া যেখানে পুঁজির মালিক আর মালিকদের রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে কোনো ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছাকে বিকশিত করে তোলবার স্বাধীনতা থাকে কোথায়? পুঁজিতন্ত্রী দুনিয়ার মাস-মিডিয়া আচরণবাদী অপারেণ্ট কণ্ডিশনিংকেই যেন বাস্তব করার কাজে নিশিদিন নিয়োজিত! পুঁজিপতিরা যে-পণ্য উৎপাদন করে, তাকে বাজারে চালু রাখার দায়িত্ব পালন করে সকল মাস-মিডিয়া। পণ্যের প্রকৃত গুণাগুণ বিচার করা আজ আর কোনো ভোক্তার পক্ষে সম্ভব নয়, বিজ্ঞাপনের ধূম্রজাল তার সে-শক্তিকে লুপ্ত করে দিয়েছে। মাস-মিডিয়ার যাদুকরী প্রচার-প্রভাবে আজ ব্যক্তিমানুষেরও রুচিবোধ অবলুপ্ত। এমনকি, এ-মাস মিডিয়া একজন ব্যক্তির প্রকৃত অভাববোধকে ভোঁতা করে দিয়ে কৃত্রিম অভাবের তাড়নায় তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে। নিজের প্রকৃত প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ-কালের পুঁজিতন্ত্রী-সমাজের মানুষ পণ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না, হয় কার-খানার পণ্যের কাটতি বাড়িয়ে পুঁজিপতির অর্থভাণ্ডারকে স্ফীত করে তোলার জন্য। এ-সমাজের প্রতিটি মানুষ আজ নিজের অজ্ঞাতেই যেন পুঁজিপতিদের লালসা পূরনের যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে। পুঁজিতন্ত্রী-নিয়ন্ত্রিত মাস-মিডিয়ায় বিজ্ঞাপিত নিত্য-নতুন পণ্যের অধিকারী না-হওয়া পর্যন্ত নিজের জীবনকেই আমাকে ব্যর্থ মনে করে। মাস-মিডিয়ার বাধ্য-কারী মোহনী শক্তির কাছে এমন ভাবে পরাজিত যে-মানুষ, সে কি স্বাধীন?

মিডিয়ার যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির স্বাধীনতা যেখানে এভাবে উৎসর্গিত হচ্ছে, সেখানে কী আশ্চর্য, মিডিয়াকে নিয়েই চলছে 'বিপ্লবী তত্ত্ব' সৃষ্টির

মরিয়া প্রয়াস! এ-রকম, তত্ত্ববিদ্‌দের কুলগুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন ম্যাকলুহান নামক এক মহর্ষি! ইনি বরাভয় বাণী বয়ে এনেছেন এ-কালের পুঁজিতন্ত্রী দুনিয়ার যন্ত্রভীত মানুষদের জন্য। ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত প্রযুক্তির দেশে মানুষ আজ স্বসৃষ্ট যন্ত্রকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতোই ভয় করছে। যন্ত্র যেন দিনদিনই তার স্রষ্টাকে—অর্থাৎ মানুষকে—দাসে পরিণত করে ফেলছে, স্বয়ংচল-যন্ত্র মানুষের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠে মানুষকেই গুরুত্বহীন করে তুলছে। এমন অবস্থা মানুষকে ভীত ও তার মানসিক স্বস্তিকে বিপর্যস্ত না-করে পারে না। ম্যাকলুহান এই ভীত ও বিপর্যস্ত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, মা ভৈঃ! বলছেন, এ-ভয় ভিত্তিহীন; নতুন যুগের মাস মিডিয়া, বিশেষ করে টেলিভিশন, মানুষকে বদলে দেবে; ইলেকট্রনিক যুগের টেলিভিশন পঞ্চেন্দ্রিয়কে একই সঙ্গে উদ্দীপ্ত ও তৃপ্ত করে মানুষের সব ভীতি আর অস্বস্তির অবসান ঘটাবে। যান্ত্রিক উন্নতির শেষ ধাপে এসে উদ্ভব ঘটেছে কম্পিউটারের, এই কম্পিউটারই মানুষকে নিয়ে যাবে অগ্রগতির শেষ ধাপে। কম্পিউটার মানুষকে মুক্তি দেবে চিন্তা করার দায় থেকে, মানুষের হয়ে কম্পিউটারই সব চিন্তা-ভাবনা আর প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে দেবে। কাজেই মানুষের আর সমাজ-পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন পড়বে না, প্রয়োজন পড়বে না কোনো আদর্শবাদেরও। এবং এভাবেই মানুষে-মানুষে ভেদ-বিভেদহীন শান্তি, সাম্য ও সমৃদ্ধির এক স্বপ্নের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এই মাটির পৃথিবীতেই। এ-রকম রাজ্যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতার কোনো প্রয়োজনই তো দেখা দেয়ার কথা নয়। তাই, এখনই-বা কী প্রয়োজন পড়লো ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামাবার?

ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ম্যাকলুহান সাহেব ঘামানও নি। তবে এ-কালের বিপর্যস্ত পুঁজিবাদকে মঙ্গল সমাচার শোনাচ্ছেন যে-ম্যাকলুহান, তিনি স্বাধীনতার সাধারণ ধারণাটাকেই পাল্টে দিতে চান। ইলেকট্রনিক যন্ত্র-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো প্রয়োজন মানুষের আছে বলে ম্যাকলুহান মনে করেন না; তাঁর মতে বরং ইলেকট্রনিক ও স্বয়ংচল যন্ত্র-বিধানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পনই মানুষের জন্য মুক্তি বয়ে আনবে। সে-মুক্তি কেমন? আজকের দিনে নানা ধরনের যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হয়, এতে প্রতিটি মানুষের এক-মুখী বিকাশ ঘটে,—ব্যাহত হয় তার সার্বিক উন্নয়ন। ভবিষ্যতে মানুষকে আর বিশেষজ্ঞ হতে হবে না, সব বিশেষজ্ঞের কাজ কম্পিউটারের মতো যন্ত্ররাই করে দেবে, মানুষ বিশেষজ্ঞ হওয়ার দায়মুক্ত হয়ে নিজের সার্বিক বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পাবে, নিজস্ব পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে হবে

নিরঙ্কুশ। কম্পিউটার-ভিত্তিক প্রযুক্তিবিপ্লব হয়তো বেকারত্ব আনতে পারে, কিন্তু তাতে কি হলো? মানুষ তো হবে স্বাধীন! এখানে মনে হতে পারে, ম্যাকলুহান বুঝি ব্যক্তিস্বাধীনতার এক নতুন দর্শনের সন্ধান দিচ্ছেন। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই কিন্তু এই ভ্রান্তিবিলাসের জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মানুষ তার স্বাধীনতার জন্য নয় শুধু, নিছক অস্তিত্বের জন্যই যেখানে আজ পরমাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে পথে নেমেছে, মিডিয়া-বিপ্লবের দার্শনিক ম্যাকলুহান সেখানে তাঁর 'দার্শনিক' নিষ্পৃহতা নিয়ে সম্ভাব্য যুদ্ধের দিকে তাকাচ্ছেন। পরমাণু যুদ্ধের ভয়ে তাঁর হৃদয় কম্পিত হয় না ; কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য যুদ্ধকে তিনি একান্ত আবশ্যক বলেই বিবেচনা করেন। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশগুলো যদি উন্নত প্রযুক্তি-সম্পন্ন জাতিদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়, তবে ও-সব দেশের মানুষগুলোর তন্দ্রা ও জড়তা কাটবে কী করে? এই তন্দ্রা-জড়তা না-কাটলে তো আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পকারখানা গড়ে স্বনির্ভরও হয়ে উঠতে পারবে না ওরা! তাই, ম্যাকলুহান মনে করেন; যুদ্ধের সাময়িক ধকল সহ্য করে সারা পৃথিবীর মানুষ যেদিন পুরোপুরি কম্পিউটার যুগে প্রবেশ করবে, সেদিন সে স্থায়ী শান্তি ও ও সমৃদ্ধিকে পেয়ে যাবে তার হাতের মুঠোয়!

তথাকথিত কম্পিউটার যুগের আগমনী গানে গলা মেলাবার জন্য বেশ কিছু ভাড়াটে গায়কও পেয়ে গেছেন ম্যাকলুহান সাহেব। এ-সবের মধ্যে আছেন পোষমানা সাংবাদিক, বশংবদ বুদ্ধিজীবী ও রোবট প্রস্তুতকারী সংস্থার মালিকবৃন্দ। কানাডার বহুল সমাদৃত সংবাদপত্র Globe and Mail-এ ১৯৮২ সালের কোনো এক সংখ্যায় বলা হয়েছেঃ আশির দশকের শেষেই শ্রমিকদের সব কাজ থেকে অব্যাহতি দেবে রোবট। রোবটের এই বিজয়কে ওই পত্রিকার সাংবাদিক আখ্যা দিয়েছেন 'দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব' বলেছেন,—'এ-বিপ্লব 'ইতিহাসের একমাত্র বিপ্লব যা সরকার দ্বারা ঘটছে।' 'রোবট মানুষের চেয়ে উপযোগী শ্রমিক'—এমন কথা বলা হয়েছে রোবট প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠানের পুস্তিকায়। মানুষের চেয়ে রোবটের উপযোগিতার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে এ-রকম দফাওয়ারিভাবেঃ

"১. রোবটগুলো আট ঘণ্টা কাজের পর পানশালায় যেতে চায় না

২. ইউনিয়ন করে না

৩. গর্ভবতী হয়ে ছুটি চায় না

৪. কোনো পরিবেশেই ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যায় না

৫. রোবট প্রয়োগ করার খরচাটা আয়করের বাইরে থাকে'

এ-রকম 'জয়তু রোবট' যে-বিপ্লবের রণধ্বনি, সে-যে কেমন বিপ্লব, এবং সে-বিপ্লব যে অজস্র রোবট আর রোবট-মালিকের আধিপত্য নিরঙ্কুশ করে সকল মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে গুঁড়িয়ে দিতে চায়,—সে-কথা বোঝার জন্য খুব বেশি মেধার প্রয়োজন পড়ে না। এই বিপ্লবের তত্ত্বকেই তো ম্যাকলুহান প্রকাশ করেছেন ১৯৬৪ সনে তাঁর 'আন্ডার-স্ট্যাডিং মিডিয়া ঃ দি এক্সটেন্‌শন্‌স্‌ অব ম্যান' গ্রন্থে। উৎপাদক 'মানুষ'কেই কার্ল মার্কস ইতিহাস-সৃষ্টিকারী শক্তি বলে নির্দেশ করেছিলেন, আর এতাবৎকালের মানুষের ইতিহাসকে বলেছিলেন,—'শ্রেণীসংগ্রামের ইতি-হাস'। অর্বাচীনের স্পর্ধা নিয়ে ম্যাকলুহান মার্কসীয় প্রত্যয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সূত্র দিলেনঃ "এ-যাবৎ প্রচলিত সকল সমাজের ইতিহাস আসলে মিডিয়া-সংগ্রামের ইতিহাস" (The histoy of all hitherto existing society is the history of Media struggle)। মানুষের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রকাশ-মাধ্যম চিত্রলিপিকে পরাভূত করে উদ্ভব ঘটে ধ্বনি-লিপির, তারপর হস্তলিখিত ধ্বনিলিপিকে পরাজিত করে আসে মুদ্রণ শিল্প। এমনিভাবে সংবাদপত্র পরাস্ত করেছে থিয়েটারকে, এক সময় থিয়েটারের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে এসেছে সিনেমা, এবং আজ টেলিভিশন আঘাত করেছে সিনেমাকে। এ-রকম সব দৃষ্টান্তই ম্যাকলুহান তাঁর 'মিডিয়া সংগ্রামে'র 'বিপ্লবী' তত্ত্বের সমর্থনে হাজির করেছেন। যে-কোনো কান্ডজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের কাছেই কিন্তু এ-সবকে নিতান্ত বালখিল্য বাক্‌-বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। পুঁজিবাদী সমাজের লগ্নি-কারকরা-যে সব রকম মাস-মিডিয়াতে টাকা খাটায় মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখেই,—এ-তথ্য কি কোনো সচেতন মানুষের নজর এড়িয়ে যেতে পারে? তাই, ম্যাকলুহানের সমালোচকরা তাঁর ওই 'মিডিয়া সংগ্রাম'কে 'মুনাফার সংগ্রাম' আখ্যা দিয়েছেন অত্যন্ত সংগতভাবেই (What Mc Luhan termed as media struggle is nothing but profit-struggle)। মুনাফাখোর পুঁজিপতিরাই নিয়ন্ত্রণ করে সব মাস-মিডিয়া; আর ওই সব নিয়ন্ত্রিত মাস-মিডিয়া অতি সুকৌশলে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার বোধকে পর্যন্ত অসাড় করে দিতে চায়। এ-ব্যাপারে তথাকথিত মিডিয়া বিপ্লবের দার্শনিক ম্যাকলুহানও তো, মনে হয়, মস্তিষ্ক ধোলাইকারী বিহেভিয়ারিস্ট স্কিনারেরই সহযোগী। এ-কালের বুর্জোয়াদের সকল ভাবাদর্শের খোলামেলা বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ নীৎসে থেকে ম্যাকলুহান পর্যন্ত অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের কোনো তত্ত্ববিদ্‌ই এমন কোনো তত্ত্বের জন্ম দিতে পারেন নি, যা মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপোষক। ভাববাদীই হোন আর যান্ত্রিক বস্তুবাদীই হোন (এই দু'য়ের একটা

এঁদের হতেই হবে; এ-কালের যে-কোনো বুর্জোয়া ভাবাদর্শ মূলত এ-দুয়েরই রকমফের মাত্র) এঁরা সবাই ব্যক্তির অসহায়ত্বকেই প্রকট করে তুলেছেন, এবং কোনো-না-কোনো ভাবে প্রচলিত সমাজ-বিধানের কাছে ব্যক্তিকে নত হতে বাধ্য করেছেন। পুঁজিবাদের উন্মেষ যুগের বুর্জোয়ারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে-দর্শনের চারা লাগিয়েছিলেন, তা বহু আগেই মরে গেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে তাকে আর কিছুতেই বাঁচিয়ে তোলা যাবে না।

অথচ, আন্তর্জাতিক গলিত পুঁজিবাদের উচ্ছিষ্টভোজী তৃতীয় বিশ্বের অপ-পন্ডিতরা যখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার বুলি কপচান, এবং সমাজতন্ত্রী দুনিয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই বলে আহাজারি করেন, তখন মোগল-পাঠান হদ্দ হয়ে যাওয়ার পর ফারসী পড়তে শুরু করেছিল যে-লোকটি, বাংলা প্রবাদোক্ত সেই অঘারামটির কথাই মনে পড়ে শুধু।

পাখিভাষার নৈর্ব্যক্তিকতা

আবু জোবের

রোমান্টিক কবি যাঁরা তাঁদেরকে আমরা দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে কিঞ্চিৎ বুঝি, আলাদাভাবেই চিহ্নিত করি এবং তাঁদের জীবনবোধ ও রচনাশৈলী ইত্যাদি সবকিছুরই মূল্যায়ন করি সেই নিরিখে। আর যখন কোনো নব্য ক্লাসিক কবির কবিতা, যেমন ধরা যাক পোপের কিংবা ভারতচন্দ্রের আমরা পাঠ করি আমাদের উপলব্ধি যেভাবে জাগ্রত হয় এবং সমগ্রভাবে তাঁদের কবিতা থেকে যেমনটি আমরা আশা করি তাতে এক ধরনের সুমিতিবোধ কাজ করে এবং জীবন-সম্পর্কিত ধারণা সামাজিক বলয়ে অবস্থিত ও নিয়ন্ত্রিত থেকে আমাদেরকে জিজ্ঞাসু ক'রে তোলে। এখানে সীমাবদ্ধতাও আছে, তা হলো কল্পনার সীমাবদ্ধতা, আবেগের সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে রোমান্টিক কবি যাঁরা তাঁদের আবেগ ও কল্পনার স্বাধীনতা বেশি, জীবনকে দেখার ভঙ্গিও তাঁদের আলাদা, চেতনা বেশি সম্প্রসারিত। তাঁরা প্রকৃতি-জগৎকেও অন্তর্ভুক্ত করেন মানবিক জগতের সঙ্গে এবং বিস্তৃত করেন তাঁদের অভিজ্ঞতা। তাঁদের কাব্যে রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি ব্যাপার যে আবেদন সৃষ্টি করে তাতে অবশ্যই একটি বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, পাঠক তাতে নতুন আমেজ উপভোগ করেন এবং সমগ্রভাবে একটি সম্প্রসারিত চেতনারও জন্ম হয়। ক্ষেত্রবিশেষে যেখানে আবেগ ও উচ্ছ্বাস বেশি হয়, যেমন শেলির কবিতায় দেখি অপ্রাপনীয়কে পাবার একটি ব্যাকুলতা বুঝি অতিশয় আবেগঘন, কিংবা রবীন্দ্রনাথেরও কোনো কোনো কবিতায় যেমন বক্তব্যকে ছাপিয়ে আবেগের বিহ্বলতা, সেখানে পাঠক খুব স্বস্তি বোধ করে না। এবং পাঠকের এই অনুভূতি আবার কালের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারসাপেক্ষ। এককালে যে কবিতা আমরা অম্লান বদনে পাঠ ক'রে আনন্দ পেয়েছি, আজ সেই কবিতাতেই হয়তো মনে হয় ভাবাবেগে দুষ্ট। অর্থাৎ আমাদের আবেগও নিয়ন্ত্রিত হয় বাস্তবের ও পরিপার্শ্বের প্রভাব অনুযায়ী। কিন্তু রোমান্টিক কবির মননের বিশিষ্টতা অবশ্যই স্বীকার্য। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং প্রকৃতিকেও আমাদের অস্তিত্বের অংশ মনে ক'রে আমাদের ভাবনার জগৎকে সম্প্রসারিত করেন তাতে আমরা বাঁচার বিস্ময় ও তাৎপর্য উপলব্ধি করি বেশি।

২

প্রকৃতি জগতের অনুপম সদস্য পাখিকে চেতনাধৃত ক'রে তার সঙ্গে একাত্মতার বোধ সৃষ্টি করা—সেও রোমান্টিক কবির বিশেষ মানসিকতার

পরিচয়বাহী। প্রকৃতিরাজ্যে অজস্র পাখির ভিড়ে এমন কিছু পাখি আছে যারা চিরকাল আমাদের চেতনার উপর দিয়ে গানের ঝংকার তোলে কিংবা বিস্ময়কর ডাকাডাকি করে। আর রোমাণ্টিক কবির হৃদয়ে একটি গভীর আর্তি আর আকুলতা সময়ের উপর দিয়ে, জীবনের উপর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—জীবনের নশ্বরতাকে, তার যন্ত্রণা আর ব্যথা বেদনাকে পরখ ক'রে এই আর্তি কখনো নামহারা ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানায়, কখনো ব্যথা-বেদনার বিপ্রতীপে আনন্দের উৎস যে পাখিভাষা হয়ে ঝরে তাকে স্মরণ করে, কখনো নিজেই পাখি হতে চায়, পাখির গান হতে চায়। এইভাবে প্রকৃতির জগৎও মানুষের সাথে একাকার হয়ে যায়।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা কবিতা ভুবনের কয়েকটি বিশিষ্ট পাখি (যেমন নাইটিঙ্গেল, স্কাইলার্ক, সিন্ধু সারস ও ডাহুক) সম্বন্ধে এবং তাদেরকে নিয়ে যেসব কবি কল্পনার অপরূপ ভুবন সৃষ্টি করেছেন তাঁদের প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করবো। এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি পাখি, যেমন কোকিল, হংস, বলাকা ইত্যাদির নাম স্মরণ করা যায় (ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়), কিন্তু তারা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য নয়।

শেলির স্কাইলার্ক আনন্দময় সঙ্গীতের স্রষ্টা, তার দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, পৃথিবীর দুঃখ হতাশা আর দীনতার বহু ঊর্ধ্বে তার বিহার—যেন আনন্দলোকে। রোমান্টিক কবি হিসাবে শেলির একটি বিশেষ মর্যাদা দিতে হয়, এজন্য দিতে হয় যে, মানুষের চিরকালের অত্যাচার অবিচার ও হিংস্রতা এবং বর্বরতার প্রশ্নে তিনি প্রেমকেই সমাধান ভেবেছিলে এবং প্রেমের পথে মুক্তি কামনা করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মানব-ভাগ্য সম্পর্কেও তিনি ভাবিত ছিলেন এবং মানুষের নশ্বরতা রোগ শোক হাহাকার ইত্যাদি প্রশ্নে তিনি ঐ সব আনন্দময় পাখির দিকে তাকিয়ে এবং তাদের heavenly bliss উপলব্ধি ক'রে মানবজীবনের সীমাবদ্ধতার ও ব্যর্থতার দিকও চিন্তা করেছেন। স্কাইলার্ককে দেখে কবির মনে হয়েছেঃ

> We look before and after,
> And pine for what is not
> Our sincerist laughter
> With some pain is fraught,
> Our sweetest songs
> Are those that tell of saddest thought.

স্কাইলার্ক তো আনন্দের পাখি, সারা আকাশ উপচিয়ে তার আনন্দ-ধারা ঝ'রে পড়ে। কিন্তু আমরা ঐ আনন্দ কোথা পাবো? আমাদের মানব-জন্ম তো আদিতেই বুঝি কোনো পাপের অধীন—সে কি ঐ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার মতো রূপক কাহিনীর অন্তর্নিহিত আদিপাপ? কারণটা যাই হোক, মানব ভাগ্য কিন্তু দুঃখের অধীন, সীমাবদ্ধতা আর ক্ষয়ের অধীন। আর তার যে মহত্ত্ব তাও ঐ সবকেই আশ্রয় ক'রে। জ্ঞানের পথে কর্মের পথে তার যে উপলব্ধি তাতেই তার মহত্ত্ব, এবং হয়তো মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণেই ঐ মহত্ত্ব উজ্জ্বল দীপালোকের মতো জ্বলে এবং আনন্দ হয়ে প্রেরণা দেয়। কিন্তু তাও তো সীমাবদ্ধ। মানুষ যদি অমর হতো দেবতাদের মতো তা হলে তার মহত্ত্বের প্রশ্ন আসতো না। পাখির আনন্দ কবির মতে স্বর্গীয়, সেখানে বেদনা নেই। কিন্তু আমাদের আনন্দ তো বেদনার সাথে সম্পর্কিত—এটিই মানব ভাগ্য।

শেলির কবিতা কীট্‌সের Ode to a Nightingale-এর তুলনায় তরলিত আবেগ বহন করে কিন্তু উদ্ধৃত কবিতাংশ শেলির জীবন সম্পর্কিত গভীর উপলব্ধির বাণীরূপ মানতেই হবে। কীট্‌সে কবিতার সুর তথা পরবর্তীকালের কবিদের পাখি বিষয়ক মূল সুর ঐ শেলি-কথিত বিখ্যাত লাইনগুলোর প্রতিধ্বনি। কিন্তু কীট্‌সের কবিতা বেশি সমৃদ্ধ ও বেশি উপভোগ্য: কীট্‌স যখন বলেন, তাঁর প্রিয় নাইটিঙ্গেল পাখি বুঝি অমরতার পাখি এবং মানব ভাগের বিপ্রতীপে তার কোনো দুঃখ নেই, এবং

> Fade far away, dissolve and quite forget
> What thou among the leaves hast never known,
> The weariness, the fever and the fret
> Here, where men sit and hear each other groan.

অথবা,

> Where beauty cannot keep her lustrous eyes,
> Or new love pine at them beyond to-morrow

তখন তাতে মানবজীবন তথা মানবভাগ্যের বেদনার্ত চিত্র চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। এবং তাঁর নাইটিঙ্গেলে গানের সুরের যে অজস্রতা চেতনার উপর দিয়ে ডাকাডাকি করে আর কবি যখন লেখেন, to thy high requiem I become a sod, তখন তা অপরূপ একটি ব্যঞ্জনা আনে, যেন, অমরতার স্পর্শে জীবনের চঞ্চল ক্ষয়িষ্ণু রূপ সম্মোহিত হয়ে নীরব হলো। ঐ পাখি এখানে অমরতার পাখি, তার গানের কোনো শেষ নেই, শৈশব থেকে বার্ধক্য তথা মৃত্যু পর্যন্ত, এবং স্মরণাতীত কাল থেকে কোনো সম্রাটের প্রাসাদের কোনো উচ্চতম বৃক্ষশিখরে কোনো মুহূর্তের

সেই গান-গাওয়া আজও ধ্বনিত হচ্ছে একই সম্মোহন সৃষ্টি ক'রে। এর শেষ নেই, কিন্তু মানব ভাগ্য তো নিয়ন্ত্রিত ব্যথা বেদনার অসহায়তায় নিমজ্জিত। এই উপলব্ধি শেলির উপলব্ধির সমান্তরালে আমাদেরকে বোধ করি আরো ব্যথা-মলিন ও ক্লিষ্ট করে।

আমাদের কালে এই বিংশ শতাব্দীর দারুণ পরিবর্তনশীল কালেও আধুনিক কবি কিন্তু পাখিকে ভুলতে পারেননি। পাখির গান তাঁর চেতনার সাথে বাঁধা। রোমান্টিক নজরুলের অনেক বিখ্যাত গানে ও কবিতায় পাখিই প্রধান। তাঁর বিখ্যাত গান 'পিউ কাঁহা পাপিয়া' চেতনায় মর্মরিত সুরের আবেগ আনে। কিন্তু জীবনানন্দের 'সিন্ধুসারস' অন্য-রকমের পাখি—প্রাণশক্তিতে অফুরন্ত। এই কবিতায় কবি পূর্বসূরীদের মতোই পাখির অমরতা এবং মানুষের গ্লানি ব্যথা-বেদনা ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার চিত্র এঁকেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতেঃ

> জানো কি অনেক যুগ চলে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি?
> অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো নাকি? অনেক গহন ক্ষতি
> আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছে আনন্দের গতি;
> ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
> হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?

এবং,

> জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
> তুমি পিছে চাহনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
> বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি

লক্ষণীয় যে, সিন্ধুসারস কবিতায় জীবনানন্দ যে আমেজ সৃষ্টি করেছেন তাতে ফুটে উঠেছে লোকজ জীবনের অপরূপ ছবি, যা একই সঙ্গে ব্যথা বেদনার করুণ আলেখ্য হয়ে জীবন্ত। সিন্ধুসারসের প্রাণের অমেয় স্ফূর্তির বিপরীতে মানবিক জীবনযাত্রা, অর্থাৎ মানবের স্থির-নির্দিষ্ট আয়ুতে বাঁধা বিরস বেদনায় আকীর্ণ ধূসরে মাখামাখি যে জীবন, তার করুণ নিঃসঙ্গতা ও অপূর্ণতা ফুটে ওঠে। আমাদেরকে তা স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত করে। একটি করুণা-ছলোছলো ব্যাকুলতায় আমরা মুহ্যমান হই। ধানের রসের গল্প আজো আছে মাটি পৃথিবীর জীবনের পটভূমিকায়, পৃথিবীর নরম আঘ্রাণও আছে, নারীও আছে, কিন্তু তার প্রেমিকের 'ম্লান মুখের রূপ' আর 'বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ' যে মানব-ভাগ্যের অন্তর্গত বেদনা ও হতাশার স্বাক্ষর বহন করে তাও তো সত্য। সিন্ধুসারসকে কবি দেখেন আনন্দের আর মুক্তির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিরূপে

দূর মালাবার সিন্ধুর কূলে। সব হতাশা আর ব্যর্থতার গ্লানি থেকে দূরে। আমরা বেদনার সন্তান, কিন্তু সিন্ধুসারস মালাবার ফেনার সন্তান, ডানার উল্লাস নিয়ে কেবলই আনন্দের চঞ্চলতায় 'কলরব ক'রে উড়ে যায় শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়'।

আর ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' কবিতায় ডাহুকের যে ডাক সে রাত্রির কিনারে সমুদ্রের অতল থেকে ডুবুরির মতো তুলে আনে হৃদয়ের সুর, সেই সুর বুঝি সুরা যা রাত্রির কিনারকে কাঁদাচ্ছে। এই কান্না সার্বিকভাবে সৃষ্টির বেদনার কান্না। অবশ্যই ডাহুকের সুরে একটি কান্না জড়ানো আছে বলেই মনে হয়, কিন্তু ঐ পাখি তো মুক্তপক্ষ ও মুক্তকণ্ঠ। মানবভাগ্যের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার বিপরীতে তার অসীম মুক্তির স্বাধীনতা তার প্রতি আমাদের কৌতূহলী ক'রে তোলে। এবং শুধু কৌতূহলই নয়, তার বিপুল মুক্তি আমাদের সারা জীবনের তপস্যার মধ্যেও লভ্য নয়। প্রকৃতির হৃদয় থেকে সে যে সুরের সম্মোহন লাভ করেছে তা নিখিল মানবতার হৃদয়ের সুর—সেখানে ব্যথা-বেদনার সারাৎসার বর্তমান, আবার মুক্তির আনন্দও বর্তমান। লক্ষণীয়, আলোচ্য পাখিবিষয়ক প্রতি কবিতাতেই একটি মৌলিক প্রশ্ন বিদ্যমান, তা হলো মানবভাগ্য-কেন্দ্রিক হতাশা, সীমাবদ্ধতা এবং তার বিপরীতে পাখির অবাধ ও সহজ মুক্তি, অপার আনন্দ, অন্তহীন যাত্রা।

তবু বলার কথা কিছু থাকে বৈ-কি। মানবভাগ্য যদি এতোই নিয়তি-নির্দিষ্ট তা হলে তা থেকে মুক্তির উপায় কি? মানব ভাগ্য অবশ্যই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বাঁধা, তবু মানুষ ইচ্ছা করলে তার ব্যথা বেদনা আর হতাশা থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেতে পারে, যদি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় লোভ কাড়াকাড়ি রণ রক্ত ইত্যাদি অমানবিক পন্থাকে সে নির্বাসন দিতে পারে। তার আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ সত্য, তবু মুক্তির আনন্দ তো প্রেমে আর কল্যাণ চেতনায়; অতএব সেই আকাঙ্ক্ষিত সমাজে, যেখানে মানবিক দুর্দশা অন্তহীন হবে না, মানুষ ইচ্ছা করলে জীবনকে সুন্দর করতে পারে। এই বিশ্বাস আর মনোবল নিয়ে আজকের অনেক মানুষ তাকিয়ে আছে এবং উত্তরোত্তর লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য জীবনপণ সাধনা অব্যাহত রেখেছে। যে-সমাজে কবি মানবিক হতাশা আর সীমাবদ্ধতার করুণ চিত্র এঁকেছেন তা-সব যে ভুল সিদ্ধান্ত তা তো নয়, তবু পরিবর্তিত অবস্থায় যদি আদর্শ সমাজে বাঁচার বাসনাকে রূপায়িত করা সম্ভব হয় তবে পাখির অবাধ মুক্তির চাইতে মানবিক আনন্দময় জীবনযাত্রা বেশি কাম্য মনে হতে পারে।

ঝড়-ঝঞ্ঝায় যাত্রা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪-৭৯) কেউ বলেছেন "বিশ্বভিখারী" কেউ বলেছেন "ঝড়-ঝঞ্ঝার কবি"। কোন বর্ণনা সত্য? সত্য দুটোই, এবং একটির সঙ্গে অপরটির কোনো বিরোধ নেই আসলে। কালটা ছিলো ঝড়ের। কলকাতা তখন কলকল্লোলের শহর; যাকে অনেকে রেনেসান্স বলেন তার একটি অতিচঞ্চল ব্যস্ততা চলছে চতুর্দিকে। ঝড় উঠেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। সেই ঝড়ে মধুসূদন পড়েছেন, এবং তিনি লিখেছেন ঝড়ের মতো, মাত্র ছয়-সাত বছরের সাহিত্যজীবনে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি রেখে গেছেন—যেমন কবিতায়, তেমনি নাটকে, এমনকি প্রহসনেও। ওদিকে আবার তিনি ভিখারীও ছিলেন। পাগলের মতো নানা দরজায় ঘুরেছেন, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজি কোনো সাহিত্যকে বাদ দেন নি, যেখানে যা পেয়েছেন সংগ্রহ করেছেন, এবং সমস্তকিছুকে নিয়োজিত করেছেন নিজের সৃষ্টির কাজে। একই সঙ্গে তিনি বিদ্রোহী ও ভিক্ষুক, বিদ্রোহী বলেই ভিক্ষুক, সেইখানেই বৈশিষ্ট্য তাঁর, স্বতন্ত্র তিনি।

মধুসূদনের কালে, অনেক প্রতিভাবান মানুষ জন্মেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী অভিমান ছিলো এবং যেখান থেকে যা পাচ্ছেন দু-হাতে গ্রহণ করার আগ্রহ ছিলো। সকলে অবশ্য মাইকেল ছিলেন না। সবাই যে প্রতিভাবান ছিলেন তা নয়, কারো কারো মধ্যে আবার অভাব ছিলো স্বাজাত্যাভিমানের, এবং সকলেই যে সাংস্কৃতিক সম্পদের অন্বেষণ করছিলেন তাও নয়, অনেকেই সন্ধানী ছিলেন বিষয়-সম্পত্তির, পাগল ছিলেন সেই নেশাতে। এবং এও তো বলা সঙ্গত যে, সংসারে যত পাগল আছে তাদের মধ্যে স্বার্থপাগলের মতো সেয়ানা ও ভয়ঙ্কর পাগল অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

এই যে তিনটি বিচার—প্রতিভার, জাতীয়তাবোধের ও বৈষয়িক স্বার্থ-চেতনার ঊর্ধ্বে ওঠার—এ কোনো সামান্য ব্যাপার নয়। এ তিন গুণ একত্র না থাকলে কি দশা হয় মানুষের তার অতুলনীয় ছবি আঁকা আছে রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" উপন্যাসে। সেখানেও একজন মধুসূদন রয়েছে—ব্যবসায়ী, স্থূল ও রোমশ। তার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের প্রশ্নই ওঠে না, ব্যক্তিগত স্বার্থচেতনার চেয়ে উচ্চতর কোনো বোধ তার জীবনে আছে কি না বলা মোটেই মুস্কিল নয়, কেননা অন্যকিছু আদৌ নেই। কিন্তু প্রতিভা?

P30654

প্রতিভা কি ছিলো না এই অপর মধুসূদনের? না থাকলে অতবড় 'রাজ-প্রাসাদ' গড়লো কি দিয়ে? কোথায় পেলো পুঁজি? কেমন করে 'রাজা' হলো, ভঙ্গি করল মহারাজের? ছিলো, প্রতিভা ছিলো। তবে ভিন্ন রকমের —এ-প্রতিভা সৌন্দর্যস্রষ্টা শিল্পীর নয়, সৌন্দর্যবিদ্বেষী দুরন্ত দৈত্যের।

কিন্তু যতই কেননা ধনী হোক ওই ব্যবসায়ী মধুসূদন, ভেতরে ভেতরে ভিক্ষুক সে। যেখানে-সেখানে হাত পাতে, ইংরেজের কাছে, গণকের কাছে, জমিদার বিপ্রদাসের কাছেও। হুঙ্কার দিয়েছিল জমিদার-বাড়ির মেয়েটিকে তার চাই, সেই হুঙ্কারের পেছনে অভাববোধের তীব্র যন্ত্রণা রয়েছে কার্যকর। জমিদার বাড়ির কুমুর কাছে রীতিমত হ্যাংলা সে। জন্মভিক্ষুক।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভিক্ষা করলেন, কিন্তু ভিক্ষুক হলেন না। আর ওই ব্যবসায়ী মধুসূদন মস্ত বড় ধনী হয়েও যথার্থ ভিক্ষুকই রয়ে গেলো। এর মধ্যে কোন্‌টি নিয়ম? কোন্‌টি ব্যতিক্রম? মাইকেল নিয়ম নন, তিনি ব্যতিক্রম, কেননা ভিক্ষা করবো অথচ ভিক্ষুক হবো না—এটা তো নিয়ম হতে পারে না, নিয়ম হলো ভিক্ষা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ভিক্ষুক হয়ে যেতে হবে—হয়তো-বা ধীরে ধীরে, হয়তো নিজের অজান্তেই, তবু অবশ্যই, অনিবার্যরূপে। মিশে যেতে হয় সেই কুৎসিৎ কাফেলায় যেখান থেকে টেনে তোলা কঠিন, অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব। মাইকেলের যুগে এমন প্রতিভাহীন মানুষ অনেক ছিলো যারা স্থূল নয়, যারা বস্তুর পেছনে ছোটেনি, সংস্কৃতির পেছনেই ছোটাছুটি করেছে, কিন্তু ঠিক মানুষ হয়নি, অন্য-কিছু হয়েছে। নকল-ইংরেজকে মানুষ বলায় অসুবিধা আছে। মাইকেলও ইংরেজ সেজেছিলেন, আমরা বলবো না তিনি সত্যি সত্যি ইংরেজ হয়ে গিয়েছিলেন, বলতে হবে বরঞ্চ যে, পারেন নি, ভেতরে ভেতরে বাঙালীই রয়ে গেছেন তিনি; মানতেই হবে যে, তাঁর পরিচয় নকল সাহেবিয়ানার কারণে নয়, তাঁর পরিচয় বড় মাপের বাঙালী কবি হিসাবেই। একজন মধুসূদনের সাফল্য শত শত মাইকেলের ব্যর্থতার স্মারকচিহ্ন।

যাঁকে ভিক্ষুক বলছি তিনিই আবার বিদ্রোহী। বিদ্রোহী বলেই ভিক্ষুক আসলে, ভিক্ষুক বলে বিদ্রোহী নন। এই প্রতিভাবান মানুষটি অতি অল্প বয়সে বুঝেছিলেন তাঁকে বড়-কিছু করতে হবে, নকলনবিশ হিসাবে নয়, শান্ত গৃহপালিত প্রাণী হিসাবেও নয়, শিল্পী হিসাবে। বিদ্যমানের সামান্যতাকে তাই তিনি ছেড়ে ও ছাড়িয়ে গেলেন দুঃসাহসে। কিন্তু কেবল ধ্বংস করলেন না, ঝড়তুফান যেমনটি করে; সৃষ্টিও করলেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ধ্বংস রয়ে গেছে, কিন্তু মূলত তিনি হচ্ছেন একজন স্রষ্টা। বাংলাভাষায় যথার্থ মহাকাব্য, সনেট, নাটক (ট্র্যাজেডি ও প্রহসন), অমিত্রাক্ষর ছন্দ—সমস্তেরই তিনি প্রথম সার্থক রচয়িতা।

অমিত্রাক্ষরের কথাই প্রথমে বলতে হয়। এ তাঁর একমাত্র অবদান নয়, তবে শীর্ষ অবদান অবশ্যই। পয়ারের মৈত্রী ও বন্ধন ছিন্ন করে বের হয়ে গেলেন, কাব্য ব্রজ-ধামের সেই রাখাল-রাজা (মধুসূদনের নিজের ভাষায়) ঈশ্বর গুপ্তের জগৎ পড়ে রইলো পেছনে, কবিতার ধারণা, কবির ধারণা সব গেলো বদলে। মধুসূদনের পরে কবিতা বলতে আর শব্দে শব্দে মিল বোঝাবে না ; গীতিময়তা নয়, সাংবাপিকতা নয়, একঘেঁয়েমি নয়, কবিতা হবে কল্পনাঋদ্ধ, সাহসী, মৌলিক ; মানুষের গভীরতম প্রদেশ থেকে সে বের হয়ে আসবে, অতিদূরবর্তীকে মূর্ত করে তুলবে। কবি বলতে অশিক্ষিতপটুত্বের অধিকারী কোনো অভিমানীকে কিংবা সাংবাদিককে বুঝবেন না কেউ, বুঝবেন সমৃদ্ধ, শিক্ষিত, উচ্চ-রুচিসম্পন্ন কল্পনায় ধনী মানুষকে। মৈত্রীর জায়গায় মধুসূদন দ্বন্দ্ব নিয়ে এলেন।

দ্বন্দ্ব কার সঙ্গে কার? সামান্যতার সঙ্গে অসামান্যতার, প্রচলিতের সঙ্গে অভিনবের। চারপাশের জীবনের সংকীর্ণতাকে গ্রহণ করা যাবে না, কেননা উন্নত জীবনের প্রয়োজন রয়েছে। সেই তাড়াতেই তিনি স্বর্ণপুরীর কল্পনা করলেন। সারা পৃথিবী ঘুরে সম্পদ সঞ্চয় করে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। চোরের মতো নয়, বীরের মতো। নাটক লেখা শুরুর আগে বলেছিলেন "অলীক কুনাট্য রঙ্গে/মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে/নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।" নিরখিয়া প্রাণে সয় না বলেই বিদ্রোহ করলেন। ছন্দে প্রবহমানতা আনলেন। ভাষার এলিয়ে পড়া কোমলতার জায়গায় পৌরুষ প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, এর কোনোকিছুই আরোপিত নয়, সবটাই একেবারে ভেতর থেকে, ভেতরের প্রয়োজনের তাড়না থেকে উঠে এসেছে। জীবনের ওই নাটক থেকেই সাহিত্যের নাটক লেখা তাঁর। আধুনিক বাংলা নাটকের সৃষ্টি তাঁর হাত দিয়েই।

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তিনি "শর্মিষ্ঠা" (১৮৫৯) লিখেছিলেন। ভালো লিখবেন, যা লেখা হচ্ছে সেখানে থাকবেন না, অলীক কুনাট্যের চর্চা করবেন না—এই ছিলো প্রতিশ্রুতি। তাই করলেন। "কৃষ্ণকুমারী নাটক" (১৮৬৮) লিখে নাটক কেমন হওয়া উচিত তার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। তাঁর আগে বাংলা নাটক ট্র্যাজেডি ছিলো না, তিনি ট্র্যাজেডি লিখলেন।

কৃষ্ণকুমারী আত্মহত্যা করেছে। কেন করল? পার্শ্ববর্তী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার দুজনেই তাকে বিবাহ করতে অভিলাষী। এই দুই পাণিপ্রার্থী—মানসিংহ ও জগৎ সিংহ—কেউই নিরীহ নয়। কেউই ব্যর্থ হতে রাজি নয়। একমাত্র সন্তান, রূপসী কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন রাজা ভীমসিংহ। মন্ত্রীর পরামর্শে ঠিক করেছেন ভীমসিংহ যে, এই মহাসংকট থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পন্থা যেটি সেটিই অবলম্বন

করবেন, ভ্রাতার সাহায্যে হত্যা করাবেন কন্যাকে। কাপুরুষ পিতার এই ইচ্ছা টের পেয়েছে কৃষ্ণকুমারী, আত্মহত্যা করে সে নিজেকে ও পিতাকে বাঁচিয়েছে।

এই ট্র্যাজেডি কৃষ্ণকুমারীর। কিন্তু কেবল তার কি, তার পিতার নয়? অবশ্যই তার পিতারও ; তবে যতটা না পিতার, তার চেয়ে বেশি পিতৃত্বের। পরাধীন ভারতবর্ষে পিতৃত্ব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে আপন দায়িত্ব পালনে, সেজন্য মাতৃভূমি শত্রুকবলিত হয়ে রয়েছে। পিতৃত্বের ব্যর্থতা "মেঘনাদবধ কাব্যে"রও (১৮৬১) মূল বিষয় বটে। "মরে পুত্র জনকের পাপে"—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিষ্পাপ মেঘনাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু মেঘনাদের মৃত্যু অবধারিত। কেননা সে বীর। কেননা তার পিতা যথেষ্ট পিতা নয়, পিতার পাপ শত্রুকে নিয়ে এসেছে ঘরে, স্বর্ণলঙ্কার অবরুদ্ধ-দশা সৃষ্টি হয়েছে।

মেঘনাদের মধ্যে মধুসূদন আছেন, যেমন রয়েছেন তিনি কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে। একজন যুদ্ধ করেছে, অপরজন আত্মহত্যা, কিন্তু উভয়েই তারা বীর—সমান সমান। মধুসূদন চরিতার্থতা খুঁজে পাননি আপন পিতৃগৃহে —তাঁর নায়কদের মতোই। উনিশ বছর বয়সে মধুসূদন যে খ্রীস্টান হয়ে যান তার আশু কারণগুলোর মধ্যে একটি ছিলো পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কর্তৃক পুত্রের বিবাহের আয়োজন। ধর্মান্তরিত হওয়ায় রুষ্ট হয়ে পিতা অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেন, যার দরুণ তিনি বাধ্য হন কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজে চলে যেতে। তবে কেবল রাজনারায়ণের নয়, ব্যর্থতা গোটা সমাজের, সমাজ পারেনি এই প্রতিভাবান যুবককে চরিতার্থতা দিতে।

তেমনি ভাবে কৃষ্ণকুমারীকে তার পিতা আশ্রয় দেবে কি, পিতা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দেবতারা থাকে, তারা ভাগ্য-নির্দিষ্ট করে দেয় মানুষের, এখানে দেবতা নয়, বিদেশী শত্রু আক্রমণ করেছে, এবং দেশবাসী আত্মরক্ষা করতে পারছে না। রাজার ব্যর্থতা পিতৃত্বেরই ব্যর্থতা। ভারতবর্ষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ সেই স্বাধীনতাকেই বিদেশীরা গ্রাস করে নিয়েছে। দেশের কাছে যেমন স্বাধীনতা, ভীমসিংহের কাছে তেমনি তার কন্যা। রাণী বলছে রাজাকে "মহারাজ, তুমি ও-হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার হাতে আমার কন্যার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মে বিদায় নিলাম।" এ-ধিক্কার মধুসূদনেরও।

পিতার প্রতি সমান ধিক্কার রয়েছে "বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামক অভিনব প্রহসনটিতে। মহাকাব্য লিখলেন যিনি অমিত্রাক্ষরে ও সংস্কৃত-বহুল আলঙ্কারিক কাব্য ভাষায়, প্রহসনে তিনি একেবারে চলতি গদ্য-

ভাষায় কথা বলছেন। এও অবশ্য কবির ভাষাই, উপমাবাহুল, ঝরঝরে, চলমান। না বিদ্যাসাগরের, না প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নের।

ট্র্যাজেডির মতো, এই কমেডিতেও একটি ধিক্কার রয়েছে—অযোগ্য পিতৃত্বের প্রতি। কলকাতায় হিন্দু কলেজের ছাত্র তার ছেলেটি বর্ণ ও রান্নার ব্যাপারে বাছবিচার করে কি না তা নিয়ে বিস্তর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে এক পিতা, কিন্তু তার নিজের কোনো বাছবিচার নেই, একটি মুসলমান মেয়েকে উপভোগ করার তালে আছে সে। ভক্তপ্রসাদ হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, সে অত্যাচারী। জমিদার ভক্তপ্রসাদ হিন্দু-মুসলমান মানে না: সে বাচস্পতির জমি ছিনিয়ে নিয়েছে, হানিফের স্ত্রীকে হস্তগত করতে চাইছে। অত্যাচারিত বাচস্পতি ও হানিফ এক হয়ে যায়, ভক্তপ্রসাদকে নাজেহাল করে তারা একযোগে, এক্ষেত্রে হানিফের গায়ের পেঁয়াজের গন্ধ কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি করেনি। হানিফ গাজী "নীলদর্পণের" তোরাপের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত ও বাস্তবিক। তোরাপ বাবুদের অধীনই থাকবে সব সময়ে। হানিফ গাজী বাচস্পতির সঙ্গে মিলে ভক্তপ্রসাদকে নাজেহাল প্রসাদকে নাজেহাল করবে।

পিতৃত্বের ব্যর্থতা উন্মোচিত করে দিচ্ছেন মধুসূদন, কিন্তু পিতৃভূমির প্রতি তীব্র গভীর অনুরাগ। তিনি ইংরেজ হতে চেয়েছিলেন, খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন, দু'বার বিয়ে করেছেন, দু'বারই মেমসাহেব, পোশাকে সাহেব, চিঠি লিখতেন ইংরেজীতে, নাম নিয়েছিলেন সাহেবী ধরনের, এবং ইংরেজীতে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন প্রথমে—সবই সত্য। কিন্তু তিনি তাঁর যথার্থ সৃষ্টির সময়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। তিনি অনিবার্যভাবেই বাঙালী। তাঁর জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক এবং সামন্তবাদ-বিরোধী, যে-গুণ সেযুগের জাতীয়তাবাদী চেতনায় তেমন ছিলো না।

কৌতূহলের বিষয় এই যে, মধুসূদন একটি সনেট লিখেছিলেন, নাম যার "কেউটিয়া সাপ"। কবিতার অষ্টকে সাপটি ভয়ঙ্কর, কিন্তু ষষ্ঠকে এসে কবি বলছেন—

কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ পদ্মকুলে।
কে সে? কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্ম-পথ ভুলে।

আমরা আশ্বস্ত হই যে, মাইকেল যথার্থ বাঙালীই, তাঁর সময়ের বাঙালী।

কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে তাঁর যাত্রা কোনো সামান্য ব্যাপার নয়।

আমার পুত্রকে

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

[সুকান্ত ভট্টাচার্যের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক]

একটি সুতীব্র চীৎকারের মধ্যে জন্ম হলো যে শিশুর
আমি তাকে স্বাগত বলি না।
ইলেকট্রিকের তারে লেজঝোলা ফিঙের সাহস নিয়ে
উচ্চকিত হলো আরেকটি বিপন্ন জন্ম,
আরো এক কুমীরের মৃত্যুমুখে বৈঠার আঘাত।

দোলনা দোলানো হাতে লেগে আছে বিচূর্ণিত কাম,
শিশু ভোলানোর গানে প্রতারক জীবনের চুমো।
আমি তাকে স্বাগত বলি না,
বলি না তোমার জন্য এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব,
বলি না আমার কোনো সুশোভন প্রতিশ্রুতি আছে।

বিরহ নদীর পারে তাড়িয়ে এনেছে এক সুনীল শঙ্খিনী,
এখানে তো অন্ধকারে বিষধর পাপ,
অনন্ত শাপের মধ্যে গণ্ডোলায় ভাসে যমদূত,
প্রহারে প্রহারে হবে নীলকণ্ঠ, প্রহরে প্রহরে হবে নীল।

তোমাকে ডাকবে পাখি, ছদ্মবেশী মরণের চর,
তোমাকে ডাকবে নদী, উচ্ছ্বাসের সলিল সমাধি,
তোমাকে ডাকবে নারী—ঈশ্বরের ছন্দায়িত ভুল,
তোমাকে ডাকবে ক্ষুধা, আগুনের রুদ্র বৈশ্বানর।

একটি সুতীব্র রোদনের মধ্যে জন্ম হলো যে শিশুর
আমি তাকে স্বাগত বলি না
বলি না আমার কোনো সুশোভন প্রতিশ্রুতি আছে,
কেননা আমিও এক অনাহূত রুদ্র বৈশ্বানর,
আমার তৃষ্ণার জল প্রতিশ্রুত নীল পাত্রে কেউই রাখেনি।

আমি তাকে স্বাগত বলি না,
বলি, বল অয়মহং ভো,
বলি আয়, ছিড়ে খাই প্রস্তরিত অবহেলা, খাই
অনন্তের কাটামুণ্ড, নৈঃশব্দের চিড়িক লোহুকে
প্রেমে হ' চতুর কৃষ্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে মিথুক অর্জুন,
পাষাণে পাষাণ হ', দ্রাঘিমাকে ছিন্ন কর অক্ষের কৌণিকে।
এসেছিস টেনে ধর দড়ির আধেক প্রান্ত, কাঁধে নে জোয়াল
তুই আর আমি আছি পাশাপাশি গ্যালির শ্রমিক,
আমরা দু'জনে মিলে গাইবো স্পার্টাকাসের মহিমা।

আমি তাকে স্বাগত বলি না,
শুধু বলি, হে পুত্র আমার
রণক্ষেত্রে অভিমন্যু থাকিস প্রস্তুত, থাকিস সপ্তম
রথীর মিলিত পরাক্রমে অবিজিত স্পর্ধার নায়ক
মুখর সমুদ্র ছেড়ে গুহার প্রশান্ত ছায়া মেখোনা কখনো

তোমাকে ডাকবে পাখি, ছদ্মবেশী মরণের চর,
তোমাকে ডাকবে নদী, উচ্ছ্বাসের সলিল সমাধি
তোমাকে ডাকবে নারী ঈশ্বরের ছদ্মায়িত ভুল

তুমি থেকো অনন্ত আশ্বিনে ফোটা শিশিরের ফুল
তুমি থেকো কবিতার ক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা
তুমি থেকো জ্বলন্ত ক্ষুধার মধ্যে অমৃতের তাপ...

ক্রৌঞ্চবধের পাপ যেনো স্পর্শ না করে তোমাকে।

দশটি কাব্যিকা

সৈয়দ হায়দার

১

কথা কি বলবে না আর, আবার কবে হবে দেখা ?
মনে রেখাপাত ক'রে নিজে আছো দিব্বি নিয়মে
ক'দিন পেয়েছি হিসেবেই আছে তাও দ্রুত কমে
দেখা না হওয়ার দিন যতো যায়—থাকে তা যে লেখা !

২

অন্ধকারের মাঝে রাত বাজে বারোটা, একটা
কয়েকটা ফুল এখনো ফোটেনি ব্যথিত গাছটা
আমার সঙ্গে তুমি যাবে ধরো আমার হাতটা।
অন্ধকারের মাঝে রাত বাজে বারোটা, একটা।

৩

আমি ঋণী, আমি ঋণী, আমি ঋণী, আমি ঋণী, ঋণী
আমি চিনি তুমি নদীর ভেতরে ফুল হ'য়ে ফোটো
আমি চিনি তুমি জীবনের দ্বীপ হ'য়ে জেগে ওঠো
আমি ঋণী, আমি ঋণী, আমি ঋণী, আমি ঋণী, ঋণী।

৪

আমি সারাদিন আমার সঙ্গে আঁতাত করবো
যা বলবো কথা আমারই সঙ্গে সারারাত ধ'রে
বোঝাপড়া হবে আমারই সঙ্গে দিনরাত ভ'রে
আমি দিনরাত আমার সঙ্গে আঁতাত করবো।

৫

এ ক'দিন বড়ো গোলমাল হ'য়ে গেছে—ব'সে ব'সে
টানি ক'ষে বন্ধনের সুতোটি, কেটে আসে স'রে,
রক্ত ঝরে। সে সেখানেই মেলে খাদ্যে-কাঁকরে,
টানি যতো রক্তাক্ত হয়েছি মমত্ব বশে।

৬

দু'দিন কষ্টে তারপর সব ঠিক হ'য়ে যাবে।
তুমি পাবে নতুনের বীজ আমি পাবো চাষ-বাস
ফিরে যাবো ব'লে চলিনি কখনো টেনে ধ'রে রাশ
দু'দিন কষ্টে যাবে তারপর সহজে হারাবে।

৭

যেটুকু সত্য তা হ'লো আমার বোধের স্বদেশ
এই নদী এই মৃত্তিকা নিয়ে কাটাবো জীবন
সকলি মিথ্যা সকলি মিথ্যা দেয়া-নেয়া মন
যেটুকু সত্য তা হ'লো আমার বোধের স্বদেশ।

৮

আমার নামের চিহ্ন কোথাও পেলে ধুয়ে দিও
টেনে নিও ঘাস ঐ ভালো আমি জন্মাবো গাছ
নদীতে খেলার বয়স ফুরায় কোথায় সে মাছ?
আমার নামের চিহ্ন কোথাও পেলে মুছে দিও।

৯

যখনই ফিরছি পিছনে পিছনে ভেবেছি আসবে
কে ডাকবে তুমি ছাড়া, আছে কেউ আমার নিজের?
আমি প'ড়ে আছি বহু নীচে গড়া তোমার ব্রীজের
খুবই মিথ্যায় নিজেকে ভেবেছি—আমাকে ডাকবে।

১০

এই নাও সঞ্চিত প্রীতি, আরো নাও ভালোবাসা
যদি আশা পাও যাও অন্যের দুয়ারে দুয়ারে
অভ্যাস নেই ফিরে যাওয়া কারো ডাকি বারে বারে
এই নাও সবই ফিরিয়ে দিলাম, রইলো দুরাশা।

থাকতে পারি
সাইফুল্লাহ্ খালেদ

থাকতে পারি, এই দুঃস্বপ্নের কুয়াশা-ঘেরা
রাত্রির অন্ধকার জঠরেও থাকতে পারি
এবং আছি, অনেক কাল, মানুষ
যেমন নিরন্ন, জঠর জ্বালা নিয়েও থাকে আঁস্তাকুড়ে,
ফুটপাথে দু'টি হাত বাড়িয়ে রোদ্দুরে
কোন পথিকের কৃপার আশায়।
তেমন থাকতে পারি, তাদের সাথেই,
যদি জানি কিছুকাল, এই অগ্নিপরীক্ষার
চিকণ দড়ি বেয়ে পৌঁছে যাব তেমন
ঠিকানায় একদিন, সেখানে সকলের সকল
ইচ্ছার, অপেক্ষার হবে কৃপাহীন অবসান।

নতুবা পুড়েই যাব,
থাকবো না, এভাবে অপেক্ষার ছুরিতে
বিদ্ধ হয়ে নিষ্ফলা ক্ষতবিক্ষত হয়ে
থাকবো না ; বিস্ফোরণ ঘটাবোই,
মানুষেরা ঘটাবেই একদিন।

সম্ভবত সূর্যাস্ত হবে
মামুন নেসার মাহমাদ

সম্ভবত সূর্যাস্ত হবে
কিন্তু তাই বলে যে সূর্য উঠবে না, কে বলেছে

উত্তর প্রদেশে
কলঙ্কিত মেঘেরা এখনো ঝরেনি
ছেলেগুলো খেলতে গিয়ে
গোধূলির আলোয় মেতেছে
খেলা ছেড়ে ওরা এখনো ফেরে নি

আলো জেবলে রেখে
মায়েরা অন্ধকারে গিয়েছিল, খাবার খুঁজতে
আলোতো এখনো নেভে নি!

আমাদের বসত বাটির পুরনো প্রাঙ্গণে
সবাই এসেছিলো, আমার পিতা,
পিতামহ এবং প্রপিতামহ
সূর্যাস্তে নদীর জলে বিম্বিত মরা রোদে
স্বপ্ন লুকোবে বলে
যে যুবকেরা কলেজ, ইশকুলে
হাটে বাজারে
আলো নেই, আলো নেই চীৎকারে সারারাত
নিমগ্ন সৌরভে ডুবে থাকে
তারা তো এখনো ফেরেনি

বুড়ো দাদুর প্রিয় প্রাচীন দেয়ালে
সবুজ ঘাসের রোয়া জেগেছিলো
আলো-অন্ধকারে হারাতে হারাতে
আমাদের কেউ কেউ বললে
ওগুলো ধানের বীজ
এবং কেউ কেউ নড়বড়ে দেয়ালের দেহে
শিকড় প্রবিষ্ট করালো

টেবিলের কোনে বিশাল দেয়ালে
ফ্রেমে বাঁধানো ছিলো দিদার ছবি,
ওরা ফুল নিয়ে এলো, সাজালো ফুলের মালা
মৃত্যু-গন্ধ মাখা ওসব ফুলে
দিদা—শোভিত হলেন, আমরা কর্তব্য সমাপ্ত ভেবে
পুনরায় মদির জলে
বৃষ্টি ও রোদের পৃথক বৈকল্যে ডুবে যাই

আভরণহীন ফুলের শয্যায়
কিভাবে লুকিয়ে ছিলো ছারপোকা
ওরা ফুল কুরে কুরে
বাদামী চুল বানালো, আমাদের অগোচরে

প্রস্থান অত্যাসন্ন ভেবে
আমরা পূর্বাগত অতিথির মতো
ফিরতে থাকলাম; আমাদের রুদ্ধ প্রবেশ দ্বারে
অথচ অস্থির প্রলাপের মতো
আমরা 'পতাকা ওড়াবো,' 'পতাকা ওড়াবো'
বলে চীৎকারে ধ্বসরিত হলাম

কিন্তু পতাকা ওড়ানোর আগে
আমাদের রুদ্ধ দ্বার খুঁড়ে ফেলতে হবে
আমরা ভুলে যাই,
যার ফলে আমাদের নিকটবর্তী হল
অবাধ সন্ধ্যা, সূর্যাস্তের নীল ঘণ্টা
বাজতে শুরু করে

সম্ভবত সূর্যাস্ত হবে
কিন্তু তাই বলে যে সূর্য উঠবে না
কে বলেছে

অবাধ আলোতে পতাকা ওড়াতে হলে
প্রয়োজন একটি সূর্য ওঠার,
যার কুয়াশায় সিক্ত হবে
আমাদের নতুন পতাকা,
দেয়ালের দেহ থেকে প্রস্ফুটিত হবে
কোন এক বৃক্ষ মহীরুহ
ফুল্লোলিত পবিত্র সুষমায়
যুবকেরা আলোকিত হবে।

প্রয়োজন একটি সূর্যোদয়ের
যে সূর্যোদয় আমাদের মায়েরা
জেবুলে রেখে গেছে।

কোরিয়ার কবিতা

লী স্যুল জু'র কবিতা

অনুবাদ সমরেশ দেবনাথ

[লী স্যুল জু কোরিয়ার প্রখ্যাত কবি। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় কোরিয়ার জন-জীবন, পল্লীর সৌন্দর্য এবং লোকজ উপাদান চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। তাঁর কবিতায় অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ এবং স্বপ্নোজ্জ্বল কোরিয়ার ভবিষ্যৎ-শঙ্খনাদ শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতায় রয়েছে একটি মিষ্টি-মধুর আমেজ। অধিকাংশ কবিতাই অনুভূতিপ্রধান—সহজেই হৃদয়কে নাড়া দেয়। কবিতায় করুণরস সৃষ্টির কারণেও তিনি বিশিষ্ট।]

বাতাসের মন্দির

পর্বতের উপর দিয়ে চাঁদ একাকী হাঁটছে
বৃদ্ধ যাজক এখনো ফেরেনি
প্রণয়রসে ঘুঘুদের পাখায় বাতাস দুলছে।

যুবতী বিধবা

রক্তের লহমার মতো সন্ধ্যা আসছে
আমাদের এই পৃথিবীর চৌহদ্দিতে
বন্যপাখি কাঁদছে পাহাড় চূড়ায়
যেখানে একদিন ফুলশয্যা পাতা হয়েছিল
যুবতী বিধবা, আহা শোকের বহতা নদী
কুমড়ো লতাটি একাকী ঝুলছে।

ফুল বিক্রেতা

সে আসে পর্বত মাথায় নিয়ে
মেঘ আর বিদ্যুৎ ডিঙিয়ে
যেন একটি নবীন হরিণ
কোকিলের ঘুম ভাঙিয়ে!

দিগন্তে সন্ধ্যার রক্তিম ছাপ
নদীতে যৌবন আসন্ন—
ধীবরেরা পানাহারে মত্ত
ফেরিঘাট তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু
পারাপার আজ বিপন্ন!

বিত্তহীন বৃত্তে

হাবিব রহমান

ঘটনাটা ঘটলো একেবারে কাল-সন্ধ্যায়। অন্ধকার তখনো গাঢ় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রাস্তার ধারে বাঁশঝাড়ের নীচে কলতলায় অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে। আশেপাশে কিছু কিছু বন-জঙ্গলের ঝোপ আর গাছ-গাছালি। এ কারণে কলতলাটায় অন্ধকার একটু বেশি। গরমকালে সন্ধ্যার আগে থেকেই এখানে স্নানের ধুম প'ড়ে যায়। নিকটবর্তী বাড়িগুলোর ছেলেবুড়ো সবাই গা ধুতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বদনায় বালতিতে ভাড়ে যে যেরকম পারে পানি তুলে সুবিধে-মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে মাথায় ঢালে। বয়স্করা তাদের ধুলিধূসরিত উদোম বাচ্চাদের একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং পানি তুলে এনে মুখে 'ও আল্লা আল্লা' ব'লে সুর ক'রে ওদের মাথায় ঢেলে দেয়। মুখে ও-রকম না বললে বাচ্চারা স্নান বাপের বাড়ি থেকে। অভাব অনটনের মধ্যেও ওটা বিক্রি করতে দেয়নি করার ফলে সমস্ত কলতলাটা ভিজে থাকে। প্রচন্ড গরমের মধ্যেও তাই এখানে এলেই মনে হয় ঝলসে-যাওয়া দেহটা বুঝি একটু শীতল হলো।

কামলা খেটে ঘরে ফিরে গেল সনের পুরনো মাথালিটা বারান্দার বাঁশের খুঁটিতে একটু লম্বা ক'রে রাখা গিরোয় টাঙিয়ে রাখলো নবীছদ্দীন। নিড়ানিটা রেখে দিলো খড়ের চালের উপর একটু সেধিয়ে। তারপর কাঁসার বদনাটা হাতে নিয়েই চলে এলো কলতলায়। বদনাটা ওর বৌ এনেছিলো বাপের বাড়ি থেকে। অভাব অনটনের মধ্যেও ওটা বিক্রি করতে দেয়নি নবীছদ্দীনের বৌ। বাপকে কলে আসতে দেখে মেজো ছেলেটি বায়না ধরেছিলো—বাপ গো আমুও যাবো তোর সাতে।

প্রচন্ড এক ধমক মেরেছিলো নবীছদ্দীন ছেলেকে। মেজাজটা ঠিক নেই ওর। জ্যৈষ্ঠের খাঁ খাঁ রোদ আর ভ্যাপসা গরমে প্রায় সারাদিন না-খেয়ে বাঁশগাড়ির মাঠে ডাক্তারের ধান খেত নিড়িয়েছে ও। এ-বছর কামলা-দের কেউ খেতে দিচ্ছে না অভাব বেশি ব'লে। এর আগে দুপুরে একবার ক'রে ভাত কিংবা রুটি খেতে দিতো। ধান গাছের পাতায় বাম হাতটার নীচের অংশ কেটে কেটে গিয়েছে নবীছদ্দীনের। নোনা ঘাম লেগে সারা-দিন ধ'রে পিট পিট ক'রে জ্বলেছে। এখনো থামেনি জ্বলুনিটা। মেজাজ কি আর এমনি এমনি খারাপ হয়!

ধমক খেয়েও ছেলেটা পই পই করে এসেছে বাপের পেছনা পেছন। কলতলায় এসেই ঠান্ডার একটা আবেশ অনুভব করে নবীছদ্দীন। মেজাজ-টাও একটু ঠান্ডা হয়। কলে তখন বেশ ভিড়। তারই মধ্যে সুযোগ ক'রে এক বদনা পানি ধ'রে আগে ছেলেটার মাথায় অল্প অল্প ঢেলে দেয়। তারপর পরম যত্নে ওর গা ঘষে। এরপর আরও এক বদনা পানি ঢেলে বলে —দাঁড়া একেনে, আমুও দুই বদনা মাথায় ঢেলে নিই।

কলের হাতল চাপছিল তখন বছর দশ-বারো বয়সের একটি ছেলে। নবীছদ্দীন তাকে ধমক দেয়—দেকি সর সর। ভুঁই নিড়িয়ে আইচিস নাকি যে এত ছ্যান করা লেগেচে।

হুপ হুপ ক'রে পরপর দুই বদনা পানি মাথায় ঢেলে খুব আরাম বোধ করে নবীছদ্দীন। যেন বেহেশতের আরাম। শরীরটা জুড়িয়ে যায়। মনটাতেও বেশ স্বস্তি লাগে। চান্দু গেছে ডাক্তারের বাড়ি মজুরির টাকা আনতে। এতক্ষণে ফিরলো বোধহয়। ও ফিরলেই দৌড়তে হবে চাল নুন তেল কিনতে। বৌ-ছেলেমেয়েও তারই মতো উপোস দিয়েছে সারা-দিন। নিজের আর বৌ-এর জন্য নবীছদ্দীনের তত ভাবনা নেই। ওরা বড়, খিদে সয়ে নিতে পারে। কিন্তু বাচ্চারা পারে না, বড্ড জ্বালাতন করে। ওদের ছটফটানি সইতে পারে না নবীছদ্দীন। মাটির গভীর তল থেকে উঠে-আসা ঠান্ডা পানিতে কলজেটা শীতল হয়ে আসার সংগে সংগে পেটের মধ্যে খিদেটা আবার মারমুখো হয়ে ওঠে। এমন সময় চান্দু এসে ডাকে—নৈছদ্দী মামু আচো একেনে?

—এই তো ছ্যান কচ্চি। আনিচিস?

—তুমার তলাশ কত্তি গিইলামি বাড়ি। মামী কলে যে ছ্যান কত্তি গিয়েচে।

—তোর মামীর কাচে দিয়ে আইচিস?

—না, টাকা পাইনি।

—পাসনি মানে?

—ডাক্তার হাটে গিয়েছে। হাটেতো না আসলি—

—বাড়ি থুয়ে যায়নি?

—না।

—না তো একন খাবো কি ঘুড়ার কচু? কাল রাত্তিরি খাইচি সব মুটো মুটো ভাত। সারা দিনডের মদ্যি কাউরির পেটে কিচু পড়িনি। আর তুই এসে একন কচ্চিস যে টাকা পাইনি। আমি কলাম ও-শালার ভুঁইতি নিড়োতি যাবো না। তুই-ই জোর ক'রে নিয়ে গেলি। কলি যে এক টাকা ক'রে বেশি দিবেনে। একন মজা বোজ।

সত্যিই ডাক্তারের খেত নিড়াতে যেতে চায়নি নবীছদ্দীন। ডাক্তার লোকটা সুবিধের নয়। ওর মুখে মধু পেটে বিষ। ওকে সহ্য করতে পারে না নবীছদ্দীন। ও ওষুধে পানি মিশোয়, দাম বেশি ক'রে নেয়। দেশী সস্তা ওষুধের লেবেল উঠিয়ে ইন্ডিয়ার ওষুধ ব'লে চড়া দামে চালায়। লেবেল উঠানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে হেসে বলে, বাপরে ইণ্ডিয়ার ওষুধ, ধরা পড়লে নির্ঘাত জেল। লোকটা নামেই ডাক্তার, আসলে চিকিৎসার কিচ্ছু জানে না। নবীছদ্দীনের মেয়ের গেল বর্ষায় জ্বর হয়েছিলো। ওকেই ডেকেছিলো নবীছদ্দীন। মেয়েটা মরবার উপক্রম হয়েছিলো। শেষে অন্য ডাক্তার ডেকে মেয়েকে সারিয়ে তোলে। তাতে অনেক পয়সা খরচ হয়ে যায় নবীছদ্দীনের। শুধু কি তাই, লোকের দলিলপত্তরের ফাঁক-ফোঁকর খুঁজে বের করে অই ডাক্তার। তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করায়, মামলা বাঁধায়। এই ক'রে নিজে মজা দেখে আর মজা লোটে।

তবু যে ডাক্তারের খেতে গিয়েছিলো নবীছদ্দীন সে ঐ এক টাকা বেশি পাবে ব'লে। এ-বছর মজুরি বারো টাকা। চান্দু বলেছিলো ডাক্তার দেবে তেরো টাকা। নবীছদ্দীনের কাছে ঐ বাড়তি এক টাকার মূল্য অনেক। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তো এক পয়সাও পাওয়া যাচ্ছে না। শরীরটা জ্বলে উঠলো দপ ক'রে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বৌ-ছেলেমেয়ের ক্ষুধা-কাতর বিষণ্ণ মলিন মুখ। ঈষৎ ঘন অন্ধকারে চান্দুর নীরব মুখের প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো নবীছদ্দীন

—তা'লি তুই দে টাকা।

—আমি টাকা কনে পাবো। আমার তাই কিডা কইলো।

—কনে পাবি তার আমি কি জানি। য্যানতে পারিস এনে দে।

—এ তুমার অন্যায় কতা মামু।

—অন্যায় কতা! শালা তুই নিয়ে গেলি ক্যান ওর ভুঁইতি।

—আমি কি তকন জানতাম যে ও এইরাম করবে।

—জানতিস নে তো একন তুই টাকা দে শালা।

—তা ঐরাম শালা শালা কচ্চ কেন তুমি? তুমার সঙ্গে কি বুন বিয়ে দিইচি। ভদ্দরভাবে কতা কিত পারো না?

—ম্যালা বকিসনে হারামজাদা। টাকা ফেলে কতা ক'। নাইলে আজ তোর নিস্তার নাই।

অনাহারী পরিশ্রান্ত চান্দুও এবার খেপে ওঠে—ক্যান্ কি করবা আমার? তেজ দেখাবা ডাক্তারের কাছে দেখাও গে।

—হাতে এই বদনা দেখচিস তো, এক ঘাইতি শেষ ক'রে ফ্যালাবো।

—শেষ করাডা মুকির কতা, না?

—শালা আবার কতা কচ্চিস। ব'লেই চকিতের মধ্যে, কেউ কিছু বোঝার আগেই হাতের কাঁসার বদনা দিয়ে চান্দুর মাথায় প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করে নবীছদ্দীন। মুহূর্তেই মাটিতে প'ড়ে যায় চান্দু। গল্ গল্ ক'রে রক্ত বেরোতে থাকে তার মাথা দিয়ে। হৈ চৈ ক'রে ছুটে আসে লোকজন। জবাই করা ছাগলের মতো খানিকক্ষণ হাত-পা দাপিয়ে নিথর হয়ে যায় সকাল থেকে উপবাসী কর্মক্লান্ত উনিশ বছরের কৃশ তরুণ চান্দু।

নিথর হয়ে যায় নবীছদ্দীনও। চান্দুর মতো সে-ও যেন মৃত। ভিড় করা মানুষের নানা প্রশ্ন, জল্পনা-কল্পনা আর বৌ-ছেলেমেয়ের আর্ত কান্নাও যেন ওর কানে প্রবেশ করে না। ও যেন বোবা, ওর ভাষা নেই। ও যেন চেতনাহীন, ওর ভয়-ভাবনা শোক-দুঃখ কিছু নেই। উঠোনে জড় পদার্থের মতো বসেই আছে। কলতলা থেকে কে যেন তাকে হাত ধ'রে বাড়ি এনে-ছিলো। তারপর ওখানেই বসে পড়ে সে। সারা উঠোন কৌতূহলী মানুষে ভরা। বারান্দায় ভবিষ্যতের ভয়াবহ আশঙ্কায় দু'হাত মাটিতে আছড়ে আছড়ে উন্মাদিনীর মতো কাঁদছে নবীছদ্দীনের বৌ। তিন-চারটি বাড়ির ওপাশ থেকে ভেসে আসছে চান্দুর মায়ের মর্মভেদী বুকফাটা কান্না।

এমন সময় ডাক্তার আসে। হাতে একটা থলে। হাট থেকে বাড়ি ফিরেই সে সমস্ত ঘটনা শুনেছে। তারপর সের খানেকের মতো চাল আর কিছু তরকারি একটা থলের ভ'রে নিজেই ছুটে এসেছে।

—কই রে নৈছদ্দী কই? ডাক্তারের কণ্ঠ শুনে সমাগত লোকজন নবীছ-দ্দীনকে দেখিয়ে দেয়। ডাক্তার বলে—আমি তোদের জন্য চাল কিনতে গেলাম হাটে আর এরই মধ্যে খুন খারাবি করলি? একটু তর সইলো না? এখন কী হবে?

নবীছদ্দীনের বৌ বারান্দা থেকে ছুটে এসে ডাক্তারের পা জড়িয়ে হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে ওঠে—আপনি আমাগের বাঁচাও চাচা। আমাগের কী হবে!

—আহা পা ছাড়ো—পা ছাড়ো। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে দাও। কাজ যা করেছে ত'তো আর লুকনো-চুরনো না। থানায় খবর না দিয়ে কোন উপায় নেই। কইরে নৈছদ্দী, ওঠ্ দেখি।

কিন্তু নবীছদ্দীন ওঠে না। কথাও বলে না। ঠিক তেমনি বসে থাকে অথর্বের মতো।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে মাইল চারেক দূরবর্তী থানা থেকে পুলিশ আসে। কিন্তু পুলিশের কথারও জবাব দেয় না নবীছদ্দীন। কেবল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে। ও যেন ভাষা ভুলে গেছে। কিংবা কথা বলতে জানে না।

ঘটনাস্থলে যারা উপস্থিত ছিল তাদের কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ লিখে নেয় পুলিশ। লোকজনের নিকট থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ডাক্তারের

সঙ্গেও তাদের কথা হয়। তারপর চান্দুর লাশ বেদে পাটিতে (খেজুর পাতার বিছানা) মুড়িয়ে গরুর গাড়িতে তুলে এবং নবীছউদ্দীনকে বেঁধে নিয়ে তারা রওনা হয়। রওনা হয়ার আগে নবীছদ্দীন তার রোগগ্রস্ত প্রায় শয্যাশায়ী বড় ভাইকে কেবল একটা কথা বলেছিলো—উরা থেকলো, ওদের—

উদগত কান্না কণ্ঠ চেপে ধরায় সে আর কিছু বলতে পারে নি।

থানায় পুরো একটা দিনেও নবীছদ্দীনকে কথা বলানো যায় নি। এমনকি খাওয়ানোও যায় নি। হঠাৎ-রুদ্ধকণ্ঠ মানুষের মতো কেবলই অসহায়ভাবে চেয়ে থেকেছে। একজন পুলিশ না পেরে ওর উরুতে বুটের লাথি মেরেছিলো। দুর্বল নবীছদ্দীন তাল সামলাতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে প'ড়ে গিয়েছিলো মাটিতে। কিন্তু আশ্চর্য, ওর মুখ দিয়ে ব্যথার কোন স্বরই বেরোয়নি। দ্বিতীয় দিনে থানার দারোগা রিপোর্ট লিখে আদালতে চালান ক'রে দিলেন খুনী নবীছদ্দীনকে।

নবীছদ্দীনের খুনের অপরাধের আজ প্রথম শুনানি। ডাক্তার ভরসা দিয়েছে একেবারে প্রথম দিনেই তাকে সে জামিনে ছাড়িয়ে আনবে। তার জন্য নাকি জাঁদরেল উকিল লাগানোর ব্যবস্থা করেছে সে। নবীছদ্দীনের বড় ভাই রোগশয্যা ছেড়ে অনেক কষ্টে আদালতে এসেছে। সঙ্গে এসেছে ডাক্তার আর ক'জন প্রতিবেশী।

ওরা পেঁছনোর কিছু পরে পুলিশের হেফাজতে জেলখানা থেকে নবীছদ্দীনকে আদালতে আনা হ'লো। নবীছদ্দীনের বড় ভাই তখন ওরই জন্য অপেক্ষা করছিলো বারান্দায়। খুব ধীর পায়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছিলো নবীছদ্দীন। হাতে হাতকড়া, আগেপিছে পুলিশ। দেখেই বোঝা যায় অত্যন্ত দুর্বল। নবীছদ্দীনের বড় ভাই ওর পাশে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে—কোন চিন্তা করিসনে। ডাক্তার কয়েছে যে ভয় নেই। ছোট বৌর কাচেত্তে হাতের টিপ নিয়েছে। কয়েচে যে ঐ কাগজ দিয়ে তোরে ছাড়িয়ে নেবে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নবীছদ্দীন। ভাইয়ের মুখের দিকে নীরবে তাকায়। চোখ-মুখের ভাব শক্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ পেছন থেকে ঠেলা দিয়ে এগিয়ে দেয় তাকে।

আদালতে পেঁছে পুলিশ কাঠগড়ায় তুলে দেয় নবীছদ্দীনকে। এখন ওর হাতে আর হাতকড়া নেই। কাঠগড়ার রেলিঙ দু'হাতে ধ'রে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে সে। বিশীর্ণ ভেঙেপড়া গাল খোঁচা খোঁচা রুক্ষ দাঁড়িতে ভর্তি। চুল এলোমেলো। ফরিয়াদী পক্ষের উকিল জজের অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন—তোমার নাম কি নবীছদ্দীন?

নবীছদ্দীন কোন জবাব দেয় না। মুখ তুলে চায়ও না। উকিল আবারও ঐ একই প্রশ্ন করেন। কিন্তু এবারও সে নিরুত্তর। যেন জীবনে ও আর কখনো কথা বলবে না। তৃতীয়বারেও যখন সে নতমুখে নিরুত্তর রইলো, তখন জজ নিজেই কথা বললেন—আমার দিকে তাকাও।

এবার মুখ তুলে চাইলো নবীছদ্দীন। তাকালো সোজাসুজি। চোখ পড়লো ডাক্তারের উপর। কোটরাগত দু'টি ম্লান চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়লো। মনে হলো সে আগুন ডাক্তারকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে। জজ জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি নবীছদ্দীন?

নবীছদ্দীন তখনো ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে। মুখের রেখা শক্ত। চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। জজ আবারও বললেন—আমার কথার উত্তর দাও। তোমার নাম কি নবীছদ্দীন?

এবার নবীছদ্দীন চোখ ফেরালো জজের দিকে। ঠোঁট দুটো একটু নড়ে উঠলো। তারপর অস্ফুট স্বরে বললো—জে হুজুর।

—তুমি চান্দুকে চিনতে?

—জে হুজুর।

—তুমি কি চান্দুর মাথায় কাঁসার বদনা দিয়ে আঘাত করেছিলে?

—জে হুজুর।

—কেন করেছিলে?

—হুজুর, ছেলেপিলে নিয়ে না খেয়ে রোদির মদ্যি সারাদিন জন খেটে সন্ধেবেলা—

এই পর্যন্ত বলার পর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো তার ঠোঁট দুটো। দু'চোখে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নবীছদ্দীন স্পষ্ট দেখতে লাগলো তার চোখের সামনে হাত-পা দাপাচ্ছে চান্দু, মাথা দিয়ে অনর্গল রক্ত ছুটছে, তার মায়ের বুকফাটা কান্না, নিজের বৌ-ছেলেমেয়ের করুণ মুখ আর টিপ নেওয়া ডাক্তারের সেই কাগজ। মাথার মধ্যে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে সে প'ড়ে গেলো কাঠগড়ার মধ্যে। তার বিস্ফারিত চোখ থেকে তখনো ঠিকরে পড়ছিলো আগুন।

সেই হুইল চেয়ার

রফিকুর রশীদ

দীর্ঘদিন ধরে বুকের মধ্যে এক পুরানো ব্যথা নিয়ে বাস করছেন রবিউল হোসেন। ঘোলাজল একসময় তো থিতাবেই। রবিউল হোসেনের বুকের ব্যথাটাও তেমনি দীর্ঘ সময়ের ধূসরতায় আপনার বর্ণটা হারিয়েছে, চারপাশের স্বতঃস্ফূর্ত কলহাস্যে নিজের দুখী দুখী চরিত্রটাও গুলিয়ে ফেলেছিল প্রায়। ব্যথাকে ব্যথা বলে চেনাই যায় না এমনি অবস্থা। হঠাৎ আজ সকালে সেই ব্যথাটা হামাগুড়ি দিয়ে এসে যেন বুকের সব ক'টা দরজা জানালা খুলে দিয়ে গেল। হুইল চেয়ারের মত সামান্য এক জড় পদার্থ চিন্তায় এনে দিল গতিময়তা আর এতদিনের রুদ্ধগতি ব্যথার ধারায় এনে দিল বেগময় বহতা।

রবিউল হোসেন ভাবছেন। গত পনেরটা বছর তো তিনি হুইল-চেয়ারেই যেটুকু পেরেছেন চলাফেরা করেছেন। এমন কথা তো কই আগে ভেবে দেখেননি! এমন কি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে যেদিন এই হুইল চেয়ারটা পাওয়া গেল, সেদিনও এমন ভাবনার উদয় হয়নি। বরং হারানো দু'টো পায়ের পরিবর্তে চার চাকার যন্ত্রটাকেই মেনে নিয়েছিলেন। যুদ্ধে গিয়ে পা হারিয়েছেন তাতে কি! দেশটাতো স্বাধীন হয়েছে! চার পাওয়ালা এই চেয়ারটাতো তাঁর পুরস্কার। চারটি চাকা তো শুধু নয়, এ যেন তাঁর প্রিয় স্বাধীনতার চারটি স্তম্ভ! ভাবতে ভাবতে বিমুগ্ধ হাতে চেয়ারটার ধাতব চারটি চাকার স্পর্শ অনুভব ক'রে নড়ে চড়ে বসেছিলেন। যাক, এখন থেকে অন্তত এক আধটু নড়া চড়া যাবে। বাব্বা! ক'টা মাসে একেবারে শেকড় গেঁড়ে গেছে যেন! এবার নড়ে চড়ে নিজের ডালপালায় হাওয়া লাগানো যাবে। সেদিনের ভাবিনাটা এই রকমই ছিল। এটুকু স্বস্তির মধ্যেই দু'টো পা হারানোর বেদনাকে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। ভুলেই গিয়েছিলেন, নাকি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত ক'রে ঐ বোধটুকুর উপরে দু'কোদাল মাটি চাপা দিয়েছিলেন কে জানে!

এতদিন পর আজ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়লো সেই বেদনার বৃক্ষ। রবিউল হোসেন আবিষ্কার করলেন, গত পনের বছরে তিনি একটুও নড়া-চড়া করেননি। কই নাহ্, একটুও না।

এঘর থেকে ওঘর, কিংবা ওঘর থেকে বারান্দায়, অথবা বাগানের ভাঙা রেলিঙের কাছ পর্যন্ত তার যাতায়াত ছিল এটা সত্যি। কিন্তু সেকি একে-

বারে নিজের ইচ্ছেতে নিজে নিজেই যাওয়া! বড় বৌমার কোলের বাচ্চাটা পাছায় হেঁটে আপন ইচ্ছেমত কিছুটা যেতে পারে। কিন্তু রবিউল হোসেন পারেন না। রবিউল হোসেন এখন অনেক কিছুই পারেন না।

মাঝে মধ্যে রাত বিরেতে পুলিশ আসে। জিজ্ঞেস করে, আজমল হোসেন আপনারই ছেলে? ইচ্ছে করে অস্বীকার করতে, মিথ্যে বলতে। কিন্তু পারেন না। প্রথম পুত্রকে অস্বীকার করলে যে মমতাকেই ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয়! নাহ্! তাও কি সম্ভব! প্রকৃতির নিয়মেই তো সরে গেছে। আবারো তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে কোথায় যেন বাঁধে। রবিউল হোসেন তবু সেই মমতাকেই বিড়বিড় ক'রে কত কি বলেন, আজমলকে নিয়ে দুঃখ করেন, ছোটমেয়ে রিনার বিয়ে সংক্রান্ত কেলেঙ্কারীর জন্য কৈফিয়ত দেন। এক সময় অবসাদে গ্রাস করে সব ভালো ইচ্ছেগুলো।

ছেলেটা কি যে করে! করে একটা-কিছু সেটা বোঝা যায়। সংসারটা তো চলছে তারই উপার্জনে। ব্যাংক ছাঁটাইয়ে কেরানীগিরিটা চলে গেলে কিছুদিন বেশ কষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু কেমন করে যেন আজমল সবকিছু ম্যানেজ ক'রে ফেললো। সংসার এখন রীতিমত ভালো চলছে। বাড়ি-ঘর-দোর শুধু নয়, বাপের দিকেও নজর দেয়। হুইল চেয়ারের হাতলের সঙ্গে একটা বাস্কেট ঝোলানোর ব্যবস্থা করেছে, পড়তে পড়তে বই-খবরের কাগজ রাখার জন্য। দৈনিকের সঙ্গে দু'টো সাপ্তাহিকও যোগ করেছে ইদানীং। পিতা-পুত্রের দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় ঘটেই না। কিন্তু তবু যেন রবিউল হোসেনের মনে হয়, আজমল সর্বদাই দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর হুইল চেয়ারের পেছনে, হাতলে হাত রেখে। তাঁর যেটুকু নড়াচড়া, চলাফেরা, তা যেন চেয়ারের হাতল দু'টোতে আজমলের হাত লেগে আছে বলেই। কী ভীষণ তীক্ষ্ন নজর ওর! কবে কখন বাতের ব্যথা বাড়ছে, ঠিকমত ওষুদ-পত্তর খাওয়া হচ্ছে কি না—নজর তার সবদিকে। গত পরশু রিনার শ্বশুর-বাড়ির লোকজন এলে সবার সঙ্গে বাবাকেও চিনিওয়ালা চা দেয়া হয়েছিল বলে সন্ধ্যাবেলায় বৌটাকেই পর্যন্ত বকাবকি করলো। এ অপরাধের জন্য রবিউল হোসেন বৌমাকেই অবলীলায় ক্ষমা করে দেন, কিন্তু আপন ছেলে আজমলকেই যেন ক্ষমা করতে পারেন না। বৌমা পরের মেয়ে, তবু তারই মুখের আদলে যেন মমতাকে খুঁজে পান। মমতাময়ী এই মেয়েটির কোনো ত্রুটিই তাঁর চোখে পড়ে না। বিয়ে করে রিনা বাড়ি ছেড়ে যাবার পর থেকে ব্যাপারটা আরো বেড়ে গেছে। আজকাল এমন কথাও কানে আসে—রিনা নাকি ওর ভাবীর প্রশ্রয়েই এমন কাজটা করতে পেরেছে; রিনার বর নাকি বৌমার কেমন দূর সম্পর্কিত মামাতো ভাই...ইত্যাদি। এত জেনেও রবিউল হোসেন সত্যি সত্যি এই মেয়েটার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাঁড় করাতে

পারেন না। কোর্ট-কাচারিতে উকিলরা যে যেমন ক'রে সব মিথ্যে অভিযোগ সাজিয়ে গুছিয়ে প্রমাণ পর্যন্ত ক'রে ফেলে, তাই ভাবেন তিনি। উঠোনে কলহরত দু'টো শালিকের ঝগড়াঝাটি শোনেন, উপভোগ করেন; কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভাবনাগুলো গুলিয়ে যায়। মনে হয় তিনি ঠিক যেমন ক'রে ভাবতে চাচ্ছেন, পেছনে দণ্ডায়মান আজমল তা ভাবতে দিচ্ছে না। ভাবনার জগতে পর্যন্ত ও যেন সূক্ষ্ম এক নিয়ন্ত্রণের সুতো ফেলে রেখেছে। মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। পিছনে ফিরে তাকান তিনি। নাহ্! কেউ নেই! চেয়ারের হাতলে কারো হাত নেই! ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখেন, সত্যি সত্যি আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। ভৌতিক এক ভাবাচ্ছন্নতায় ম্রিয়মান হয়ে পড়েন তিনি। নিজের ভেতরে শক্তিশালী যুক্তি খোঁজেন। ভাবতে ভাবতে এক সময় নিজেও কেমন উকিল হয়ে ওঠেন। এবং তখন আর কিছুতেই আজমলকে ক্ষমা করতে পারেন না। আজমলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলো ঠিক কি কি তা তিনি গুছিয়ে বলতে পারবেন না বটে কিন্তু সমস্ত ক্রোধ ঐ আজমলের ওপরেই। একদিন ভেবেছিলেন, ওকে জিজ্ঞেস করবেন, তোর খোঁজে মাঝে মধ্যে পুলিশ আসে কেন! কিন্তু আজো সামনাসামনি প্রশ্নটা করতে পারেন নি। কিন্তু আজ যেন স্থির ক'রেই ফেলেছেন, তিনি কঠোর হবেন। তাঁর নিজের ইচ্ছেটা সরাসরি প্রকাশ ক'রে ফেলবেন। এমন কি আজ রাতে আজমল ফিরলে সোজাসুজি ডেকে তাকে বলে দেবেন—তোর মুখের আদলের কোথাও কোনোখানে আমি আমাকে খুঁজে পাইনে। তোর বিরুদ্ধে আমার এই একটাই অভিযোগ!

সন্ধ্যার অন্ধকার কখন গ্রাস করেছে সমস্ত চরাচর। কারেন্ট নেই। পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়ে দু'টোকে হারিকেনের আলোতেই পড়তে বসিয়েছে ওদের মা। আলতাফটা কলেজে উঠে নাগাদ পড়াশোনা শিকেয় তুলেছে। মাস্তান হচ্ছে। আজমলের সেদিকে নজর নেই। কে জানে, ছোটভাইটাকেও নিজের দলে ভিড়িয়েছে কিনা। আজমলের সব যন্ডাপান্ডা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলতাফকেও বেশ ক'দিন থেকে ফুসুর ফুসুর করতে দেখা যাচ্ছে।

শেষমেষ দু'ভাই মিলে কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে!

নিরেট আঁধার সাঁতরিয়ে কোথা থেকে যেন ফুলের সুবাস ভেসে আসে। ভারী মিষ্টি। একটু যেন কটু রকমের মিষ্টি। শোনা যায়, এরকম মিষ্টি গন্ধের সাথে সাপের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবিউল হোসেন ঐ ফুলের ঘ্রাণে অভিভূত শুধু নয়, যেন মাতাল হয়ে পড়েন। অনুভব করেন, একঝাড় মাধবীলতা যেন মোমের মত নুইয়ে কাঁধ বেয়ে পিছন থেকে

লামনের দিকে আসছে। মাধবীলতাই কি! কাঁধের কাছে এত হিমঠান্ডা কেন তা'হলে।

রবিউল হোসেন অন্ধকারেই মুখ ঘুরিয়ে পিছনে তাকান। চমকে ওঠেন। একি! এ কাকে দেখছেন তিনি! আজমল নয়, আলতাফ নয়। বিকৃত চেহারার এরা কারা দাঁড়িয়ে আছে হুইল চেয়ারের হাতলে হাত লাগিয়ে! একজন মুক্তিযোদ্ধার চেয়ারে এ কাদের কালো হাত! তবে কি এতোদিন ধরে এই চার চাকাওয়ালা চেয়ারটা ওরাই সবাই মিলে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! কী আশ্চর্য! অন্ধকারে হাতড়ে চেয়ারটার চাকাগুলোর স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন রবিউল হোসেন। নাহ্! চারটি চাকার একটিও নেই। চেয়ারটা চলবে কি ক'রে তা'হলে!

দরদরিয়ে ঘেমে ওঠে সারা শরীর। আতঙ্কে চোখ ফিরিয়ে নেন সামনের দিকে। এবার পরিষ্কার দেখতে পান—ঐ তো আজমল, আলতাফ, আজমলের সব বখাটে বন্ধুরা হেঁটে যাচ্ছে তাঁরই সম্মুখ দিয়ে। কিন্তু আজমলের চাদরের তলে বেঢপ উঁচু ওটা কি! বন্দুক টন্দুক নাকি! রবিউল হোসেন চমকে ওঠেন। চোখ কচলে সাদা ক'রে তাকান। এ চেহারা যেন তাঁর খুব চেনা মনে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় চাদরের তলে এমনি ক'রে কাটা রাইফেল নিয়ে বনে বাদাড়ে ঠিক ঐ চেহারায় যে ঘুরতো—সেকি ঐ আজমল!

রবিউল হোসেন যেন প্রায় পাগল হয়ে ওঠেন—না না, চাকাবিহীন এই চেয়ারে আমার কাজ নেই। যেটুকু পারি, আমি আমার মত ক'রে চলব। দরকার হলে আজমলের ছোট ছেলে ঝন্টুর মত পাছা দিয়ে চলাফেরা করব।

হঠাৎ শুকনো গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন—আজমল, আমাকে তোদের সঙ্গে নে। ও পথে নয়। আমি তোদের পথচলা শিখিয়ে দেব। আমাকে সঙ্গে নে।

এরপর শুধু একটা শব্দ শোনা যায়। ভারী কিছু পতনের শব্দ। হয়তো পুরস্কারের চাকাবিহীন হুইল চেয়ারটি রবিউল হোসেন ত্যাগ করলেন।

ধারাবাহিক উপন্যাস

অজগর

হরিপদ দত্ত

ছয়

উঁচু টেঙ্গর-জমিনটার বুক মাড়িয়ে যে পথটা হোঁচট খেতে খেতে ক্রমশ নিচে নেমে এসেছে তার উপর পা রাখে আলতাফ মিঞা। নিচু জমিন ছেড়ে উপরে উঠতে গেলে শরীরের সবটুকু ভার নেমে আসে পায়ে। খালেকের বাড়িমুখো হাঁটতে গিয়ে আলতাফ মিঞা টের পায় ঘাড়ের ব্যথাটা না থাকলে মাথার কথা ভুলেই যেতো। উপরে ওঠা, ক্রমশ ওঠা, হায় কত কষ্ট। অথচ ক'বছর আগের কথা, লাফিয়ে নামা আর ওঠা। শরীরও যে পুরাতন হয় একথা ভুলে থাকা বোকামি নয় কি?

টেঙ্গরটা পেরোতেই নমো পাড়ার পাশ কেটে পথ। জমিনে হাল দিয়েছে গোপীনাথ। কেমন বেমানান। বুড়ো হাড্ডিসার বলদ, বাকিটা দুধেল বাছুর। লাঙ্গল টানা শেষ করবে একজন মৃত্যু দিয়ে, বাকিজন জন্মের সাধ মেটাবে দিনকে দিন। আলের উপর কচুপাতা। পাতায় তেল ভেজা সিঁদুরের টিপ, এক মুঠো ধান, একদলা গোবরের উপর পুরনো একটা কড়ি এবং ক'টা দুর্বা। শস্যের দেবতার অর্ঘ্য।

'অ রে গোপী, গেল ফসলের ফলন পাইলি ক্যামন?' সিঁদুর মাখা কচু-পাতায় চোখ পেতে কথা কয় আলতাফ হোসেন, 'ভাল হয় নাই?'

'দিনকে দিন কেবল ফলন কমে ক্যান জমিনের?' মাথা উঁচু করে গোপীনাথ, 'কলিকালে জমিনও বাঁঝা হইয়া গ্যাছে কাকা, কি কন?'

কি উত্তর দেবে আলতাফ মিঞা? গুছিয়ে নিতে পারছিল না আদতে। কিন্তু একটাকিছু বলতেই হয়, 'তবু ত গরুর পাছা ঠেলতে হইব ভাতিজা, আবাদ ত আর ছাড়তে পারবি না।'

'কোনদিকে কি করি কাকা?' গোপীনাথের গলা অসহায়, 'হালের একটা বলদ মইরা গেল, বাকিটাও বুড়া, বেচতেও পারি না, কসাইরা নিয়া যাইব, অভিশাপ দিব না গরুটা?'

'গরুর অভিশাপেরে ডরাস, দ্যাশে যে কোন্ অভিশাপ নামল খবর রাখস?' চষা জমিন থেকে দৃষ্টি টেনে এনে ভরাট গলায় কথা কয় আলতাফ হোসেন, 'আগুন বুঝি লাইগা গেল দ্যাশে, অ গোপীনাথ।'

'রায়ট!' চমকে ওঠে গোপীনাথ। হাল ছেড়ে লম্বা পা ফেলে পাশে এসে দাঁড়ায় আলতাফের, 'আর কত শুনমু এই রায়টের কথা, দুই দিন পর পর ক্যান এই কান্ড? হিন্দু-মুসলমান জাত দুইটা কোপা-কোপি কইরা একদিনে শেষ হইয়া যাইতে পারে না? হ, বীজসহ শেষ হয় না ক্যান?'

'দূর বোকা!' শুকনো হাসে আলতাফ হোসেন, 'সেই রায়ট না, পশ্চিমা মিলেটারি সরকার আর পাবলিক, বুঝলি?'

'হিন্দুগর তো কোন ক্ষতি হইব না?' ফ্যালফ্যাল চোখে ফেলে গোপীনাথ আলতাফের মুখে, 'দ্যাখ কাকা, মড়ার মতন পইড়া থাকি, দ্যাশের সাতেও নাই পাচেও নাই।'

'এত হিন্দু-হিন্দু করস ক্যান ব্যাটা?' আলতাফ মিঞার গলায় ধমকের সুর, বাঙ্গালী মনে করতে পারস না? গরিব মানুষ মনে করতে পারস না?'

'পারি, খুব পারি আলতাফ কাকা', নিচে নেমে আসে গোপীনাথের স্বর, দৃষ্টিটাও মাটিতে, 'কিন্তু রায়টের কথা মনে হইলেই কেবল নিজেরে হিন্দু মনে হয়, আর এই যে দিন-রাইত ক্ষেতে-জমিনে পইড়া থাকি, কই একবারও নিজের জাতের কথা মনে পড়ে না।'

'ঠিকই কইছস গোপীনাথ', উদাস হয়ে আসে আলতাফ হোসেনের গলা, 'তর যেই দশা হিন্দুস্তানে মুসলমানেরও একই দশা। সমাজতন্ত্র না আসলে এর কোন উপায় নাই।'

গোপীনাথ কথা বাড়ায় না। পথ ধরে আলতাফ হোসেন। বেড়েছে বয়স। জোর কমে এসেছে পায়ের। পথ কি কারো বয়সের অপেক্ষা রাখে! করে কি করুণা? তবু হাঁটা, ক্রমাগত হাঁটা।

লবেজান শরীরে খালেক মিঞার উঠোনে দাঁড়ায় আলতাফ হোসেন। উঠোনে বীজধান রোদে দিয়ে দাওয়ায় বসে আছে খালেক মিঞা। উঠোনের এককোনে কলাপাতায় ভাত, খানিক তরকারি এবং পোড়া আগরবাতি।

'কি ব্যাপার জয়নালের বাপ কলাপাতায় ভাত ক্যান?' দাওয়ায় বসতে বসতে দম টানে আলতাফ হোসেন, 'কারে খাইতে দিলা?'

কি জবাব দেবে খালেক মিঞা? মুখে কাচুমাচু, 'আর আর কইয়েন না, জয়নালের মায়ের কান্ড, জমিনে ফলন বাড়ে না তাই পীরের নামে.....।'

'ফলন বাড়াইতে গোপীনাথ দেয় কচুপাতায় সিন্দুর টিপ, তুমি দেও সিন্নি', মাথা ঝাঁকিয়ে হাসে আলতাফ হোসেন, 'আমি করি কি?'

'মাইয়া মাইনষ্যের কত কাজ', কথাটা ঘুরিয়ে নেয় খালেক মিঞা, পাল্টাতে চায় পরিবেশটা, 'তা আপনে আসলেন বাড়ি থাইকা ত?'

'খবর পাইছ? কোন বাতাসও পাও নাই?' খালেক মিঞার দিকে ঝুঁকে কথা কয় আলতাফ হোসেন, 'ঢাকার খবর হইল দ্যাশটা গরম হইতাছে, আবার শুরু হইব, জিব আবার শুরু।'

'শুরু ত হইল সেই কবে, শেষ হইব কোনদিন?' খালেক মিঞা হতাশার সুর টানে, 'শেষটা যদি দ্যাইখা যাইতে পারতাম।'

'আমাদের এত সহজে ভাইঙ্গা গেলে চলব জয়নালের বাপ?' পিঠে হাত রেখে খালেক মিঞাকে চাঙা করতে চায় আলতাফ হোসেন, 'আমাদের দল শেখ মুজিবের ছয় দফা সমর্থন করছে।'

'হাচাই বুঝি?' খালেক মিঞার পুরানো রক্তে লাগে ঢেউ, 'কিন্তু সমাজতন্ত্রের দাবি ছাইড়া ছয় দফা সমর্থন পথ বদল না ত?'

'দুর কি বল না বল', গলা উঁচু করে আলতাফ হোসেন, 'আমাগর কথা ত মুজিবরের ছয়-দফার মধ্যেও আছে।'

জবাব নেই খালেক মিঞার। ভাবে ওলট-পালট কত কি। দু'জনই চুপচাপ। পাড়ায় শেষ প্রান্ত থেকে ফজু মুনসীর মাগরিবের আজানের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে খালেক মিঞার কানে। মানুষটা কেমন হয়ে যায় হঠাৎ। বুকের ভেতর আনচান। পরখ করে মানুষটাকে আলতাফ হোসেন। ক্ষীণ গলায় জানতে চায়, 'অ জয়নালের বাপ, নামাজ পড়বা?'

'কোন কালেইত নামাজ-রোজার ধার দিয়া যাই নাই', সূর্য-ডোবা শূন্য আসমানে চোখ পাতে খালেক মিঞা, 'নূরীটা দেখতে দেখতে কলাগাছের মতন ডাঙর হইয়া গেল, বিয়াসাদির কথা উঠতাছে, কি বলেন?'

চাঁদাড়ের কোনে শেওলা-পড়া ঘাড় ভাঙা মেটে কলসির পানিতে ওজু করে খালেক মিঞা। মাঝ উঠোনে গামছা পেতে হাঁটু ভেঙে নামাজ আদায়ে মগ্ন হয় মানুষটা। চুপটি করে বসে খালেককে দেখে আলতাফ হোসেন। আত্মসমর্পিত মানুষটিকে হঠাৎ আলতাফ হোসেনের মনে হয় কত অসহায়। দূরে মাঠে গরুর হাম্বারব, আকাশে উড়ন্ত কুরর পাখির চিৎকার, ঘরের পেছনে মেটে পোকাদের থেকে থেকে ডাক কি কত দুঃখ-দুঃখ শোকাবিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করে, নিজের অজান্তেই সেখানে তলিয়ে যায় আলতাফ হোসেন।

'মেলা দিন ত অবসর কাটাইলা জয়নালের বাপ, আবার তৈরি হও', নামাজ সেরে খালেক উঠোনের ধুলো লাগা গামছাটা ঝেড়ে দাওয়ায় উঠে আসতেই কথাটা পাড়ে আলতাফ হোসেন', 'মুজিবরের আগড়তলা মামলা চলতাছে, গরম হইয়া উঠতাছে সারাটা দেশ', আবার তৈরি হও খালেকের বাপ, উপায় নাই তৈরি না হইয়া, করবা কি?'

'কবে আমারে তৈরি না পাইলেন?' চোখ তোলে খালেক মিঞা, 'দেশ তৈরি নাই, একলা আমি তৈরি হইয়া করব কি?'

চমকে ওঠার মতো কথা। আলতাফ হোসেন দৃষ্টি পাতে খালেক মিঞার চোখে। দেশ কি তৈরি? দেশ তো তৈরি করছে মুজিবরের ছয়-দফা, সমাজতন্ত্র কই?

সাত

ফজরের ওয়াক্ত কেটে যায়, তবু যখন মেয়েটা বিছানা ছাড়ছেনা তখন ওর গোনাহ্‌র ভার হিসেব না করে পারে না আয়াতুন্নেছা। দাওয়া, উঠোন, চাঁদাড় ঝাড় দেয়া শেষ, বাকি থাকে গোয়াল। ওখানে ঢোকা মেয়েদের নিষেধ। তাই জয়নালের বাপকেই কাজটা সারতে হয় বরাবর।

মায়ের বকুনি হজম করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নূরী। মাথা নামিয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকে মেয়েটা। মায়ের মুখের দিকে তাকানোর সাহস কই।

'জ্বর হইল কি?' উদ্বিগ্ন মা হাত তোলে মেয়ের মাথায়, 'কই, শরীল দ্যাখি কলসির মতন ঠান্ডা।'

হঠাৎ বিছানায় দৃষ্টিটা পড়তেই আচানক বনে যায় আয়াতুন্নেছা, 'আরে নূরী তর দ্যাখি হায়েজ হইছে।'

নূরীর মাথা মাটিতে মিশে যায় ভয় আর শরমের উত্তেজনায়। ওর কাছে মনে হয় কাজটি স্বাভাবিক নয়, অপরাধ। হুহু কেঁদে ফেলে মেয়ে। আর কিনা ওর মা লম্বা লম্বা দম টেনে মেয়ের শরীরের গন্ধ পরখ করে তাড়িঘড়ি। আয়াতুন্নেছার চোখে ঝিলিক, 'অ নূরী, তর ওপর খোদার দোয়া আছে, জবর পরহেজগার দৌলতি দুল্‌হা পাবি তুই, শরীলে তর বেহেশতি আতরের গেরান।'

নিঃশব্দে নূরী উল্টো-মুখ ফিরে দাঁড়ায়। বিছানার দিকে দৃষ্টি ফেলে আয়াতুন্নেছা আর নিজের গন্ডির মধ্যে আটক থাকতে পারেনা। মা হাওয়ার কথা মনে পড়ে। হযরত হাওয়া যখন গন্দমের খোসা ছাড়ালেন তখন ছিন্ন স্থান থেকে একবিন্দু রক্ত বের হয়ে এলো। ঠিক তখনই গায়েবি আওয়াজ, 'তোমাদের কন্যাদিগকে আমি কেয়ামত পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার রক্তাক্ত করব, কেননা তোমরা আদেশ অমান্যকারী।'

কি যে হবে, কি যে হয়। বিয়ে-সাদির আগে মেয়ের হায়েজ হয় বাপের ঘরে। এ গোনাহ্‌ কি করে ঢাকবে আয়াতুন্নেছা?

'অ নুরী, পাড়ার কাউয়া যেন জানতে না পারে তর হায়েজের খবর', নুরীকে জানিয়ে দেয় আয়াতুন্নেছা, 'মুখ দেখামু ক্যামনে ক?'

নুরীর জবাব নেই। অথচ মেয়েটাকে আজ কেমন অচেনা-অজানা মনে হয় আয়াতুন্নেছার কাছে। চাঁদাড়ের জাম্বুরা গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায় সে। পরখ করে গাছটাকে। ক্যামন লকলকে পাতাডাল। এবারই পয়লা ফুল দিয়েছিল ক'খানা, ঝরে গেছে। উঠোন ঝাড় দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিল আয়াতুন্নেছা। গাছটি বয়সে হচ্ছে পরিণত। দু'বছরের মধ্যেই দেবে ফল। আর নুরী? ক'মাসের মধ্যেই যে করেই হোক মেয়েটাকে পার করতেই হবে। হায়েজ হওয়া মেয়ে তো ঘরে রাখা মুর্দা। দাফনা না করলে গোনাহ্।

মেয়ের মায়ের কথাটা এবার গা না করে জো থাকে না বাপের। এ গাঁ ও গাঁ সবাইকে বলে রাখে কথাটা খালেক মিঞা। বলার সুবাদ তো সেই হাটবার দিন হাটে। হাতে একখানা বিড়ি তুলে না দিয়ে কথাটা তুলতে শরম পায় খালেক মিঞা।

দু'এক জাগায় কথাও ওঠে গরম গরম। কিন্তু জাতে-বেজাতে তো মেয়েটাকে তুলে দিতে পারে না খালেক। জাত পেলো তো জমিন পায় না, জমিন পেলো তো জাত মেলেনা। লক্ষ্মী গাঙের ওপার থেকে বাপের এক ছেলের কথা আনে কোরবান বেপারী। নুরীর জন্য খুবই ভাল সম্বন্ধ। কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়ে পা পিছু টানে খালেক মিঞা। জাত ভাল নয়। কোন জন্মে ওরা কলুগিরি করতো, সেই থেকে কলুর গোষ্ঠী। জেনে-শুনে এমন ঘরে মেয়ে তুলে দিলে পড়শীরা ভাববে কি? টাকা আর জমিন দেখলে কি চলে?

শেষটায় যে বিয়েটা আসে, নুরীকে দেখতে এসে ছেলে পক্ষ একেবারে পান-চিনি করিয়ে যায়। খালেক মিঞার বুকটা ফুরফুরে বাতাসে শীতল। তলে তলে নুরী যে কালেমা, শরীয়ত, নামাজ-রোজা সম্পর্কে এতখানি তালিম নিয়েছে ভাবতেও পারেনি সে। যে বাপের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত সম্পর্কে ধারণাই নেই তারই মেয়ে কিনা সব উতরে গেল! আসছে জোছনায় বিয়ে। দূর গাঁয়ের পথ। জোছনা রাতে দাওয়াতিরাও নিশ্চিন্তে পারবে ঘর ছাড়তে।

পালের গাই গরু আর ছাগলের বাচ্চা দু'টো বেচে দিয়ে তৈরি হয়ে যায় খালেক মিঞা। কিন্তু বিনা ঢেউয়ে যে নাও ডুবে, খালেক মিঞা জানতো না। নির্ধারিত তারিখের মাত্র পাঁচদিন আগে খবর আসে বিয়েটা হচ্ছে না, পিছলে নিয়েছে গা বরপক্ষ। কপাল চাপড়ে কেঁদেই যায় কেবল নুরীর মা। যে পোড়াকপালি মেয়ে জন্মে বৃষ্টি-বাদলের দিনে তার বিয়ে কি

আর না ভেঙে যায়? ধানের গোলার পেছনে ঐ যে লুকলো নূরী মাঝরাতে, বাপ তার টেনে বের করে আনে মেয়েকে।

কেন বিয়েটা ভাঙলো নূরীর? কে এমন দুশমন, কার আঁতুড় ঘরে নূরীর মা জিবন তুলে দিয়েছিল, যার এই কাজ?

'ক্যামনে হইব মাইয়ার বিয়া?' ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে আয়াতুন্নেছা, 'যে বাপ তিরিশ রোজার উনত্রিশ রোজাই কাজা করে তার গোনাহ্ কি মাপ হয়?'

অথচ খালেক মিঞা শেষটায় ঠিক ঠিক আবিষ্কার করে ফেলে নূরীর বিয়ে ভাঙার কারণটা। কিন্তু না, এ কথা কিছুতেই ফাঁশ করা যায় না নূরীর মায়ের কাছে। জয়নালও জানতে চেয়েছিল কারণটা কি? বলা হয় না তাকেও।

তা এমন কি কথা যা ছেলে আর স্ত্রীর কাছেও গোপন রাখতে হয় খালেক মিঞাকে? এক এক সময় খালেক এতটা উত্তেজিত হয়ে যায়, নিজেকে সংযত রাখা কি যে কষ্ট। বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়, গোপন রক্তে ডুবে যায় কলজে, তবু পারে না কথাটা বের করে দিতে। নূরী, ঐ যে নূরীটা সামনে এলেই বুক ভেঙে কাঁদতে চায় খালেক। কিন্তু পারে না।

মাঝরাতে খোয়াব দেখে খালেক মিঞা। বাড়িতে ঝাপিয়ে পড়েছে পুলিশ। মাথার টুপিতে চান-তারা তকমা। না, এবার আয়াতুন্নেছা নয়, নূরী। নূরীকে ওরা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? বাকিটুকু অসমাপ্ত। আয়াতুন্নেছার ধাক্কায় ভেঙে যায় ঘুম।

'কি, খোয়াবে কি দ্যাখলেন?' আয়াতুন্নেছা হাই ছাড়ে, 'বদ খোয়াব না ত? চিল্লাইয়া উঠলেন যে।'

জবাব দেয় না খালেক মিঞা। দম ফেলে অন্ধকার বিছানায়। আয়াতুন্নেছাও ফের কথা বাড়ায় না। যদি নূরীর বিয়ে ভাঙার প্রসঙ্গটা উঠে যায়? ওখানে যত ভয় ওর।

বিছানার এক প্রান্তে নূরীটা বিভোর ঘুমে অচেতন। পিতার মত ঘুমের মধ্যে কোন বদ খোয়াব দেখে না সে। ঘুমবিহীন সময়টুকুর মধ্যে বাপ-মায়ের মুখের দিকে তাকালেই সে কেবল ভড়কে যায়। দুঃখ নয় কেবল, ভয়। ভয়টা যে কেন নূরীও জানে না।

সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে নূরী যখন ছাগল তাড়িয়ে বাড়ি ছেড়ে নেমে আসে তখন আর তার মনে পড়ে না মায়ের মুখ। বাড়ির দুঃখ-দুঃখ আর কষ্টের সীমানা ডিঙিয়ে যেখানে সে পৌঁছে সেখানে উদার মাঠ-জমিন আর ঘাসের বিস্তার সবুজাভ। আজন্ম যে ঘাস আর মাঠ সে দেখে এসেছে তাদের ছেড়ে কোথায় যাবে নূরী? ছাগলের বাচ্চা দুটোকে কোলে তুলে আদর করে

ওদের নুরী, 'তুদের ছাইড়া কই যাইব নুরী? না, নুরী যাইব না। নুরী চইলা গেলে কাঁদবি না তুরা?'

নুরীর কথা বাচ্চা দুটো শোনে না, শুনতে চায় না। ওরা মায়ের কাছে ছুটে যেতে ব্যাকুল। মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে ওলানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নুরী দেখে। পেছনের পা ফাঁক করে কেমন নিশ্চিন্তে ছাগীটা দুধ দিচ্ছে বাচ্চাকে, পলকহীন দেখে নুরী। চোখ বেয়ে পানি নামে ওর। কাঁদে বিলাপের সুরে, 'তুদের ছাইড়া কই যাইব নুরী?'

না। নুরী যাবে না। যাবার পথ কই? তাই তো সন্ধ্যায় পাড়ার কুয়া থেকে পানি আনতে যেতেও রাজি নয় নুরী। শরম। এত শরম কই বাইন্ধা রাখব নুরী? পড়শী বৌরা ওরে দ্যাখলেই খালি কানে কানে ফিস্-ফিস্ করে কুয়ার পাড়ে। শরম না?

'কুফা মাইয়া, বিয়া যায় ভাইঙ্গা,' মা গাল পাড়ে মেয়েকে, 'সমান বয়সি বেবাক মাইয়ার বেয়া হইয়া যায়, হয় না খালি এই মাগীর। গলায় দড়ি দিয়া বাপ-মায়ের উদ্ধার কর না?'

'খামখা মাইয়াটারে বকতাছস ক্যান?' আয়াতুন্নেছার সামনে এসে দাঁড়ায় খালেক মিঞা, 'নুরীর বিয়া ভাঙল কার দোষে, জানস?'

'কার দোষে, কইয়া ফ্যালান না ক্যান?' গলা উঁচু করে আয়াতুন্নেছা, 'কত বার জানবার চাই, মুখ বুইজা থাখেন ক্যান?'

মাটিতে নেমে আসে মাথাটা খালেক মিঞার। এক পা দু'পা করে উঠোন ছেড়ে নেমে আসে চাতালে। সন্ধ্যার নীলাভ ছায়া প্রান্তরে কি নিশ্চিন্তে বিস্তার করছে আপন সাম্রাজ্য। সে সাম্রাজ্যে-খালেক মিঞা একা, নিতান্তই একা।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামলে আসমান ফকফকে করে ওঠে চাঁদ। গাছ-গাছালি বেয়ে জোনাক নেমে আসে মাঠে-প্রান্তরে। উদোম মাঠে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা আমলকি গাছের ডাল-পালা ভেজা জোছনায় থিকথিক। ফসল-শূন্য চষা ক্ষেতে ইঁদুরের কুটকুট গর্ত খোদার শব্দও বড় স্পষ্ট। বাড়ি ছেড়ে চাতাল ডিঙিয়ে উদোম মাঠের আমলকি গাছটার দিকে হাঁটতে থাকে নুরী। মাঠের কোন্ প্রান্তে যে বেঙ ধরেছে সাপ বুঝতে পারে না নুরী। সামনে না কি পেছনে, ডানে না কি বামে, বুঝে উঠতে পারে না সে। পায়ের নিচে ঘাস, গুটি-দানা ছাগলের শুকনো পায়খানা। কান্না আসে নুরীর, অথচ কাঁদতে পারল কই।

আমলকি গাছটা যতই কাছাকাছি হচ্ছে, নুরী দেখে তার নিচে লম্বা শেরওয়ানি পরা মাথায় পাগড়ি মুখে রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে আছে বিয়ের বর। কার বর? এখানে কেন? লোকটি কি হাত দিয়ে ইশারায় নুরীকে

ডাকছে? তার হাতে ওটা কি? সোনার হার। চকমক করছে হারটি জোছনার আলোয়। নূরী আজ পরবে সে হার। আজ না নূরীর বিয়ে? ঐ তো বর সোনার হার হাতে দাঁড়িয়ে তারই অপেক্ষায়।

লম্বা পায়ে এগিয়ে যায় নূরী। আমলকি গাছের নুয়ে পড়া ডালটার পাশে এসে দাঁড়ায় সে। গাছের ডালে ঝুলছে সোনার হার। নূরীর বিয়ের হার। ওটা গলায় পরেই নূরী আজ সাজবে বিয়ের কনে। দু'পা এগিয়ে যায় নূরী। গলাটা বাড়িয়ে দেয় গাছের ডালে ঝুলন্ত সোনার হারে।

বেহুঁশ নূরীকে আমলকি গাছের ডালের সঙ্গে পেঁচানো শাড়ি কেটে নিচে নামিয়ে আনে খালেক মিঞা আর জয়নাল। মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে হুহু কান্নায় ভেঙে পড়ে খালেক, 'কার গোনায় তুই গলায় শাড়ি পেচাইতে আসলি মা? গোনা কি তর? গোনা তোর মায়ের। নূরুল আমিনের পুলিশ কাইড়া নিছিল তর মায়ের ইজ্জত। কোন্ দুশমন এই খবরটা দিল তর জমাই বাড়ি, তাই ত ভাইঙ্গা গেল বিয়া.....'

বিহানে নূরীর মাথায় দু'হাত চেপে ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে আয়াতুন্নেছা, 'ক্যান তুই গলায় দড়ি দিলি মা, তর এই কলঙ্ক কি দিয়া ঢাকমু আমি.....।'

খালেক মিঞা হাত ধরে টেনে আয়াতুন্নেছাকে সরিয়ে দেয় নূরীর কাছ থেকে। খানিক পায়চারি করে ঘরের ভেতর। একবার উপরে ফের নিচে টেনে আনে দৃষ্টি। বুকটা ফেটে যাচ্ছে জমাট-বাঁধা হাজার কথায়। না কিছুই বলা হয় না। কেবল এক সময় দু'হাতে বুক চেপে ধরে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে নূরীর মাথার পাশে, 'নূরী, কিসের কলঙ্ক তোর? শোন মা, আমার কথা শোন, তর বাপ মরে নাই, তেভাগা করে নাই তর বাপ? আবার করব ছয় দফা, শোনস নাই ছয় দফার কথা?'

আট

সূর্যটা যখন এক পা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে উঠোনে, নূরীর হাত ধরে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে জয়নাল। ডানে উঁচু মাঠটা ফেলে জমিনের ঢালু পাড় বেয়ে নেমে আসে সমতল ফসলের খেতে। রোদ-বাতাসে ধানের চারা রূপালী ঢেউ হয়ে নেচে যায় বিরামহীন।

'অ নূরী, ক ত দ্যাখি আমাদের খেত কোনটা?' মোটা আলে নূরীকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে কথা কয় জয়নাল, 'কইতে যদি পারস তবে তরে আমি বড় আপা ডাকমু দশবার।'

'কি জানি কোনটা, ঠোঁট উল্টোয় নূরী, 'এত খেত, ক্যামনে চিনি কোনটা কার।'

'তুই ত দ্যাখছি আমাদের খেত-জমিনও চিনস না', কথাটা বলেই স্বর বদলে নেয় জয়নাল, 'এই যে বিরাট খামার, জানস নূরী, তার মধ্যে আমাদের মাত্র দুই কানি জমিনা।'

নূরী জবাব দেয় না। ওর দৃষ্টি আসমানে। এক ঝাঁক বাবুই ডিগ-বাজি খাচ্ছিল ঐ উঁচুতে।

'কেবল কি জমিন, খাবার পানি, পানি আছে আমাদের?' জয়নাল যেন কথা বলছিল নিজের সঙ্গে, 'মোল্লা বাড়ি, খন্দকার বাড়ির কুয়ার পানি আনতে বুঝি তর শরম লাগে না?'

নূরীর চোখ তখনো আসমানে। বাবুইর ঝাঁকটা আর নেই। ঐ দূর বাঁশবনের নিশানা করে উড়ে গেছে ওরা। কেবল আসমানের এক কোনে হাল্কা সাদাটে একখন্ড মেঘ। হয়তো ভাবে কত পানি আসমানের ঐ মেঘে, কেবল নেই ওদের।

এক সময় নূরী কথা কয়। কান্না শেষে মানুষের স্বর যেমনি হয় ঠিক তেমনি গলায়, 'জনু ভাই, তুই কি জানস আমার বিয়াটা ক্যান ভাইঙ্গা গেল? ভাই, ঐ মানুষটারে তুই ভাল কইরা দ্যাখস নাই যেদিন আমারে পছন্দ করতে আসল?' আর যেন এগোতে পারে না নূরী। বুকের বাতাস দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিল নাক দিয়ে, মুখের ফাঁক জাগাটুকু শূন্য। তবু নূরী বলে, 'শরমে একবারও আমি মানুষটার মুখের পানে তাকাইতে পারি নাই, ক্যামনে দ্যাখতে?'

'দূর, ক্যামনে আবার? না তাকাইয়া ভালই করছস, দ্যাখতে কুচকুচা কালা গাবগাছের মতন', জয়নাল জবাব দেয় তাচ্ছিল্য ভরে, 'তবে তার দাঁত গুলা ভালই। হাসলে ঠিক শাপলার পাঁপড়ির মতন দেখায়, আর সবই বেঢপ।'

'আচ্ছা রে ভাই, কইতে পারস শাপলা ফুলে গন্ধ নাই ক্যান?' নূরী মাথা তোলে, 'আছে না কি গন্ধ? যা আছে তারে বুঝি কেউ গন্ধ কয়?'

জয়নালের যেন জবাব দেবার মতো কিছুই থাকে না। নূরী আরো কিছু বলুক, এমনটাই চায়। অথচ নূরী কথা বলে, জয়নালকে নয়, নিজেকে, 'যদি মুখটা তার চিনা রাখতে পারতাম, যদি পারতাম, একদিন না একদিন জিগাইতে ত পারতাম, অ মিঞা কোন দোষটা দ্যাখলা নূরীর?'

জয়নাল চোখ পাতে নূরীর মুখে। কি বলছে নূরী? এমন করে বলছে কেন? জীবনে এই প্রথম জয়নাল আবিষ্কার করে মানুষের অন্য রকম দুঃখ।

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

'অ নুরী, তুই আমার মায়ের পেটের বোন না?' জয়নালের গলায় যেন আটকে আসে কথা, 'এক সঙ্গে আমরা বড় হই নাই? তুই আমার কত দিনের চিনা, তবে আইজ কেন্ তরে দ্যাখতে এমুন লাগতাছে? আদতেই কি মইরা যাবি নুরী?'

'মরমু ক্যান, খালি আমার কষ্ট' নুরীর চোখ ভিজে আসে, 'আমি তর চাইতে বয়সে ছোট না? এত কষ্ট খালি আমার একলার ক্যান, তর নাই?'

নুরীর শেষ কথাটা জয়নাল যেন শুনতেই পায় না। হঠাৎ তার মনে হয় নুরীটা কি সাহসী। মওতকে এই পুঁচকি মেয়েটা ভয় পায় না!

'অ নুরী, মরতে যে গেছিলি, এত সাহস পাইলি কই তুই?' জয়নালের স্বর কাঁপে সামনের কচি ধানের খেতে রোদ-বাতাসের ঢেউয়ের মতো, 'আম্মার ইজ্জত নিল যারা সেই কুত্তার বাচ্চাদের খুন করনের লাইগা তর, সাহসটুকু আমারে তুই দিয়া দে নুরী, দিবি না? মায়ের পেটে তর জন্ম না?'

জয়নালকে জড়িয়ে ধরে হুহু কেঁদে ওঠে নুরী, 'আব্বা-আম্মা-তুই আমি আর হালু ছাড়া.....।'

রাত পোহাতে সেই কোথায়-কোথায় চলে যায়, ফিরতে ফিরতে রাত এক প্রহর। কোথায় যায়? খালেক মিঞা ছেলের খবর রাখে না। নুরী জানে, সবই জানে। ওকেই বলে-কয়ে যায় জয়নাল। কোথায় কালীগঞ্জ, কোথায় নরসিংদী। বড় বড় সভা বসে, মিছিল হয় লম্বা লম্বা। ছয় দফার মিছিল, আগড়তলা মামলা বাতিলের মিছিল।

যেদিন শহীদ মাস্টার আর তসলিম মাস্টার স্কুল-অফিসে কথা কাটাকাটি থেকে ধরাধরির পর্যায়ে চলে যায়, ক্লাস ছেড়ে সব ছাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়ে অফিসটাকে ঘিরে, সেদিন কি আর স্কুল বসে? শেখ মুজিবের ছয় দফার বিরোধিতা কোন্ যুক্তিতে করে বসেন মাওলানা ভাসানী, সে নিয়ে তর্ক। ভাসানী সম্পর্কে এমন একটা উক্তি করে বসে শহীদ মাস্টার যা হজম করতে পারেনি তসলিম মাস্টার। স্কুলটাও দু'ফালা। ছাত্র-শিক্ষক সব ভাগাভাগি। ছুটি ঘোষণা না করে উপায় থাকে না প্রধান শিক্ষকের।

কিন্তু ছুটি তো হলো, বাড়ি ফেরার নাম নেই কেন জয়নালের? গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যে, গেল কই ছেলেটা? দক্ষিণ পাড়ায় খনকার বাড়ির ছেলে সহপাঠী হানিফ-এর কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসে খালেক মিঞা।

যেখানেই যায়, ঐ যে নুরীকে বলে যায়, আজ তার ব্যতিক্রম। নেই, নেই, সারা গাঁয়ে ছেলেটার গন্ধও নেই। কোথায় খুঁজবে ছেলেটাকে

নূরীকে নিয়ে দাওয়ায় বসে থাকে আয়াতুন্নেছা। উঠোন আর চাঁদাড়ে কেবল অস্থির পায়চারি চলে খালেকের। রাতটা বাড়ে কেবলই নিঃশব্দে। কড়ুই গাছের ডগায় ঝুলে থাকা চাঁদ উঠে আসে মাঝ আসমানে। প্রবল জোছনায় আসমান-জমিন একাকার। হঠাৎ দূরের গাছের ছায়া মানুষ বলে ভ্রম হয় খালেকের। ঐ তো বুঝি এলো ছেলেটা। না কোথায় ছেলে! জোছনার বিস্তার কেবল প্রলম্বিত হতে থাকে প্রান্তরে। আমগাছের নিচে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে খালেক। দু'চোখ ভরে তন্দ্রার জোয়ার নামে নিঃশব্দে।

হঠাৎ পায়ের আওয়াজে তন্দ্রাটুকু দু'ফালা হয়ে যায় খালেকের। চোখ খুলতেই সামনে দাঁড়িয়ে জয়নাল। বাপকে কথা বলার সুযোগ দেবে কি ছেলে, প্রবল উত্তেজনায় জাপটে ধরে, 'তুমরা কমিনিস্টেরা যা পারনাই আব্বা, শেখ মুজিব তা পারুব, দেইখা নিও।'

অতীত

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও রবীন্দ্রনাথ

পূর্ববঙ্গের রবীন্দ্র-ভক্ত বিদ্বজ্জনদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্র-সাহচর্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নলিনীকান্ত ভট্টশালী অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-দর্শনলাভের আগেই নলিনীকান্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন ভক্ত-পাঠক হিসেবে আত্মিক পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন দশ-এগার বছর তখনই তিনি মাসে মাসে 'ভারতী'তে প্রকাশিত "চিরকুমার সভা" (প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ)-র একজন রসগ্রাহী পাঠক হিসেবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসাস্বাদন শুরু করেন।

এরপর 'হিতবাদী' কার্যালয় হতে 'হিতবাদীর উপহার' হিসেবে 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' (গদ্য) প্রকাশিত হলে (২৯ আগস্ট, ১৯০৪) নলিনীকান্ত স্কুল পালিয়ে, অভিভাবকের চোখ এড়িয়ে এবং পাঠ্য পুস্তককে ফাঁকি দিয়ে রাত-দিন 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' পড়তে শুরু করেন। এর আগে 'টালি সংস্করণ' নামে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীর এক বৃহদাকার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তা কিন্তু বালক নলিনীকান্তের মন টানে নি। এ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, "আকারের প্রকাণ্ডতায়ই হউক অথবা কবিতার দুর্ব্বোধ্যতায়ই হউক, উহা বালককে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।"

কিন্তু, এক শুভ দিনে কোন এক পাঠ্য পুস্তকের কবিতাচয়নের মধ্যে 'শরৎ' কবিতাটি পাঠ করে নলিনীকান্ত মুগ্ধ ও অভিভূত হন। এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, "এ পর্যন্ত যত কবিতা পাঠ করিয়াছি, ইহা তাহাদের শ্রেণীর নহে। ইহাতে এমন কিছু পাইতেছি, এমন বৃহৎ প্রতিভার দুর্নিবার প্লাবনের ইহা এক তরঙ্গ; প্রহরোদিত সূর্যের কিরণের মত ইহাতে এত স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য বর্তমান,—যে কবিতাটি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া আমি স্তব্ধ অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম।"

অথচ, এই নলিনীকান্তই যখন স্কুলের পড়া শেষ করে ঢাকা কলেজে পড়তে এলেন, তখন ভিড়ে গেলেন সেই নিন্দুকদের দলে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মেয়েলী কবিতার লেখক হিসেবে চিহ্নিত করে সর্বদা নিন্দায় মুখর থাকতেন। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-০৬) উত্তাল তরঙ্গে ঢাকা শহর তখন টালমাটাল। স্বাভাবিকভাবেই তখন বীররসাশ্রিত কবিতার কদর বেশি। অতএব, পুরো দু'টো বছর নলিনীকান্ত এক ঘোরের মধ্যেই কাটিয়ে

দিলেন। এই ঘোর কাটলো বি. এ. ক্লাসে পড়াকালে (১৯০৭-০৮)। এ সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাসদ্বয় পাঠ করেন। এছাড়া, ইতিহাস বিভাগের জনৈক অধ্যাপকের কাছ থেকে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এবং বাসায় গিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাঞ্জ আলোচনা শুনে তাঁর ভুল ভাঙলো। অতঃপর রবীন্দ্র-কাব্যে তিনি পরিপূর্ণ দীক্ষা লাভ করলেন বন্ধু বিনোদমোহন চক্রবর্তীর নিকট। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "বিনোদবাবু অপরিসীম দরদের সহিত 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা', ইত্যাদির সহিত আমার পরিচয় সাধন করিলেন, দুই বন্ধু সারাদিন বিভোর হইয়া কাব্যরসপানে নিমগ্ন থাকিতাম।"

এম. এ. ক্লাসে পড়ার সময় নিজেদের উদ্যোগে প্রকাশিত মাসিক 'উদ্যান'-এ "বাঙ্গালা কাব্যের ক্রমবিকাশ" শীর্ষক নলিনীকান্তের এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের কেবল গুণ-কীর্তন করেই ক্ষান্ত হননি, রবীন্দ্রবিদ্বেষীদের প্রতি উপযুক্ত জবাবও ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তখন তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমনই ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, টুইশনের কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে মোহিত সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ একটি সেট কিনে ফেলেছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' সম্বন্ধীয় কবিতাগুলোর অসাধারণত্ব উল্লেখ করে দ্বিতীয় বর্ষের (১৩১৯) ভাদ্র সংখ্যা 'প্রতিভা'-য় "রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মৃত্যুকল্পনা" নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখেন।

১৯১৩ সালের প্রথম ভাগে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমা স্কুলের (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে) প্রধান শিক্ষক পদে নলিনীকান্ত যোগ দেন। সেখানে তাঁর নিজ উদ্যোগে স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনীত হয়। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় তখন সেই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। তিনিই সেদিন অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে (১০ ও ১১ই ফাল্গুন, ১৩২০) প্রবন্ধ পাঠের আমন্ত্রণ পেয়ে নলিনীকান্ত আসেন পাবনায়। এখানে এসেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন নিজ চোখে। সম্মিলনের সভাপতি মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের বিশেষ অনুরোধে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথও সম্মিলনে যোগ দেন। চোখের দেখা দেখলেন বটে, কিন্তু পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটলো না।

সুযোগ পেলেন আরও বছর চারেক পর। ইতোমধ্যে (১৯১৪) নলিনীবাবু প্রধান শিক্ষকের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষরূপে বহাল হন। ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এক অধিবেশন ঢাকায় আহূত হয়। সেই সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সম্মত করানোর দায়িত্ব পড়ে অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদক নলিনীকান্তর ওপর। তাঁর ওপর এই দায়িত্ব বর্তানোর সঙ্গত কিছু কারণ ছিল। 'ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ' হতে নলিনীকান্তর সম্পাদনায় "মীনচেতন" নামে একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রকাশিত হয়। এর একটি কপি তিনি উপহার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। পুঁথিটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে প্রাপ্তি-সংবাদ দেন। তিনি লেখেন:

"বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—মীনচেতন বইখানি পাইয়া উপকৃত হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার শব্দতত্ত্ব আলোচনায় আমার স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, সেই কারণে এ বইখানি আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। এরূপ গ্রন্থ আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গৌরব লাভ করিতেছেন এবং এই উদ্যোগে আপনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সে জন্য স্বদেশের হইয়া আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম, ইতি ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪—ভবদীয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

এরপর, রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' এবং এর ইংরেজি অনুবাদ 'The Master's Will' প্রকাশিত হলে ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলোতে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু হয়। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় লেখা হয়; 'কদলী বৃক্ষ ও ফলের বিকাশ সম্বন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-পূর্ণ গান শুনিতে রাজি আছি, কিন্তু রাজনীতি তো-কবিত্ব নয়।' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবম্বিধ অসৌজন্যমূলক উক্তি নলিনীকান্তকে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করে। তিনি লিখেছেন, "রবীন্দ্রনিন্দা বা তাঁহার মহিমা খর্ব করিবার চেষ্টা প্রত্যেক রবীন্দ্রভক্তেরই অসহ্য, পূর্ববঙ্গবাসীর অসহিষ্ণুতা আবার সর্বদাই একটু সক্রিয় ও প্রবল আকার ধারণ করিয়া থাকে। আমি নব-পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক রচনার নমুনাস্বরূপ তাঁহার স্বদেশী আন্দোলনের যুগের একটি চমৎকার লেখা অংশত অনুবাদ করিয়া, এবং রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনাড়ী বলিয়া ধরা যে কত বড় মূঢ়তা এই সম্বন্ধে নিজস্ব লম্বা ভূমিকা দিয়া Sir Rabindranath and Politics নাম দিয়া একটা লেখা পত্রের আকারে 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে' প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া

দিলাম। 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে'র সম্পাদক উহা মহা সমাদরে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সংলগ্ন করিয়া ৭ই অক্টোবর রবিবার ১৯১৭ তারিখের কাগজে প্রায় পুরা দুই কলামে ছাপিলেন। ...সম্পাদকীয়ের পার্শ্বে মুদ্রিত এই দীর্ঘ এবং বেশ গরম প্রবন্ধ ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলির রবীন্দ্র-পরিহাসের সুর থামাইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। কারণ ইহার পরে আর ঐ রকম রবীন্দ্র-তাচ্ছিল্যের সুর নজরে পড়ে নাই।"

এ ছাড়াও, নলিনীবাবু ছদ্মনামে, 'A well-wisher of the Empire' নামে, রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা তৎকালের খবরের কাগজসমূহে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তো মন্তব্যই করেছিলেন, "এমন জোরদার লেখা জাস্টিস উড্‌রফের বলিয়াই বোধ হয়।"

যা হোক্, সম্ভবত এ সমস্ত কারণেই রবীন্দ্রনাথকে রাজি করানোর উপযুক্তজন হিসেবে নলিনীকান্তকে কলকাতা পাঠানো হয়। কলকাতা পৌঁছে বিকেলে তিনি 'প্রবাসী' অফিসে যান এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। চারুবাবুকে সঙ্গে করে সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো গেলেন। সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে 'বিচিত্রা' নামক এক সাহিত্যসভার আসর ছিল। উক্ত আসরে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। নলিনীকান্তের জন্যে এটা ছিল এক উপরি-পাওনা। সভা ভাঙলে এবং আগন্তুক অতিথিরা একে একে বিদায় নিলে চারুবাবু নলিনীকান্তকে রবি ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নলিনীকান্তের মুখোমুখি আলাপ। পরিচয় মুহূর্তটির বর্ণনা দিতে গিয়ে নলিনীকান্ত বলেছেন, "কবির অপরিচিতের নিকট সঙ্কোচ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি যেন চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কথা কহিতে পারিতেছিলেন না।" এই অবস্থায় নলিনীকান্ত তাঁর আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন, কিন্তু শত অনুরোধেও রবীন্দ্রনাথকে রাজি করাতে পারলেন না। ফলে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ঢাকায় ফিরে এলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এলেন এর আট বছর পর (৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৬, রোববার, ২৪শে মাঘ ১৩৩২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি ঢাকায় আসেন। ২৮শে মাঘ সকাল বেলায় নলিনীকান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাসায় রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করেন। ডক্টর মজুমদার নতুন

ভাবে পরিচয় করিয়ে দিলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ওঁর কথা অনেক শুনেছি।" অতঃপর নলিনীকান্ত মিউজিয়াম পরিদর্শনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বিনীত আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ঐদিন বিকেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সে-আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এরপরে তাঁদের মধ্যে আর কোন সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

ফজলুল হক

[নিবন্ধে উল্লিখিত তথ্য নলিনীকান্ত ভট্টশালী রচিত 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃঃ ৮৩৬-৮৫২]

স্মরণ

আমৃত্যু আপসহীন কবি

জীবনের পুরোটা সময়ব্যাপী চ্যুতিহীন নিরাপস দ্রোহী বোধের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমৃত্যু পতনহীন মর্যাদায় প্রবাহিত করেছেন আপনাকে, কৃত কাব্যকর্মকে। আপনার নির্মিত এক আদর্শবোধ ছাড়া আর কোন লিপ্সায় পীড়িত হননি কখনো। দুর্বৃত্ত মানুষ বা সময়ের কাছে নতজানু হবার প্রয়োজন তাঁকে কখনও আক্রান্ত করতে পারেনি, এমন মানুষ ছিলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ত্রিশের দশকে তাঁর কাব্যচর্চার প্রারম্ভ হলেও চল্লিশ দশকে বিস্তৃতি ঘটে ব্যাপক পরিসরে।

সে-সময়ের কাব্য সাহিত্যে স্পষ্টত দুটো ধারা প্রচলিত ছিল। সুভাষ-সুকান্তদের একটি কাব্য-ধারা যাতে অন্তর্নিহিত ছিল দ্রোহী চেতনা-মিশ্রিত গণ-উদ্দীপন এবং অন্যটি বুদ্ধদেব-অরুণ সরকারদের শিল্প-সৌন্দর্যের কাব্যানুশীলন। বলা বাহুল্য, সে-সময় এবং তার উত্তরকালেও সুভাষ-সুকান্তদের ধারা পাঠককে নাড়া দিয়েছে অধিক মাত্রায়।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে এই দুটো ধারার সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। যেখান থেকে, যার কাছ থেকে যতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করা যায় তা স্বাধীনভাবে, আপনার মত করে তিনি করেছেন। বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, গোবিন্দ দাস, নজরুল ইসলাম প্রমুখ—স্বতন্ত্র সব ধারা থেকেই, বৈশিষ্ট্য থেকেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাব্য-ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে লোকজ কবিতার সরল গতিময়তার ধারার ঐতিহ্যও। কাব্যরীতি ও আঙ্গিকগত দিক থেকে তাঁর কবিতা গীতি কবিতাধর্মী, ক্ষুদ্র আয়তনের কবিতায় অনুচ্চ কিন্তু গভীর স্বরে উচ্চারিত বাক্‌রীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল। পরবর্তীতে কিছুটা নাটকীয় ও দীর্ঘ কবিতার সন্ধান আমরা পাই। তার কারণ, তাঁর গতিশীল জীবনপ্রবাহ এবং সে সঙ্গে সময় ও জীবনের সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষায় এগিয়ে যাবার প্রবণতা।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহচ্যুত' প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। এর একটি কবিতায় জীবন-যাপনের দুই বিপরীতমুখিতা উপস্থিত করেছেন এভাবে:

মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ
কুকুরের কান্না।
তোমার গভীর ঘুমের পাশে,
আমার রাত্রি-জাগরণ।

['মাঝে মাঝে মালটানা গাড়ির শব্দ']

বাংলা কবিতায় ত্রিশ দশক ও তার পরবর্তী সময়ে যে ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতা বোধের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তার প্রভাব বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও পড়েছে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে তাঁর প্রকাশিত 'রানুর জন্য' নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতার নাম 'মুখোশ'। এ কবিতাটিতে ক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতা মধ্যবিত্ত যুবকদের ট্রাজেডির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আরও কিছু কবিতার মধ্যে—'রুটি দাও', 'বেকার জীবনের পাঁচালী', 'অন্নদেবতা' ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতায়ও ওই সমান্তরাল বৈশিষ্ট্য সমুপস্থিত। 'অন্নদেবতা' কবিতার কয়েকটি পংক্তি এ-রকম:

অন্ন আলো অন্নজ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো ধ্বংস করো ধ্বংস করো তারে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম যুগের কবিতার মধ্যে রয়েছে ক্ষয়, ক্ষুধা তথা সহজ-সরল মানবিকতার স্বচ্ছ অভিব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়। ষাট দশকের প্রথম দিকে প্রকাশিত 'কালো বস্তির পাঁচালী' নামক কবিতা। এর প্রথম কটি পংক্তি এরকম:

আয় রোদ্দুর আয়।
আয় আমাদের ন্যাংটা খুকুর নোংরা বিছানায়,
আয় রোদ্দুর বস্তিতে
আধমরা ঐ খুকুর ঠোঁটে একটু চুমুর স্বস্তি দে।

ক্রমশ প্রতিবাদী কণ্ঠ নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা উচ্চগ্রামিক স্তর লাভ করতে থাকে। এক শ্রেণীর শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর আপসকামী মনোভাব এবং ক্লীবের জীবন যাপন তাঁকে পীড়িত করেছিল। সে সঙ্গে পরবর্তীতে দেশভাগের পর আমলা ও রাজকর্মচারীদের জন-বিরোধী আচরণে

তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হন। ক্রমান্বয়ে তিনি সমসাময়িক প্রবাহ এবং প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। দস্তয়ভস্কি, কাফকা অথবা বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশের সাহিত্য-ধারার লক্ষণ তাঁর কাব্য-নির্মিতিতে প্রভাব বিস্তার করে; অর্থাৎ স্বাভাবিকতা-বাদ ও মানবতাবাদ এই দুই প্রবণতার সাথে যুক্ত হয় প্রতিবাদ ও সংগ্রাম। তাই দেখা যায়, শূন্যতা ও বিষণ্ণতা দিয়ে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য-কীর্তি শুরু হলেও ষাট, সত্তর বা আশির দশকে এসে সেগুলো অন্তর্হিত হয়। একেবারে গোড়ার দিকে লেখা কবিতা 'ক্লান্তি ক্লান্তি', 'সময় ঝরিয়া পড়ে', 'প্রভাস' প্রভৃতিতে বিষণ্ণতা যেমন উপচে পড়েছে তেমনি 'পাতাঝরা গাছেদের কবিতা', 'যৌবনোত্তর' ইত্যাদি কবিতায় ভালোবাসা ও প্রতিবাদ-মিশ্রিত বেদনার স্বাদ পাঠককে অভিভূত করে, চেতনায় জ্বালা ধরায়। 'অন্নদেবতা', 'রুটি চাই', 'কালো বস্তীর পাঁচালী', 'বেকার জীবনের পাঁচালী' কবিতায় জ্বালা আছে, উচ্চকিত প্রতিবাদও আছে। আবার 'সভা ভেঙে গেলে', 'টাইফয়েড', 'কবিতা পরিষদের বই মেলায়', 'কবির সভায়' ইত্যাদি কবিতায় প্রাতিষ্ঠানিকতার লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে, বুদ্ধিজীবীদের সর্পিল শঠতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হয়েছে।

চল্লিশ দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান ছিল। তাঁরা উভয়েই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবশ্য সেভাবে কখনোই কোন দলের সঙ্গে যুক্ত হননি। তবে অংশত সে সময় যোগাযোগ রেখে চলতেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (আর. এস. পি.) সাথে। কিন্তু সেও আর. এস. পির মুখপত্রে লেখালেখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর মাঝে তিনি সমমনা তরুণ ও প্রবীণ কবিদের কবিতার বই প্রকাশ করে নিজে ঝোলায় ভরে নিয়ে বিক্রি করেছেন। বড় প্রকাশনী সংস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিকতা-বিমুখ ধারাকে এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় তিনি এসব করেছেন, স্পষ্টতই বোঝা যায়।

সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে জরুরী অবস্থার কালো দিনগুলোতে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে, ততোধিক প্রচণ্ড সাহসী কবিতা রচনা করেছেন। অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক যখন রাজ-অনুগ্রহের প্রত্যাশায় ধর্ণা দিয়েছেন রাজ-ভবনে, তখন তিনি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এ সময়ের কয়েকটি কবিতার শিরোনাম 'ঘাটের মরা', 'কেউ যেন মন্ত্রী হয়ে', 'মন্ত্রী-পতনের শব্দ', 'আমার সন্তান যাক

প্রত্যহ নরকে', 'স্বদেশপ্রেমের দীপ্ত মহিমায়', 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে' প্রভৃতি। এই কবিতাগুলোর প্রতিটি স্তবক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বিদ্রোহের বেগবান উচ্চারণ। 'আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে' কবিতার কয়েকটি ছত্র :

আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে
ছিঁড়ুক সর্বাঙ্গ তার ভাড়াটে জল্লাদ,
উপড়ে দিক চুল, জিহ্বা দিবা-দ্বিপ্রহরে,
নিশাচর শ্বাপদেরা ;
করুক আহ্লাদ
তার শৃঙ্খলিত ছিন্ন-ভিন্ন হাত-পা নিয়ে
শকুনেরা ! কতটুকু আসে-যায় তাতে
আমার, যে-আমি করি প্রত্যহ প্রার্থনা,
তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

সুকান্ত ও সুভাষ সম্পূর্ণত রাজনীতি ও সমাজ চেতনার কবিতা লিখেছেন গোড়া থেকেই। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দুই কবি থেকে স্বতন্ত্র চারিত্রের পথ খুঁজেছেন, কিন্তু জীবনানন্দীয় নিসর্গ বা বিষাদের দ্বারা আক্রান্ত হননি পুরোপুরি। মাঝামাঝি একটি বলয় রচনায় সচেষ্ট হয়েছেন। আবার বিভূতিভূষণের 'দেবযান'-এর মত জীবন-বিরোধী ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা প্রভাবিত অস্বাভাবিকতায়ও পদস্খলন হয় নি তাঁর। বরং মানবতাবাদী সংগ্রামের নৈকট্যে যেতে চেয়েছেন।

সত্তরের শেষ থেকে আশির দশকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রত্যয়ী মানুষের বোধ বিকশিত হতে থাকে। হয়তো জীবনের এতটা কাল-পরিসরে-লব্ধ নিঃশঙ্ক চেতনা উন্মুক্ত হতে চেয়েছে। 'জেলখানার কবিতা', 'নতুন প্রত্যয়', 'পৃথিবী ঘুরছে', 'সাগ্নিক', 'আর এক আরম্ভের জন্য', 'এক টুকরো লাল কাপড়' ইত্যাদি কবিতাগুলো আমাদের সামনে আরেক জগৎ উন্মোচন করেছে।

১৯৮০তে লেখা 'আর এক আরম্ভের জন্য' কবিতায় লিখেছেন :

কেননা আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা
আমাকে হাজারবার কান ধরে ওঠবোস করালেও
একই সঙ্গে আমাকে এই অভয় মন্ত্র দিয়েছে,

ভয় দেখাবার মাস্টার মশাইরা
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য নয়;
আসল সত্য রয়েছে আমার মায়ের দেওয়া
ছোটবেলার স্বপ্নের মধ্যে,
যা, আমার বুকের ভেতর থেকে
কেউ কোনদিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না।
আমি আর একবার সেই আশ্চর্য স্বপ্ন
যা আমার হারিয়ে যাওয়া কবিতা
যা আমার এবং যে কোন মানুষের একটি বেঁচে থাকবার পৃথিবী
তাকে খুঁজে বার করবো,
সে জন্য আমাকে যত মূল্যই দিতে হোক।

সমসাময়িক কালে মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্ন, অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন অত্যন্ত জোরালো। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে ক্ষুদ্র অংশের দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে ক্রমশ। অর্থাৎ সমাজের দুটো শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে, যা রূপ নিচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামে। বর্তমান সময়ে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর কাছে শ্রেণী সংগ্রাম এবং শুদ্ধ মানবতাবাদীদের কাছে জীবন সংগ্রাম সত্য হয়ে উঠছে। সাহিত্যে তাই সংগ্রামের কথা বলতেই হয়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষণ্ণতা, স্বাভাবিকতা, প্রেম ও সংগ্রামের পর আশির দশকে এসে অংশত শ্রেণী সংগ্রামের কথকতায় কবিতাকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি কবির কুণ্ঠাহীন সমর্থন প্রচুর কবিতায় এসেছে ঘুরে ফিরে। এমনি একটি কবিতা 'লড়াই ছাড়া':

আমার ঘুঁটে কুড়ুনী মা। আমার মা।
তুই আমাকে স্বপ্ন শিখিয়েছিস, আলাদীনের স্বপ্ন।
কিন্তু বেঁচে থাকার নিয়ম, তার লড়াই
দুনিয়া জুড়ে সেই লড়াই
কেন আমার রক্তে তুই দিলি না?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবশেষে একটা নির্মল, সকলের-বাসযোগ্য সুষম পৃথিবীর কামনা ব্যক্ত করেছেন, যেখানে মায়ের আঁচলের প্রশান্তি থাকবে, গান থাকবে, দুঃখ-কান্না-বেদনার বদলে অফুরন্ত ভালবাসা থাকবে, ক্লেদহীন, পাপাচারহীন নিরাময় পরিবেশ থাকবে:

একটা পৃথিবী চাই/মায়ের আঁচলের মতো
আর যেন ঐ আঁচল জুড়ে/গান থাকে
যখন শিশুদের ঘুম থাকে।
যেন অনেকক্ষণ/শিশুরা শান্তিতে ঘুমায়;
যখন ঘুম থেকে/তারা জেগে উঠবে,
যেন তাদের জন্য/মায়ের বুক খোলা থাকে।
একটা পৃথিবী চাই/শুকনো কাঠের মত মায়েদের
শরীরের কান্না নিয়ে নয়,
তাদের বুক ভর্তি অফুরন্ত ভালবাসার/শষ্য নিয়ে,

('আন্তর্জাতিক প্রহসন নয়, সত্যিকারের পৃথিবীর জন্য')

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসলে কবি ছিলেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের। কখনোই তিনি বড় প্রতিষ্ঠানের বড় কাগজে লেখায় উৎসাহী ছিলেন না। আর বড় প্রকাশকের দ্বারস্থও হন নি বই প্রকাশ করতে। পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রকাশিত ক্ষুদে লিটল ম্যাগাজিনে লেখা পাঠাতেন তিনি সাগ্রহে। পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে যে কোন ক্ষুদে কাগজ সম্পাদক কখনই ব্যর্থ হননি লেখা চেয়ে। প্রত্যহ ডাকে তাঁর কাছে প্রচুর ছোট বড় নানা আকারের ম্যাগাজিন পৌঁছাত। চটি আকারের অল্পখরচের কবিতার বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলো। সকল শ্রেণীর পাঠকের সামর্থের কথা বিবেচনা করে এমন প্রকাশনার উৎসাহে ভাটা পড়েনি তাঁর কখনও।

আইয়ুব হোসেন

আলোকপাত

সাম্রাজ্যবাদী পীড়নের আর-এক রূপ

বিভিন্ন রকমের শোষণের চির শিকার তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো এক অদৃশ্য শোষণ-শৃঙ্খলে আটকা পড়েছে বহুদিন থেকে, অথচ এ শোষণ সম্পর্কে জনচেতনা তথা রাজনৈতিক চিন্তা এখনও অনেক ক্ষেত্রে প্রায় শূন্যের কোঠায় বলা যায়। ভারত, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি অনেক উন্নয়নকামী দেশের মহিলারা আজ এ শোষণের সুলভ সামগ্রীতে পরিণত।

পর্যটনের নামে ভ্রমণ আজ (তৃতীয় দুনিয়ার) কোন কোন দেশে সরকারী স্বীকৃত শিল্পেই প্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। যত সুন্দর নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এ ধরনের বিলাস ভ্রমণের একমাত্র না হলেও প্রধান লক্ষ্য যে দেহ সম্ভোগ এ সত্য অনেকের কাছে এখন আর অজানা নয়।

উন্নত তথা বিশ্ব শোষক চক্রের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর তরফে বেশ কিছু কাল আগে থেকেই উন্নয়নের বহু মাদুলি এবং তন্ত্র-মন্ত্র দেয়া হচ্ছে। এরূপ একটি মাদুলির নাম হলো পর্যটন শিল্পের প্রতি উৎসাহ দান। এ উৎসাহ দানের পেছনে তাদের প্রদত্ত যুক্তিগুলো হয়তো একেবারে উপেক্ষণীয়ও নয়। নিঃসন্দেহে অন্য অনেক শিল্পের চেয়ে পর্যটন শিল্পে প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ লাগে অপেক্ষাকৃত কম। দ্বিতীয়ত, এ শিল্পের পরিচালনা-দক্ষতা অর্জনও অনেকটা সহজ। তৃতীয়ত, এর মুনাফা হারের মাত্রাও বেশ আকর্ষণীয়।

কিন্তু পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে চাইলেই যে তা গড়ে তোলা সম্ভব সে নিশ্চয়তা কোথায়? কোন দেশের ইচ্ছাতেই শুধু ভিন দেশ থেকে আশানুরূপসংখ্যক লোক সর্বদা সেখানে আসে না। দেখার মত আকর্ষণীয় স্থান বা বস্তু ছাড়াও থাকার, উপভোগের ও ভ্রমণের জন্য তুলনা-মূলকভাবে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা এবং মানবিক ও নৈসর্গিক সহজলভ্য পরিবেশ দরকার। এ জন্য চাই প্রকৃতির দানের সাথে মানবিক পরিকল্পিত পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধ আয়োজনের অপূর্ব সমন্বয়। সত্যিকারের অর্থে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের পক্ষে নির্দোষ এরূপ আয়োজন সম্ভব নয়।

প্রকৃতির অবদানে তারা একেবারে দরিদ্র না হলেও মানবিক যাদুকাঠির স্পর্শে মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠতে না পারায় প্রকৃতি ও ইতিহাসের সৃষ্টিগুলো এসব দেশে প্রায় আবেদনহীন হয়ে পড়ে।

সম্ভবত বাংলাদেশের উদাহরণটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কক্সবাজারে আমাদের এক সুন্দর ও দীর্ঘতম সমুদ্র উপকূল থাকা সত্ত্বেও তাকে আজ পর্যন্ত নানাবিধ বর্ণাঢ্য আয়োজনে ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আশানুরূপভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় নি। একই কথা বলা চলে ঐতিহাসিক স্থানগুলোর প্রতি গ্লানিকর উদাসীনতার ব্যাপারে। তবে শুধু বাংলাদেশে নয়, উন্নয়নকামী অনেক দেশেই এ অবস্থা লক্ষণীয়। অথচ পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের আগ্রহ কারো থেকে কারো কম নয়।

যারা এ সফরে যায় তাদের নিজের ও তাদের নিজ নিজ কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাপারটি অত্যন্ত স্বচ্ছ। সেখানে কোন রাখ-ঢাক নেই। যেখানে তারা যায় সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছেও এ বিষয় অত্যন্ত প্রাঞ্জল। এর সাথে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পর্যটনের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টিকারী তথাকথিত ট্র্যাভেল এজেন্সীগুলোর প্ররোচনা এবং উদ্দীপনা-সঞ্চারী প্রচারণা ও তৎপরতা। যথার্থ অর্থে পর্যটনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় স্থানকেও এরা বেশ আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম। এদের প্রচারিত প্রচারপত্র, পোস্টার, এমনকি সময় সময় টিকেটে পর্যন্ত যা থাকে তাকে সংক্ষেপে বলা যায় নারী দেহের প্রগলভ প্রকাশ বা যৌন-আকাঙ্ক্ষা পূরণের নির্দেশিকা। উন্নত দেশের বহু লোকের কাছে অনেক উন্নয়নকামী দেশে পর্যটনের ব্যাপারে অন্য বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যাপকতর ও সহজলভ্য (মহিলা) সামগ্রীর কারণে সেগুলো বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ কারণে কোন কোন তৃতীয় দুনিয়ার দেশে পর্যটনশিল্প এবং যৌনশিল্প প্রায় যেন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থাৎ উন্নয়নকামী দেশগুলো আজ উন্নত দেশগুলোর যৌন-শোষণেরও শিকার। এ শোষণ করা হচ্ছে নানা কায়দায়, নানা পন্থায়। উল্লেখ্য যে, শুধু পর্যটনের মধ্যেই এ শোষণ সীমিত নয়। তবে পর্যটন যে কোন কোন ক্ষেত্রে এ শোষণের এক প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে বোধ হয় সংশয়ের অবকাশ একেবারে কম। যৌন সফর অনুন্নত দেশ

থেকে উন্নত দেশের দিকেও হয় না, তা নয়। প্রাচ্যের সামন্ত কর্তারা আগের দিনে বিশেষ করে উন্নত দেশে যৌনাভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যেও কিছু কিছু সফর করতেন। কিন্তু প্রাচ্যের ঐ যৌন-লালসা-ভিত্তিক সীমিত-সফরের সাথে উন্নত দেশসমূহের নাগরিকদের তরফে ব্যাপক যৌন সফর বা শোষণের বিরাট ব্যবধান। অনুন্নত দরিদ্র দেশের কিশোরী থেকে যুবতী বা মহিলা পর্যন্ত অগণিত অসহায় নারীকূলকে বাধ্যতামূলকভাবে এই যৌন শিকারে বা যৌন শিল্পের অতিসস্তা কাঁচা মালে পরিণত করা হয়েছে। অথচ উন্নত দেশে এ ব্যাপারটি সাধারণত অসহায়ত্ব বা বাধ্যবাধকতার ব্যাপার নয়। সেখানে তা তেমন সুলভ পণ্যও নয়।

প্রথমত, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোর মত উন্নত দেশগুলোতে যৌন শিল্প তথা শোষণ থাকলে তা প্রচণ্ড শক্তিশালী মহলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে এত ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করেনি।

দ্বিতীয়ত, এ শিল্পের অপরিহার্য মহিলাদেরকে সেখানে অসহায় বলি না বলে বলা যায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশীদার। কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত সেখানে অপেক্ষাকৃত মজবুত।

তৃতীয়ত, উন্নত দেশের যৌন শিল্প অভ্যন্তরীণ ভোক্তা-নির্ভর। ভিন্ দেশীয়, বিশেষত অনুন্নত দেশীয় ভোক্তা থাকলেও তাদের সংখ্যা এত নগণ্য যে তা উল্লেখ করার মত নয়। কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য কাঁচা মালের মত কোন কোন দেশের যৌন-পণ্যও ধনী দেশের অগণিত নাগরিক আজ পানির দরে যথেষ্ট ভোগ করছে।

ব্যাপারটি নিছক যৌন-শোষণের মধ্যেই সীমিত থাকেনি বা থাকছে না, সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ যৌনব্যাধিসহ আরও অনেক সামাজিক সমস্যা। সিফিলিসের মত কোন কোন যৌনব্যাধি প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগেই অনেক পরাধীন দেশে বিস্তার লাভ করেছে বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক (যথা কোরিয়া ও ভিয়েতনামের) যুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী বা দখলদারী সৈন্যদের দ্বারা শুধু যে যৌন-শোষণ ও যৌনব্যাধি বিস্তার লাভ করেছে তা নয় বরং অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক জারজ সন্তান ভিন্নতর ও কঠিন আর একটি সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

হালের এইডস রোগ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। এ রোগে আজ সর্বাধিক পর্যুদস্ত সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আফ্রিকা

বা অন্য যে কোন স্থানকেই তারা এ রোগের উৎপত্তিস্থল বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুক না কেন, উন্নত দেশের প্রগলভ ও ব্যভিচারী যৌন-লালসাই যে এর প্রচণ্ড বিস্তারের প্রধান কারণ সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৮৮ সালের ১লা আগস্ট পর্যন্ত সরকারীভাবে সত্তর হাজার এইডস রোগীর কথা জানা গেছে। রিপোর্ট-বহির্ভূত সংখ্যার কথা অনুমান করা কঠিন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, আমেরিকা মহাদেশের মোট ৪০টি দেশে এ রোগের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। ইউরোপের ২৮টি দেশে এ রোগের অস্তিত্বের খবর পেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সংস্থার ধারণা ইউরোপের প্রায় পাঁচ লাখ লোক এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত।

কিন্তু আমাদের উৎকণ্ঠার ব্যাপার এই যে, উন্নত দেশগুলোর তরফে অনুন্নত দেশসমূহে যৌন-শোষণ বা যথেচ্ছা অভিযানের ফলে (পর্যটন ও অন্যান্য পন্থায়) এইডস্ রোগ আজ অনেক উন্নয়নকামী দেশে অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য সংস্থার উপরোক্ত প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, আফ্রিকায় এযাবৎ ৪৫টি এবং এশিয়ায় ২২টি দেশে এইড্স্ রোগ ধরা পড়ার খবর জানা গেছে। এশিয়ায় সরকারীভাবে জানা রোগীর সংখ্যা কম হলেও অজানা রোগীর সংখ্যা যে অনেক বেশি তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কারণ প্রথমত, এ রোগের লক্ষণ সম্পর্কে এখানে লোকেরা তেমন সচেতন নয়। দ্বিতীয়ত, এর ভয়াবহতা বা বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেও এ ব্যাপারে তারা উদাসীন। তৃতীয়ত, বিদেশী পর্যটক বা অন্য কোন লোকের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি (মহিলা) নিজের ও সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষে লজ্জায় বা ব্যবসা হারাবার ভয়ে এ রোগের খবর গোপন রাখার চেষ্টা করা স্বাভাবিক।

মূল কথা হলো উন্নত দেশের এক শ্রেণীর বিকৃত বিনোদন-প্রত্যাশী নাগরিকদের তরফে যৌন তথা নারী-শোষণ কোন কোন উন্নয়নকামী দেশে এক ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে প্রথমে ভারতের কথা আলোচনা করা যায়।

ভারত যদিও সরকারীভাবে দেশ থেকে বেশ্যাবৃত্তি সম্পূর্ণ বিলোপ করতে ওয়াদাবদ্ধ এবং এ ব্যাপারে সেখানে বেশ কিছু আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে, তবু প্রায় সারা দেশেই জবরদস্তিমূলক বেশ্যাবৃত্তি ও হীনতম ধরনের যৌন-

শোষণ বিদ্যমান। ব্যাপারটা শুধু কাঁচা মাংস-সন্ধানীদের মধ্যেই সীমিত নয়। বিভিন্ন ধরনের পর্যটন-বেশ্যাবৃত্তিও ভারতে বিদ্যমান বলে ইউনেস-কোর এক সমীক্ষায় জানা যায়। কিন্তু ভারতের পর্যটন-বেশ্যাবৃত্তি বা যৌনাভিসারী পর্যটন শিল্প এখনও অন্য অনেক দেশের মত ব্যাপক ভিত্তিতে সুসংগঠিত নয়। ব্যাপারটি আজো দু ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত। প্রথমত, উপসাগরীয় অঞ্চলের সামন্ত, শেখ বা তেলাধিপতিদের মধ্যেই ভারতীয় পর্যটন বেশ্যাবৃত্তি প্রধানরূপে কেন্দ্রিভূত। এখানে দ্বিতীয় ধরনের পর্যটন বেশ্যাবৃত্তি চলে দিল্লী বা বোম্বাই-এর মত বড় বড় শহরগুলোর আন্তর্জাতিক হোটেলগুলোতে। কল গার্ল বা দৃশত আভি-জাত্যমণ্ডিত একদল যুবতীর সাথে এসব হোটেলের চুক্তি বা বোঝাপড়া থাকে এবং সে-ভিত্তিতে তারা বিদেশী যৌনাভিসারীদের লালসা পূরণের জন্য যথাসময়ে হোটেলে হাজির হয়।

কিন্তু ইউনেসকো রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে যে, কোন কোন দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশে বেশ্যাবৃত্তি-নির্ভর পর্যটন যেভাবে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে ভারতে সে-ধরনের যৌন-নির্ভর পর্যটনের কোন অস্তিত্ব নেই। বোধ হয় বলা যায় সরকারীভাবে স্বীকৃত সেরূপ কিছুর অস্তিত্ব সেখানে নেই। তবু সুপ্তভাবে যা চলছে তাতে বিদেশী যৌন শোষণের মাত্রা যে এখানে কম নয় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ভারত তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দেশ। বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত এদেশের মহিলাদের আকর্ষণ বিভিন্ন দেশের নারী-মাংস লোলুপদের কাছে কম নয়। পণ্য হিসাবেও এখানে নারী বেশ সস্তা। তাই অনেক বিদেশী পর্যটকের কাছে এদেশ লোভনীয় হওয়ার কথা। এমন কি পাকিস্তানী আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর আমলারা নাকি সাপ্তাহিক যৌন সফরে যেতেন ভারতে (কলকাতা), তবে অভ্যন্তরীণ বেশ্যাবৃত্তিটা এখানে অত্যন্ত ব্যাপক ও বীভৎসভাবে প্রকাশ্য হলেও পর্যটন-কেন্দ্রিক বেশ্যাবৃত্তি সেরূপ প্রকটভাবে প্রকাশ্য নয়। এমন কি এখানে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর জন্য 'বিশ্রাম ও বিনোদন' ব্যবস্থা হিসাবেও নির্দিষ্ট বারবণিতা কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। ইউরোপ-আমেরিকার মত উচ্চ শ্রেণীর গণিকাদের সমগোত্রীয় কোন গ্রুপ গড়ে ওঠার সুযোগও এখানে হয়নি। কাজেই যৌনকামী বিদেশীদের সফর এদেশে ব্যাপক হলেও তাকে বলা যায় অনেকাংশে সুপ্ত। বৈদেশিক মুদ্রা

উপার্জনের অন্যতম উৎস হিসাবে পর্যটন-সহায়ক যৌন শিল্প এখানে সরকারীভাবে স্বীকৃত নয়। এই শিল্প সরকারী স্বীকৃতি না পাওয়ার দরুণ বিদেশীদের হয়তো কিছুটা সুবিধাই হয়েছে। অর্থাৎ অতি সহজে ও সস্তায় তারা সেখানে যৌনাভিলাষ পূরণ করতে সক্ষম হয়। গণিকাবৃত্তি বিলোপবাদী আন্তর্জাতিক ফেডারেশনে ভারতীয় এক মহিলা প্রতিনিধি ১৯৮৪ সালে ভিয়েনায় বলেছিলেন, 'শহর এলাকার ব্যবসা কেন্দ্রে এবং গ্রামীণ বাজারগুলোতে পর্যন্ত সব ধরনের গণিকাবৃত্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।' তাঁর মতে, সমাজের উচ্চ আয় গ্রুপের বিরাট-সংখ্যক বিত্তবান লোকের ক্রমবর্ধমান লালসার সাথে দ্রুতবিকাশমান শহরায়ন ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া যুক্ত হয়ে এই বৃত্তি (গণিকা) সম্প্রসারিত হচ্ছে।

অনেক সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার সম্মিলিত চাপের কারণেই এ পরিস্থিতির উদ্ভব। এছাড়া রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী লালিত কিছু ঐতিহ্য বা কুসংস্কার। অনেকেই স্বেচ্ছায় এ পেশায় যোগ দিয়েছে বলে মনে হলেও গভীর ভাবে তলিয়ে দেখলে সুস্পষ্ট হয় যে, তথাকথিত এই স্বেচ্ছা-নির্বাচনের পেছনেও রয়েছে অবধারিত বাধ্যবাধকতা।

ভারত আজ তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রধান পতাকাবাহী নিঃসন্দেহে, তবু এদেশে মহিলারা এখন পর্যন্ত পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও যৌন দিক থেকে চরম এক বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার। বিশেষত অবহেলিত বা নিম্নতর ও সুবিধা-বঞ্চিতদের সমাজে এ বৈষম্যের মাত্রা অত্যধিক। স্বভাবত বিদেশী নারী-মাংস সন্ধানীদের পক্ষেও এদের উপর অমানবিক যৌন শোষণ চালানো অপেক্ষাকৃত সহজ।

এ ধরনের নারী দেহ-বুভুক্ষু পর্যটন-কেন্দ্রিক যৌন-শোষণের একটি জঘন্য রূপ হলো অস্থায়ী বিয়ে। এটা প্রধানত দেখা যায় বোম্বাই ও হায়দরাবাদ অঞ্চলে। উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত পর্যটকরাই মূলত এ ধরনের বিয়ে করে। এটা আসলে কোন বিয়ে নয়—অতি অস্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে একজন মহিলাকে রক্ষিতা হিসাবে সম্ভোগ করা। ক্রেতার জন্য এ কাজটি বেশ লাভজনক। এমন কি মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্যেও যদি এই অস্থায়ী বিয়ের সুবাদে কোন ক্রেতা একজন মহিলাকে উপভোগ করে তবু প্রতি রাতে একজন কল গার্ল ভাড়া করার চেয়ে তার খরচ কম পড়ে। অথচ এই 'অস্থায়ী বিয়ে'র শিকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কুমারী মেয়েরা। স্বভাবত তাদের আকর্ষণ ও বাজার দর অনেক বেশি হওয়ার

কথা। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় এই মেয়েরা তাদের চেয়ে দু বা তিন গুণ বয়সী লোকের সাথে মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে কৃত্রিম এই বিয়েতে আবদ্ধ হয় এবং মাত্র কয়েক দিন বা সপ্তাহ পর ঐ অস্থায়ী স্বামী (?) কর্তৃক চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়ে সারা জীবন গুরুতর বঞ্চনা ও সামাজিক তাচ্ছিল্যের শিকার হয়।

ভারতীয় অনেক সংবাদপত্রে পর্যটনকেন্দ্রিক যৌনশোষণ ও অভ্যন্তরীণ বীভৎস ও অমানুষিক বাধ্যতামূলক গণিকাবৃত্তির চিত্র বেশকিছু ফুটে উঠলেও ইউনেসকো পর্যবেক্ষকদের মতে তা এখনও পর্যাপ্ত নয়। বিশেষত অনেক ক্ষেত্রে রক্ষকরা (যেমন পুলিশ বা প্রশাসনযন্ত্র) ভক্ষক হয়ে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে যে শুধু অন্তরায় সৃষ্টি করছে তা নয়, বরং তারা বিনা পয়সায় নিজেদের লালসা পূরণের মাধ্যমে এই জঘন্য শোষণের পথ আরও প্রশস্ত করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাপক যৌন শোষণের শিকার অন্য একটি দেশের আলোচনা শুরু করার আগে আমরা এখানে আরও কয়েকটি সাধারণ লক্ষণীয় বিষয় আলোচনা করতে চাই।

প্রথমত, অনুন্নত অনেক দেশই আজ উন্নত ও ধনী দেশের পর্যটকদের যৌন শোষণের শিকার হলেও অনেকে মনে করেন এশিয়ার কিছু দেশই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি শোষিত। এ দেশগুলোর সচেতন গোষ্ঠী তাই 'যৌন পর্যটন'-ভিত্তিক এই নয়া ধরনের আন্তর্জাতিক শোষণ সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। বিশেষত সংশ্লিষ্ট মহিলা গ্রুপগুলো মনে করেন এশিয়ার মহিলাদের ওপর এটা অত্যন্ত অমানবিক ধরনের এক যৌন ও অর্থনৈতিক শোষণ, যার সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকরা প্রায় কিছুই জানেন না।

১৯৮৫ সালে এসকাপ-আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিগত দু দশক সময়ে ব্যাঙ-এর ছাতার মত গণিকা শিল্পের বিকাশকে মুখ্যত ব্যাপক-ভিত্তিক আন্তর্দেশীয় পর্যটনের ফলশ্রুতি হিসাবেই গণ্য করা হয়। বিভিন্ন দেশে ঐতিহ্যগত বা পূর্ব-প্রচলিত গণিকা বৃত্তি এখন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই বৃত্তি বর্তমানে ব্যাপকভাবে আধুনিক বাণিজ্যিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আর একটি ব্যাপার হলো, এসব দেশের (এশিয়ার) কোন কোনটিতে অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের উদ্দেশ্যে সরকারী কৌশল হিসাবে পর্যটন শিল্পের প্রতি অদম্য উৎসাহ প্রদান করা

হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এশিয়ার দেশগুলোতে পর্যটকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এসকাপের এক হিসাবে জানা যায়, ১৯৮২ সালে ১ কোটি ৬২ লাখ পর্যটক এশিয়া সফর করে এবং এর সাহায্যে ৭০৪ কোটি ডলার রাজস্ব আয় হয়। উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত অঙ্কটি সারা পৃথিবীর পর্যটন ব্যয়ের শতকরা প্রায় সাত ভাগ।' এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের এক প্রতিবেদক বলেছেন, "জাতীয় অর্থনীতি যেহেতু ভয়ানক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, সে অবস্থায় ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষের মাংস (দেহ) বিক্রির বিনিময়ে সমস্যা প্রতিকারের প্রচেষ্টা চলছে।...এর ভিত্তিতেই যৌন সফর, বৈদেশিক বিনোদন, কনে বাজার, বিদেশে ঘরোয়া বন্ধন ও অন্যান্য ধরনের নারী-শোষণের বিকাশ ঘটেছে।"

যৌন পর্যটন বিস্তৃতির প্রমাণ হিসাবে একটি তথ্য উল্লেখ করা যায় যে, বছরে প্রায় ৩৫ লক্ষ পুরুষ (বেশির ভাগ জাপানী) গাটরি সফর (প্যাকেজ টুর) পরিকল্পনা-ভিত্তিক বিমান টিকিট ক্রয় করে। ব্যক্তি-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা একাজে নিয়োজিত বড় কর্পোরেশনগুলো তাইপে ও সিউলের মত বড় বড় কেন্দ্রসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এ ধরনের সফরের ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সারা এশিয়া জুড়ে বিভিন্ন মহিলা গ্রুপের পক্ষ থেকে, বিশেষত জাপান ও অন্যান্য উন্নত দেশের পুরুষদের তরফে যৌন সফরের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানের পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ১৯৮১ সালে ট্র্যাভেল এজেন্সীগুলোকে হুশিয়ারি দান করা হয়েছিল এবং এ জাতীয় যৌন সফর আয়োজন করে দেয়ার জন্য দায়ী অন্তত ২০টি উদ্যোক্তা সংস্থার লাইসেন্স বাতিলেরও হুমকি দেয়া হয়েছিল। তবু নারী মাংস-সন্ধানী পর্যটনের মাত্রা কি কমেছে? ১৯৮০ সালের এক হিসাবে কেবলমাত্র ব্যাংককেই তখন এক লাখ গণিকা ছিল। এ সংখ্যা বর্তমানে আরো অনেক বাড়া ছাড়া যে কমে নি তা জোর দিয়েই বলা যায়।

এখন মালয়েশিয়ার আলোচনায় আসা যাক। এ সম্পর্কিত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, সরকারীভাবে অস্বীকার করা হলেও যৌন পর্যটন দৃশ্যত মালয়েশিয়ায় বিরাজমান। তবে একথা মানতেই হবে যে, এদেশে তা থাইল্যাণ্ড বা ফিলিপাইনের মত ব্যাপক নয়। ১৯৮০ সালে 'কনজিউমারস এসোসিয়েসন অব পেনাং' (সিএপি)-এর এক সমীক্ষায় বলা হয়ে-

ছিল যে, "মেয়েদের সহজলভ্যতার দিক থেকে ব্যাংককের পরেই পেনাং-এর স্থান।"

মালয়েশিয়ার কোন কোন সংবাদপত্রে অভিযোগ করা হয় যে, হংকং (অন্যান্য জায়গাও বটে)-এর পর্যটন উদ্যোক্তারা মালয়েশিয়ায় একটি বিশেষ ধরনের বিনোদনমূলক ক্লাব গড়ে তোলার জন্য প্রায় নগ্ন মেয়েদের চিত্রায়িত করে একটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ফিল্ম প্রদর্শন করছে। পর্যটন এজেন্টদের তরফে যদিও বলা হয় যে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো শুধু মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পারিবারিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গাটরি সফরের আয়োজন করে তবু তাদের বিজ্ঞাপনে এ দাবির সত্যতা পাওয়া যায় না। কারণ বিজ্ঞাপনে থাকে টপলেস মহিলার ছবি। মালয়েশিয়ার প্রাক্তন একজন পর্যটন সহায়িকা (টুরিস্ট গাইড) এক সংবাদপত্রকে বলেন যে, তিনি প্রায়ই তার ক্রেতাদেরকে (বিদেশী) রেড লাইট এলাকাগুলোতে নিয়ে যেতেন (নিশ্চয় পর্যটন কেন্দ্রের বদৌলতে) যাতে তিনি যে কোম্পানীতে কাজ করতেন তার দুর্নাম (আসলে ক্ষতি) না হয়।

আর একটি পত্রিকায় বলা হয় যে, বিদেশী বিশেষত জাপানী পর্যটকরা জাতীয় মনুমেণ্ট বা বাণ্টু গুহার মত ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ভ্রমণ-কেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার বদলে রুদ্ধদ্বার কক্ষের কাজকর্মের দিকেই অধিকতর আকর্ষণ বোধ করে। এক বড় হোটেলের অভ্যর্থনাকারীর (রিশেপশনিস্ট) সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, তারা (বিদেশী পর্যটক) এসেই প্রথমে শহরের একটি মানচিত্র খোঁজে। তারপর নিতে চায় বার (পানশালা), ম্যাসেজ পারলার ও রেড লাইট এলাকার খোঁজ। বিভিন্ন অবস্থার চাপে পেনাং-এর বিলাস-বহুল হোটেলগুলোতে বিদেশীদের উদ্দেশ্যে নোটিশ ঝুলিয়ে বলতে হয়েছে তাদের রুমে কোন মেয়ে নিয়ে না ঢোকার জন্য। তাসত্ত্বেও মালয়েশিয়ায় জাপানী পর্যটকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮১তে এ সংখ্যা বেড়ে হয় দ্বিগুণ। এবং তারপরও বাড়ছে। পর্যটন শিল্পের প্রতি উৎসাহ দানের প্রচেষ্টা হিসাবে গৃহীত মালয়েশিয়া সরকারের 'প্রাচ্য দর্শন কর' নীতির ফলশ্রুতিও বলা যায় এটাকে। এ শিল্পের প্রতি আরো উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে জাপান ও মালয়েশিয়া উভয় সরকার ১৯৮৩ সালে উভয় দেশের নাগরিকদের জন্য পরস্পরের দেশে ১৫ দিনের সফরের উপর থেকে ভিসা প্রথা তুলে দেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা হয়তো বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যাপক সংখ্যক পর্যটকের আগমন ও তাদের খেয়ালি আকাঙ্ক্ষা

পূরণ করতে গিয়ে স্থানীয় অনেক বাসিন্দাকে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা সংস্কার ত্যাগ করতে হচ্ছে। ফলে একটি নৈতিক অবক্ষয়ও সমাজের বুকে নীরবে ঘটে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মালয়েশিয়ার বুকে পর্যটকদের জন্য অনেক সামাজিক প্রদর্শক এজেন্সী গড়ে উঠেছে। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সুন্দরতম দিকগুলো পর্যটকদের কাছে তুলে ধরাই এদের মূল কাজ হলেও বাস্তবে এজেন্সী-নিয়োজিত অনেক প্রদর্শক নিজেরাই দ্রুত পর্যটকদের আনন্দদানের বস্তুতে পরিণত হতে সম্মত হয়। এ অবস্থায় এদেশের অনেক সংবাদপত্রের সমীক্ষায়ও গণিকাবৃত্তি ও পর্যটনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে এবং এ সম্পর্ক কোনভাবে হ্রাস পাচ্ছে না বলে সমীক্ষায় জানা যায়।

পেনাং-এর গণিকাবৃত্তি আবার কিছুসংখ্যক সিণ্ডিকেট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং সিণ্ডিকেটগুলো বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সংগঠিত। প্রতিটি সিণ্ডিকেটের হাতে ১৪ থেকে ৩০ বছর বয়সী ২০ জনের মত মেয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিককালে অবশ্য এই সিণ্ডিকেটগুলোর তৎপরতা বন্ধ করার জন্য পুলিশের তরফে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেশকিছু সিণ্ডিকেট তারা বন্ধ করে দিতে পেরেছেন বলে দাবি করলেও পুলিশের মতে সিণ্ডিকেটের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান।

অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় নাকি থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন থেকে গণিকা আমদানি করা হয়। তবে এর বিরুদ্ধে মালয়েশিয়া পুলিশও কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এদিকে মালয়েশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশগুলো থেকে আনীত অনেক মেয়ে তথাকথিত রিউটি সেলুন, নৈশ ক্লাব, ম্যাসেজ পারলার ও বার-এ কাজ করে। এর বাইরে প্রদর্শক এজেন্সীর আড়ালে যে ব্যাপক গণিকা বৃত্তি চলে তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, অন্যান্য অনুন্নত দেশের মত এদেশের মেয়েরাও দেশী চক্র ও বিদেশী পর্যটকদের হাতে চরম যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার হলেও তাদের আয় মোটেই বেশি নয়। তাদের গড়পড়তা আয় মাসে চারশ থেকে ছয়শ ডলারের মধ্যে সীমিত। অল্প-সংখ্যকের আয় মাসে এক হাজার ডলার। অথচ পশ্চিমা 'ভোক্তা সংস্কৃতি (কনজিউমার কালচার) প্রাধান্যের ধারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার কারণে শহরে বসবাসকারীণী এই মেয়েদের ওপর আধুনিকতম ফ্যাশন অনুসরণের চাপ খুব বেশি। ফলে কথিত অল্প আয়ে চলা তাদের জন্য দুষ্কর।

অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকার কারণে আশির দশকে মালয়েশিয়ায় ব্যাপারটি অধিকতরভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। এছাড়া অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিক্রিয়ায় অনেক শিল্প-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থা কর্মচারীদের বিশেষত নবনিযুক্ত তরুণী মহিলারদেকে ছাঁটাই করার নীতি গ্রহণ করায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে এর দ্বারা আর একটি সামাজিক সমস্যা গভীরতর হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে ছাঁটাইকৃত মহিলাদের অনেকে যৌন শিল্পের খোরাক হয়ে গণিকাদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলবে। এর অন্য অর্থ হলো, গণিকা পেশায় নিয়োজিত মেয়েদের উপার্জন আরও কমে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া।

কোন কোন সংবাদপত্রের জরিপে জানা যায়, ১৫ বছরের নীচের ব্যাপক সংখ্যক শিশুও এখানে যৌন শোষণের শিকার। কিন্তু এ ব্যাপারে সম্ভবত আরও গভীর সমীক্ষার প্রয়োজন। কারণ অনুন্নত দেশগুলোতে শিশুদের উপর যৌন শোষণের ব্যাপারটি এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হয়।

যৌন শোষণ-ভিত্তিক পর্যটনের ক্ষেত্রে আরও অনেক দেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকলেও ফিলিপাইনের আলোচনা বিশেষ কারণে প্রয়োজন। কারণটি হলো আমেরিকান সামরিক ঘাঁটির অবস্থান। এছাড়া অন্যান্য দিক থেকে ফিলিপাইনে পর্যটন-সংশ্লিষ্ট যৌন শোষণ সমগোত্রীয় দেশগুলোর চেয়ে খুব ভিন্ন নয়। তবে ধারণা করা হয় যে, এদেশে গণিকাবৃত্তি ও যৌন শোষণের ব্যাপকতা ও নিবিড়তা অনেক বেশি। চরম দারিদ্র অবশ্য এর অন্যতম কারণ। এদিকে জাপানীসহ কোন বিদেশীর কাছে চীনা বা কোরিয়ান মেয়েদের দাম নাকি ফিলিপাইনী মেয়েদের তুলনায় বেশি। এরও অন্যতম কারণ হয়তো যৌন শিল্পে ফিলিপাইনী মেয়ে সরবরাহ-প্রাচুর্য।

ফিলিপাইনের আর একটি বৈশিষ্ট্য বোধহয় ধরা পড়ে জাপানী এক সংবাদ সংস্থার একজন প্রতিনিধির বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন, "মেয়েদেরকে শিকার (যৌন শোষণের) হিসাবে দেখানোর একটি সাধারণ প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু পুরুষের ব্যাপারটি কি?" (অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন পুরুষেরাও যৌন শোষণের শিকার হন।) তিনি আরও জানান, "জাপানের সবচেয়ে শোষিত শ্রেণীর পুরুষরা ফিলিপাইনের সবচেয়ে শোষিত শ্রেণীর মেয়েদের

সাথে মিলনের জন্য আসে।" এর অর্থ কি তা হলে এই দাঁড়ায় না যে, উন্নত জাপানের সবচেয়ে শোষিত পুরুষদের পক্ষেও স্বদেশের মাটি ছেড়ে এসে (পর্যটক হিসাবে) ফিলিপাইনী মেয়েদেরকে যৌনভাবে শোষণ করা সহজ ও লাভজনক?

এখন ফিলিপাইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। একথা আজ অনেকটা সর্বজনস্বীকৃত যে, আমেরিকান ঘাঁটির অবস্থানের কারণে এদেশের মেয়েদের উপর বহিরাগতদের যৌন শোষণের ব্যাপকতা অনেক বেশি।

আমেরিকান এক সাংবাদিককে ১৯৮৫ সালে ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ম্যানিলা ফোরামে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ফিলিপাইনের (আমেরিকান) সামরিক ঘাঁটি ও গণিকাবৃত্তির ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন কিনা। জবাবে তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর অন্যান্য সামরিক ঘাঁটির ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও কিছু বিশেষ সম্প্রদায় বা সমাজ গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, এ জাতীয় ব্যাপার পৃথিবীর সর্বত্রই আছে এবং সর্বদা থাকবে। দৃঢ়তার সাথে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, এ জাতীয় যৌন কর্মকাণ্ডকে (গণিকাবৃত্তি ইত্যাদি) এখন অতি স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই গণ্য করা হয়। তার মতে, কেবল শিশু ধর্ষণের মত কাজকে অস্বাভাবিক বিবেচনা করা যেতে পারে।

সামরিক ঘাঁটির সাথে গণিকাবৃত্তি-নির্ভর একটি সমাজের সম্পর্ককে অপরিহার্য ও স্বাভাবিক বলে ধরে নিলেও এর ফলে সৃষ্ট ব্যাপকসংখ্যক অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের সমস্যাটিকেও কি উপেক্ষা করা যাবে? যুদ্ধ বা সামরিক ঘাঁটির কারণে এ সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে বহু দেশ। অতি নিকট অতীতে (পঞ্চাশের দশকে) এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল কোরিয়া। আরও পরে এ সমস্যায় ভুগতে হয়েছে ভিয়েতনামকে। উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে আমেরিকার কর্তৃত্বের যুগে খোদ জাপানেই এ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যুগের পরিবর্তনে এখন জাপানের বিরাট সংখ্যক পর্যটকই এশিয়ার কিছু অনুন্নত দেশে যৌন শোষণ চালাচ্ছে।

এ যুগে যৌন শোষণের ব্যাপারে আরও নানা ধরনের সূক্ষ্ম ও আবরিত পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বড় বড় হোটেলে অনুষ্ঠিত মডেলিং শোনের কথাও উল্লেখ করা যায়। এছাড়া ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইত্যাদি তো আছেই। বিত্তবান ক্রেতাদের অবসর বিনোদনের জন্য

স্বল্পকালীন সঙ্গ দানের চুক্তিতেও আজ মহিলা ভাড়া করা হয়। ক্রেতাদের অভিলাষ-মত এ সব মহিলা তাদের সঙ্গে অন্যান্য দেশও ঘুরে আসে। বিভিন্ন কোম্পানির তরফ থেকে আবার নানা কায়দায় সুন্দরী মহিলাদেরকে বিনা খরচে স্বল্প সময়ের জন্য বিদেশ সফরের জন্য সুযোগ বা পুরস্কার দেয়া হয়। এছাড়া যৌন লালসায় ইন্ধন সৃষ্টিকারী পর্নোগ্রাফী তো আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন যৌন শোষণ বা গণিকাবৃত্তি অপ্রতিরোধ্য। কেউ কেউ বলেন কথাটি সত্য এ কারণে যে, তিনটি ইজম-এর সাথে গণিকাবৃত্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ তিনটি ব্যবস্থা হলো : পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ। দাস প্রথার নাম এর সাথে উল্লেখ না করার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। দাস যুগে কি গণিকা ছিল না? নিশ্চয় ছিল এবং আরো নির্মমতমভাবে শোষিত হতো তারা। তবে হয়তো একথা বলা যায় যে, সে-যুগের যৌন শোষণ এমন আন্তর্জাতি রূপ পরিগ্রহ করে নি। কিন্তু তাতে যে আন্তর্জাতিক চরিত্র একেবারেই ছিল না তা-ও নয়। বরং অন্য দেশ দখল করে দখলিকৃত দেশের বাসিন্দাদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে নারীদের ওপর ব্যাপক যৌন শোষণ চালাবার রীতি ছিল।

তত্ত্বগতভাবে সমাজতন্ত্রে কোন গণিকাবৃত্তি থাকার কথা নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বহুদিন তা ছিলও না বলে জানা যায়। কিন্তু এখন অন্য খবর শোনা যাচ্ছে। যদি তা সত্য হয় তবে এটাকে কি সমাজতন্ত্রের উন্নতি বা অবনতি, না কি যৌন শোষণ-প্রক্রিয়ার উন্নতি বা অবনতি হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে? —এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবেন নিশ্চয় ভাবীকালের সমাজতত্ত্ববিদরা।

অনুন্নত, বিশেষত এশিয়ার এই শ্রেণীভুক্তদেশগুলোতে প্রচলিত যৌন শোষণের ধারাকে মোটামুটি কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত একটি সীমারেখা টানা যায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রকৃতির যৌন শোষণের মধ্যে। অবশ্য দুয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। তবে এসব দেশে পর্যটন ও বিদেশী ক্রেতা-নির্ভর যৌন শোষণের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে এ শোষণের আরও দুটি রূপ দেখা যায় অন্তত এশিয়ার মাটিতে। এর একটি হলো প্রায়-বন্দী মহিলাদের উপর যৌন শোষণ। এশিয়ার অনেক দেশের অগণিত

মহিলা সম্পূর্ণ কারাবন্দীর মত বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অসহায় ও করুণভাবে এ শোষণের শিকার। এই মহিলারা যদিও প্রধানত স্বদেশীদের (এমনকি তথাকথিত সাধক পুরোহিতদের) দ্বারাই শোষিত হয় তবুও নিয়ন্ত্রণকারীরা অনেক সময় তাদেরকে বিদেশীদের ভোগের নৈবেদ্য হিসাবেও তুলে দেয়।

দ্বিতীয় ধরনের যৌন শোষণ চলে অনেকটা স্বেচ্ছায়, একাজে লিপ্ত মহিলাদের ওপর। উন্নত দেশের এ শ্রেণীর মহিলাদের মত তারাও তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে স্বাধীন। কিন্তু কার্যত তা নয়। কম-বেশি আর্থিক চাপ, সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আধুনিক বিলাসবহুল জীবনের লালসা কিংবা কোন কোন মহলের প্ররোচনার ফলেই এরা মূলত এই শোষণের শিকার হয়। বন্দী শোষিতাদের চেয়ে এদের আর্থিক মূল্য কিছু বেশি হলেও উন্নত দেশের সমগোত্রীয়দের চেয়ে এদের দাম অনেক কম। ফলে উন্নত দেশের ক্রেতারা ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় অনুন্নত দেশে এসে এদের লোভে ভিড় জমায়। এভাবেই এ দেশগুলোতে বেড়ে চলেছে বিদেশী যৌন শোষণ, নানা পন্থায় নানা নামে।

পর্যটন এই শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হলেও পর্যটন মাত্রই যৌনাভিলাষমুখী নয়। বিদেশ ভ্রমণ অবশ্যই মানুষের একটি সহজাত ও সুন্দর আকাঙ্ক্ষা। উন্নত দেশের কিছু পর্যটক নিজেদের উদগ্র লালসা পূরণের উদ্দেশ্যে পর্যটনকে যৌন শোষণের হাতিয়ার করে তুলতে চাইলেও শিল্পটিকে এজন্য দায়ী করা যাবে না কিংবা বন্ধও করা চলবে না এটিকে। বস্তুত যৌন শোষণকারীদের আকাঙ্ক্ষিত স্থান না হয়েও কোন কোন অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে অন্যতম প্রাণসঞ্চারী খাত হয়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যতে পারে হালে ব্যর্থ এক অভ্যুত্থানের কারণে বিশ্ব দৃষ্টি-আকর্ষণকারী ক্ষুদ্র দেশ মালদ্বীপের কথা। মাত্র দু লাখের মত অধিবাসী-অধ্যুষিত মোট ৪১০০০ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে হাজার খানেক দ্বীপ নিয়ে গঠিত এ দেশের মোট জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ আসে মৎস্য শিকার ও পর্যটন শিল্প থেকে। প্রায় ৫৫টি দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে চুরাশি হাজার বিদেশী পর্যটক এ দেশ সফর করে। এতে দেশটি বিদেশী মুদ্রা আয় করে দু কোটি তের লাখ ডলার। যে দেশের মানুষের মোট জাতীয় আয় মাথা পিছু বার্ষিক ৪১৮ ডলার সেখানে কেবল পর্যটন শিল্পখাত থেকেই বৈদেশিক মুদ্রায় আয় হচ্ছে মাথাপিছু বার্ষিক প্রায় ১০৭ ডলার। অর্থাৎ

মাথা পিছু বার্ষিক আয়ের শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশি আসে পর্যটন শিল্প থেকে। এরকম সুযোগ অন্য কোন কোন অনুন্নত দেশেও হয়তো সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু পর্যটন ও অন্যান্য পন্থায় পরিচালিত যৌন শোষণ ও সংশ্লিষ্ট নানা যৌন রোগের বিস্তার থেকে অনুন্নত দেশগুলোকে কীভাবে রক্ষা করা যায় সেটিই বড় প্রশ্ন।

বিনোদ দাশগুপ্ত

* প্রধানত ইউনেস্কোর সার্ভে থেকে তথ্যগুলো সংগৃহীত

সাক্ষাৎকার

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সাথে

প্রশ্ন : গত কয়েক বছরে আপনি বেশ কটা আন্তর্জাতিক সভায় যোগ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু কি আপনি দেখতে পেয়েছেন যাতে এ মুহূর্তের সমাজ ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে?

উত্তর : আমার মতে এর প্রত্যেকটিতেই বিশ্বশান্তির ব্যাপারে আজকের মানুষের গভীর আগ্রহ ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এবং এর জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। এর প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে, যা আগে কখনো এমন-ভাবে দেখা যায়নি।

শিল্পীরা এক্ষেত্রে ভালো দৃষ্টান্ত রাখছেন। যেমন ধরুন, আমি ১৯৮৭তে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে রুশ ও মার্কিন চিত্র পরিচালকদের সঙ্গে আলাপ করি, যাঁরা যৌথ প্রযোজনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমি প্রথমে একটু সন্দিহান ছিলাম কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম তাঁরা হলিউড মার্কা স্বপ্ন ব্যবসার কথা বলছেন না, বরং মানবিক লক্ষ্য সামনে রেখে স্বতন্ত্র স্বনির্ভর প্রযোজনার কথা ভাবছেন। ফলে আমি আশ্বস্ত হই। এ ধরনের পরিকল্পনার ফল ভালোই হবে এবং তা দু দেশের মধ্যে বিশ্বাস ও সমমর্মিতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন : আপনি তো বিভিন্ন লাটিন আমেরিকান দেশে যান। তাদের এই মুহূর্তের বিশেষ রাজনৈতিক লক্ষণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রমবর্ধমান একতার ব্যাপারে সচেতনতা এবং সে উদ্দেশ্যে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তব প্রয়োগ।

প্রশ্ন : চিলিতে ১৯৭৩ সালের অভ্যুত্থানের পর আপনি ঘোষণা করে-ছিলেন পিনোচেট যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন কোন বই প্রকাশ করবেন না। কিন্তু কোন এক সাক্ষাৎকারে আপনি জানিয়ে-ছেন সেই যুদ্ধে আপনি হেরে গেছেন—

উত্তর : হ্যাঁ, আমার পরাজয় হয়েছে ঠিকই তবে চূড়ান্ত বিজয় হবে আমা-দেরই। তাই আমি উপলব্ধি করি, লেখা বন্ধ করে দেয়ার পরিবর্তে

আমি যদি কিছু ভালো লেখা প্রকাশ করতে পারি তাতেই বরং পিনোচেট-এর পতনকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : প্রথম থেকেই আপনার গল্পে মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং এক ধরনের দুর্মর আশাবাদ লক্ষ্য করা গেছে। আবার অধিকাংশের মধ্যেই প্রচুর হিংসারও প্রকাশ ঘটেছে—

উত্তর : মানুষ যখন বুঝতে পারে না যে সাম্য ও স্বাধীনতা এক অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার, যখন তারা পরস্পরকে বুঝতে পারেনা তখন তো ভালো কিছু ঘটতে পারে না। আমি নিশ্চিত, এ ব্যাপারে শিল্প-সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি নিশ্চয়ই প্রকৃত 'সংস্কৃতি'র কথা বলছেন। কিন্তু এর বাইরেও তো এমন এক 'বারোয়ারী সংস্কৃতি'র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যা এ ধরনের নির্মম নাশকতার প্রচার চালায়।

উত্তর : হ্যাঁ এটা ঠিক। বাণিজ্যিক শিল্প তাদের ক্ষমতার দৌরাত্ম্যে অনেক বেশি ক্ষতিকারক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লাতিন আমেরিকায়, এমনকি পশ্চিমেরও অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এর বিপদ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন। যেমন ধরুন, টেলিভিশন। তারা একে অবজ্ঞা করেন বিকৃত গণসংস্কৃতির বাহক বলে। কিন্তু এতে করে তারা এমন শক্তিশালী সম্ভাবনাপূর্ণ একটি গণমাধ্যমকে ব্যবসায়ী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছেন, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার পরিবর্তে।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলে থাকেন আপনি কেবল বুদ্ধিজীবীদের মতো একটি ছোট গোষ্ঠীর জন্যই লেখেন।

উত্তর : আমি মনে করি গণবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। আমি 'এলিট' সংস্কৃতি বলে কিছু বুঝি না। অবশ্যই তার অস্তিত্ব আছে কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। প্রতিটি সংস্কৃতিরই শেকড় থাকা উচিত জনগণের মধ্যে এবং তা তাদের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেই আমি উপলব্ধি করেছি। জনগণই কোন জাতির সংস্কৃতির প্রধান উৎস, এ সত্য অনুধাবন না করা পর্যন্ত আমি প্রকৃত লেখক হয়ে উঠতে পারি নি। ক্যারিবিয়ান উপকূলের পল্লী সাহিত্য, সংগীত ও রূপকথায় লুকিয়ে থাকা বিশাল সাহিত্যিক

সম্ভাবনা আবিষ্কার আমার সাহিত্য জীবনের একটি প্রধান মাইল ফলক।

আপনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তার আরেকটি দিক আছে। একটা সময় ছিলো যখন আমি নিজেও ভাবতাম আমি বুঝি শুধু বুদ্ধিজীবী গোছের পাঠকদের জন্যই লিখে থাকি। কিন্তু প্রকৃত তথ্যে দেখা গেলো যে আমার বই কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাও পড়ছেন। তারা শুধু আমার বই পছন্দই করে না, সেটা তাদের হৃদয়ে সৃষ্টির তাগিদও জাগায়। যখন আমি তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই তারা, তখন জানায় যে এর থেকে ভালো গল্প তারা জানে এবং সত্যি সত্যি অসাধারণ কিছু গল্প তারা আমাকে শুনিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ প্রগতিশীল সাহিত্য সমালোচকেরা দাবি করেন লাতিন আমেরিকান উপন্যাসের এই প্রবল দেশাত্মবোধই এর বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির প্রধান কারণ। আপনি কি তাঁদের সঙ্গে একমত?

উত্তর ঃ পুরোপুরি। দীর্ঘকাল ধরে লাতিন আমেরিকায় বেশ ভালো ভালো উপন্যাস প্রকাশ হয়ে আসছে কিন্তু তখন লেখকদের একমাত্র কামনা ছিলো ফরাসী কিংবা ইংরেজী ভাষায় তার অনুবাদ হওয়া। এটা 'লাতিন' উপন্যাসের বিস্ফোরণ (Bcom) কথিত ঘটনাটির আগে পর্যন্ত চলে আসছিলো। কিন্তু এ ঘটনার পর, ষাটের দশকের শেষদিকে আমরা বুঝতে পারি এ বিস্ফোরণের মূল কারণ ফ্রান্স ব্রিটেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে এর জনপ্রিয়তা নয় বরং খোদ লাতিন আমেরিকান পাঠক মহলে এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা। এবং সেটা সম্ভব হয়েছিলো যখন আমরা তাদের আশা-আকাঙ্খা ও আনন্দ-বেদনার কাহিনীকে আমাদের কলমে শিল্পসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলাম। আর তখনই লাতিন সাহিত্য সম্পর্কে প্রকৃত আগ্রহ জন্মে পশ্চিমে। অর্থাৎ এই আন্দোলনের গতি ভেতর থেকে বাইরের দিকে, কখনোই তার উল্টোটি সত্য নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র এখন ষাটপূর্ব সাহিত্যের পর্যায়ে রয়েছে?

উত্তর ঃ লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্রের প্রচণ্ড অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এ ক' বছরে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা কখনো বিশ্বব্যাপী দর্শক

পায়নি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ছবি তৈরি হয়েছে লাতিন আমেরিকায় কিন্তু তাদের প্রচার হচ্ছে না ঠিকমতো, কেননা আমাদের ছবির বাজার-ব্যবস্থা মার্কিনী ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যারা এ সমস্ত ছবিতে আগ্রহী নয় মোটেও। আমরা এ অবস্থাটা পাল্টাতে চেষ্টা করছি দু বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত 'নিউ লাটিন আমেরিকান ফিল্ম ফাণ্ড'-এর মাধ্যমে।

প্রশ্ন : ফাণ্ডের চেয়ারমেন হিসেবে আপনি কি আমাদের বলবেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : প্রথমত এবং প্রধানত লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাণ-শিল্পের উন্নয়ন, দ্বিতীয়ত এর বাজার তৈরিকরণ এবং একে যথাযথভাবে সংরক্ষণ। লাতিন আমেরিকা থেকে অনুন্নত অনেক দেশেরও নিজেদের আর্কাইভে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের অনেকের তা না থাকাতে অনেক ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ছবি অহরহ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষতি অপূরণীয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কুড়ি বছরে লাতিন আমেরিকায় চে গুয়েভারা, সালভাদর আলেন্দে কিংবা একনায়কদের কোন প্রামাণ্য দলিল থাকবেনা। আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিপরম্পরা সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। এ জন্য আমরা অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ তুলে সাও পাভলো লাইব্রেরীকে নতুন, পুরনো সব ছবি সংরক্ষণের যোগ্য করে তুলছি ক্রমশ।

প্রশ্ন : আপনাদের চলচ্চিত্রের জন্য বাজার নিশ্চিতিকরণ, মানে আপনারা বর্তমানে প্রচলিত আন্তর্দেশীয় চলচ্চিত্র পরিবেশনা নেট ওয়ার্ককে উপেক্ষা করে নিজেদের কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান?

উত্তর : হ্যাঁ, অনেকটা তাই, এবং এ লক্ষ্যে কিছু কিছু কাজও শুরু করে দিয়েছি আমরা। আমাদের প্রত্যাশা, অচিরেই লাতিন আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশে এমন কিছু ছবিঘর থাকবে যেখানে শুধু লাতিন আমেরিকান ছবিই দেখানো হবে। এ উদ্দেশ্য মাথায় রেখে আমরা হয়তো ইউরোপের কিছু কিছু দেশের হল ভাড়া নিতে পারি। তবে সবচে বড় কাজ হবে চলচ্চিত্র দর্শক ও ব্যবসায়ীদের মানসিকতা পরিবর্তন। এটা কেবলমাত্র সেই সমস্ত বৃহৎ পরিবেশন সংস্থা নিয়ন্ত্রিত দেশেই হতে হবে তা নয়, কেননা সোভিয়েত

ইউনিয়নের মতো দেশেও দর্শকরা লাতিন আমেরিকার ভালো ভালো ছবি দেখার সুযোগ পায়নি এতকাল। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞরাই সব সময় ছবির ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করেন না বলেই এ ঘটনা ঘটেছে। যাদের হাতে এ দায়িত্ব তারা তাদের রুচি অনুযায়ী সিরিয়াস ছবির চাইতে হয়তো বিনোদন ছবিকে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি। আমরা এ অভ্যাস ভাঙতে চাই এবং আশা করি সোভিয়েতের সাম্প্রতিক পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ায় এটা সম্ভব হবে। পেরেস্ত্রইকার একটি প্রচণ্ড সামাজিক শক্তি রয়েছে যা আমাদের দেশে নির্মিত সিরিয়াস চলচ্চিত্র সোভিয়েত জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ গত বছর কিউবায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। এটা নিশ্চই আপনার প্রস্তাবিত কাজগুলোর প্রথমটিকে, অর্থাৎ লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে বড় রকমের অবদান রাখবে।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। এ প্রতিষ্ঠান আমাদের একটি বড় পরিকল্পনা। এতে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের চিত্র গ্রহণ, চিত্রনাট্য রচনা, সর্বোপরি চিত্র নির্মাণের বিশদ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম দাবি করে আসছে যে, এ প্রতিষ্ঠান মূলত কিউবারই, আপনি শুধু তার প্রচারণার দায়িত্ব নিয়েছেন।

উত্তর ঃ আমি কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে এরকম একাত্মতা অনুভব করি এবং তার জনগণের সঙ্গে আমার এতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে কিউবার নেতৃত্বের ধ্যান-ধারণা প্রচারে আমি খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবো বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি, এ প্রতিষ্ঠান কিউবার নিজস্ব কোন সম্পত্তি নয়, এমনকি এটা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গতও নয়। এর পরিচালনা ও অর্থ সংস্থান এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরই। এর চরিত্র সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং এখানে পড়ার জন্য কোন খরচ লাগে না। বিভিন্ন দেশের শিক্ষকরা এখানে স্বেচ্ছায় কাজ করেন। হয়তো সারা বছরের জন্য সেটা সম্ভব হয় না। তবে কিছু সময় তারা সানন্দেই এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করে থাকেন। যেমন ধরুন, বছরে তিন মাস আমি কীভাবে গল্প বলতে হয়, এ বিষয়ে ক্লাস নিয়ে থাকি।

আমার ক্ষেত্রে, এ স্কুলে কাজ করার অর্থ মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন। কুড়ি বছর আগে আমি যদি জানতাম শিক্ষকতার এমন সুফল, তাহলে আমার দ্বারা হয়তো এত লেখা হয়ে উঠতো না। অবশ্য এখন আমি এ দুটোকে মেলাতে চাইছি। আমার ছাত্রদের আমি সর্বাগ্রে চিন্তা করতে শেখাই। আমার ক্লাসের প্রধান উদ্দেশ্য প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে ছাত্রদের নতুন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে শেখানো যাতে করে তারা তাদের ও অন্যান্যদের চিন্তা ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আমার ছাত্ররা, যাদের অনেকেই হয়তো ইতোমধ্যে একটি কি দুটি ছবি তৈরি করেছে, সব সময় সে ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয় না। তাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা কখনো কখনো এমন জোরালো ছাপ রেখে যায় যে, তারা ক্বচিৎ তাদের অভ্যাসের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে।

সেজন্য আমি আগামী বছরে আমার ক্লাসে দশজন বয়স্ক ছাত্রের পরিবর্তে দশজন নয় বছরের বালককে ভর্তি করতে চাই। তাদের স্বাতন্ত্র্য হবে এটা যে, এর আগে কোন ছবি কিংবা টেলিভিশন দেখার কোন অভিজ্ঞতা থাকবে না তাদের। গ্রামের ছেলে তারা। তারা হবে গ্রাম্য গাঁথার মানুষ। ফলে ছাপার অক্ষরের অনুশাসনের বোঝা বয়ে বেড়াবে না তারা। তার অর্থ এই নয় যে সৃজনশীলতার কোন ক্ষমতা থাকবে না তাদের। তবে সেটা কোন পূর্ব-ধারণার বশবর্তী হবে না; তারা যা করবে ভেবে-চিন্তেই করবে। তখন হয়তো আমার ক্লাসের নাম 'কীভাবে গল্প বলতে হয়' না হয়ে হবে, 'ভাবতে সাহস করো'।

আমি নিশ্চিত যে লাতিন আমেরিকার সিংহভাগ শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীই মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত। বড় কথা হলো কাজ এবং সংগ্রাম। এবং এ সংগ্রামের একটাই উদ্দেশ্য। লাতিন আমেরিকার তথা সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির প্রকৃত সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা।

[সাক্ষাৎকারটি *World Marxist Review* পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৮৮ সংখ্যা থেকে অনূদিত]

অনুবাদ ঃ আলম খোরশেদ,

হালের ছবি

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে ধরে রাখবার একটি শক্তিশালী স্তম্ভ আজকের চলচ্চিত্র। বাস্তবতা-বিবর্জিত এই চলচ্চিত্র মানুষের মনোজগৎকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে, সীমাবদ্ধ রাখছে চিন্তা-চেতনা। যাদুঘরে রাখবার জিনিস-পত্র এখনও চলচ্চিত্রের হাতিয়ার। ঢাল-তলোয়ারের কথা বলছি: ওগুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ছবি হলেত কথাই ছিল না, তা হচ্ছে কই? শত বৎসর পূর্বের রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র চলচ্চিত্রের বন্ধু।

রাজায় রাজায় বিরোধ হয়, যে কোন একজন মারা যায়—সব ঠিক। রাজার দু'সন্তানের একজন হারিয়ে যায়, পরে মিলন—ঠিক। রাজকন্যা নিয়ে দুই রাজপুত্রের মধ্যে ঝগড়া, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ (রংক্ষয়ী বলা ভাল), প্রমাণ হয় এক রাজপুত্র আসলে রাজপুত্র নয়—সব ঠিক। দেখা গেল এক ডেঞ্জারাস যুবক প্রজাদের হয়ে (প্রজাদের মধ্যে বীরাঙ্গনা প্রেমিকাও আছে) অত্যাচারী রাজাকে মেরে ফেলে, পরে এক বুড়ি প্রমাণ করে এই যুবকও আগের রাজার ছেলে, যাকে অবৈধভাবে মেরে ক্ষমতায় আসে এই অত্যাচারী রাজা—এও ঠিক। কখনও দেখা যায় বাঘা যুবক অত্যাচারী রাজার সাথে যুদ্ধে রত যুদ্ধে রাজা মারা যায় এবং তখনই প্রমাণিত হয় রাজা সেই বাঘা যুবকের পিতা, কিছু কান্না, উজিরের মেয়ের সাথে পরিণয় এবং সিংহাসনে যুবকের প্রতিষ্ঠা। অনেক সময় রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করবে কে—এ প্রশ্নে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আহ্বান, প্রেমিকের ছদ্মবেশে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ এবং অবশ্যই বিজয়ী, পরে ছদ্মবেশ সম্বন্ধে রাজা অবগত তখন বাহুতে মাদুলির সাহায্যে প্রমাণ হয় প্রেমিকও ভিন্ রাজার পুত্র। অর্থাৎ রাজতন্ত্র থাকবেই, নানারকম গোঁজামিল দিয়ে।

গ্রামধর্মী চলচ্চিত্র যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর বড় অংশই বাঁধা মোড়ল-সংক্রান্ত ঘটনায়। মোড়লরা শেষ হয়ে গেছে পুঁজিবাদী সমাজে। আমাদের গুণী-জনেরা তাদেরকে দৃঢ় অবস্থান দেখাচ্ছেন চলচ্চিত্রে। বেশির ভাগ মোড়লই তাদের ভুল বুঝতে পারে, ফিনিশিং-এ যার কোন দোষ নেই। আবার গ্রামের যুবক মোড়লকে হটিয়ে তার মেয়েকে বিয়ে করে। ছবি শেষে মোড়লতন্ত্র টিকে থাকে।

এভাবে মানুষের চিন্তাকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে অতীতে। দর্শক রাজা আর গোড়লের স্থায়িত্বের ধারণা নিয়ে বাসায় ফিরছে। আবার এ দু ধরনের ছবিতেই ধর্মান্ধতা সযত্নে লালিত। নায়ক-নায়িকার দৃষ্টিশক্তি অলৌকিক রশ্মির সাহায্যে ফিরে পাওয়া ('জবাব দে, জবাব দে' জাতীয় গানের কারণে), ভিলেনের লাগানো শিকল বিশেষ প্রার্থনায় ফুল হয়ে যাওয়া, মাজারে সমবেত গানের লীলায় এবং মূল আবেদনকারীর মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত বেরোনোর কারণে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া, নায়ক বা নায়িকার দুরবস্থায় তসবি-সম্বলিত হুজুরের আগমন এবং তলোয়ার দেয়া (কদিন পর হয়ত স্টেনগান দেবে, কারণ অশিক্ষার কারণে আধুনিকতা ও অলৌকিতার দ্বন্দ্ব চোখে পড়বে না, চলচ্চিত্রকার আধুনিকতা ও অলৌকিকতার সম্মেলন ঘটাবে সহজেই) ইত্যাদি ঘটনা মানুষের চিন্তাকে বাস্তব থেকে ভাববাদে নিয়ে যাবার সহায়ক হয়। মোদ্দাকথা অবাস্তবতার এস্টাব্লিশমেণ্ট। সামাজিক ছবিতে ইদানিং শহুরে জীবন প্রাধান্য পাচ্ছে। ভালো কথা, পাক। প্রায়ই ঐ ছবিগুলোতে ইউনিভার্সিটি দেখানো হয়। বাস্তবে যারা ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে বেমানান সেই নায়ক-নায়িকাকে ছাত্র-ছাত্রী বানানো হচ্ছে ছবির তথাকথিত প্লটের কারণে। এখানে বলার কিছু নেই, শুধু বলবো আদু ভাইয়ের পাশাপাশি আদু বোন নিয়েও একটি গল্প প্রচলন থাকা দরকার ছিল।

আজকের চলচ্চিত্রে ধর্ষণের মত অসামাজিক ব্যাপারটা ফিল্মি হাতিয়ার। অনেক অনেক 'কেন'-র উদ্রেক করে শহুরে ছবি। ঢাকা শহরের হাজার হাজার রিক্সা-ড্রাইভারের মধ্যে নায়কের রিক্সায় নায়িকা উঠবে কেন? নায়ক ট্যাক্সি-ড্রাইভারের গাড়িতে নায়িকা ঠিকানাসহ ভ্যানিটি ব্যাগ রেখে প্রেম করবার সুযোগ করে দেবে কেন? অনুষ্ঠানে নায়ক-নায়িকা পাশাপাশি সিট পাবে কেন? নায়ক-নায়িকাই কেবল ধাক্কা লাগে কেন (ধাক্কার পর স্থির চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকা এবং প্রথম প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা বা নায়িকার 'ইডিয়েট' বলে গটগট চলে যাওয়া—চিরাচরিত) ফাংশানে নায়ক (বা নায়িকা) গান গাইবে এবং নায়িকা (বা নায়ক) প্রথম সারিতে বসবে কেন? নায়ক বা নায়িকা বারবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে কেন? নায়ক-নায়িকা এক সাথেই জীবিত অথবা মৃত থাকে কেন? পরিচয়ের মাধ্যম হিসাবে নায়ক বা নায়িকা একে অপরের গাড়ির নিচে পড়বে কেন? গুণ্ডাদের আক্রমণে গুণ্ডার সংখ্যাকে ফ্যাক্টর না ভেবে যুগে যুগে নায়িকা (ইদানিং নায়ক) উদ্ধার হচ্ছে কেন? নায়ক-নায়িকাই

গান গাইবে কেন আর সখিরা আ-আ-আ করবে কেন? মাঝে মাঝে ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্বে পার্শ্ব নায়িকা নায়ককে ভালবাসে কিন্তু তাদের পরিণয় অসম্ভব। কারণ মূল নায়িকা আছে। এ সমস্তকিছুর সমাধান হিসেবে ভিলেনের গুলি নায়ককে উদ্দেশ্য করে মারা হলে পার্শ্ব নায়িকা সেই গুলি নিজের বুকে নিয়ে অনর্থক আত্মহুতি দেবে কেন? পৃষ্ঠা ভরানোই সার। এসব কেনর কোন জবাব হয় না। কিন্তু এসবে পয়সা আসে।

এ্যাকশন ছবির জগতে কুংফু—ক্যারাটে—ক্যাবারে এই তিনের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব (আধুনিক বিশ্বে কুংফু-ক্যারাটে যদিও তথাকথিত শিল্প, বাংলাদেশে অবশ্যই তা বিকৃত, কারণ সিনেমার টিকেট বেচার উপায়, গুণ্ডা হবার খায়েশ ইত্যাদি কাজে বাংলাদেশে ক্যারাটে-কুংফু ব্যবহৃত)। ইদানীং দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে নায়িকারাই অগ্রগামী। দেহের থলথলে মাংসের বাঁক দেখাবার জন্যে টানটান ড্রেস পরে মারামারি ও নাচানাচি। এ্যাকশান ছবিতে ভিন্নধর্মিতা আনার প্রয়াস পান অনেকে। আরম্ভে সামাজিক এবং আস্তে আস্তে গুণ্ডা এবং পরে উচিত-শিক্ষা দেবার জন্যে কালাপাহাড়। অনেক সময় গুণ্ডা গুণ্ডামিও করে, রাতের অন্ধকারে দানও করে। অর্থাৎ গুণ্ডামিকে লাইসেন্স। তরুণ দর্শকরা এ জাতীয় গুণ্ডা হবার স্বপ্ন লালন করতে অনুপ্রাণিত হয়।

আমাদের দেশের লোক অশিক্ষিত এবং তারা ছবি দেখে। এমন অবস্থায় চলচ্চিত্র অঙ্গনে বিচরণকারীদের দায়িত্ব বেশি। কারণ তাঁরা সুস্থ ছবি দিলে দর্শক তা নেবে, অসুস্থ ছবি দিলে, দর্শক তাও নেবে। খারাপ দেখতে দেখতে দর্শক ভালোটাকে খারাপ মনে করে। আবার ভালো দেখতে দেখতে দর্শক খারাপ চিহ্নিত করতে পারবে—এটাই বাস্তবতা।

পৃথিবীতে এখন মৌলিক ভাবে দুটি শিবির আছে—প্রগতির এবং প্রতিক্রিয়ার। প্রতিক্রিয়াশীলেরা আপাতবিজয়ী, যার একটা অংশ এখনকার চলচ্চিত্রে সক্রিয়, কিন্তু ইতিহাস প্রগতির পক্ষে। আমাদের চলচ্চিত্রকারদের আগামী দিনগুলোর কথা স্মরণ রেখে চলচ্চিত্র-অঙ্গনকে সুস্থ সংস্কৃতিধর্মী করা উচিত, না হলে তাঁরা চিহ্নিত হবেন প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে, নিক্ষিপ্ত হবেন আস্তাকুঁড়ে। কারণ আগামীরা আসছে।

মনজুরুল আজিজ পলাশ

গ্রন্থ প্রসঙ্গ

প্রয়োজন ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ইতিহাস

বাহান্ন'র মহান ভাষা আন্দোলনের পর তিন যুগ অতিক্রান্ত হল। তবু এ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের একটি সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হল না।

অবশ্য বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন যার শিরোনাম 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫ সালে, এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এরপর এ বিষয়ে আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, বশীর আল্‌হেলাল রচিত 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' (অক্টোবর ১৯৮৫)। স্বাতন্ত্র্যের ছাপ থাকলেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থ দ্বারা এটি প্রভাবিত বলে মনে হয়।

বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি এই যে, এখানে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে কিছুটা খণ্ডিত ও বিকৃত করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করে আমরা জানতে চাই, শুধু ঢাকায় নয়, সারা বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন কতখানি ব্যাপ্তি ও গভীরতা অর্জন করেছিল, তাই। আমরা আরো জানতে চাই; কোন্ প্রাণশক্তি, কোন্ সংগঠন, কোন কর্মীদল সারা বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের দাবানলকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ দুটো মূল কৌতূহলের সন্তোষজনক বা সঠিক উত্তর বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থে আমরা পাই না। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তীকালে সারা বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব গণআন্দোলন ও গণবিক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছিল তার অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখের পর লেখক মন্তব্য করেন যে, "ঢাকার বাইরে পূর্ব বাংলার সর্বত্র এই একই ধরনের বিক্ষোভ মিছিল জনসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই বইয়ে তাদের প্রত্যেকটির উল্লেখ ও বিবরণ প্রদান করা হল না।" (৩য় খণ্ড, পৃ ৩৫৭, পাদটীকা।) কিন্তু মনে হয় ভাষা আন্দোলনের এ অলিখিত অংশকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সারা বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব গণজোয়ার ও গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কি ছিল তার মূল প্রাণশক্তি, মূল সংগঠন শক্তি? এ প্রশ্নের উত্তরে বদরুদ্দীন উমর উপস্থিত করেছেন যুবলীগকে। তিনি বলেছেন: "সাংগঠনিক ভাবে যুবলীগই তখন বিরোধী সংগঠনগুলির

মধ্যে সবথেকে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী ছিল। ঢাকাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় এবং জেলাকেন্দ্রের বাইরের এলাকাতেও এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।" (৩য় খণ্ড, পৃ ৪৯২)

বদরুদ্দীন উমর যুবলীগকে একটি শক্তিশালী সংগঠন এবং ভাষা আন্দোলনের মূল প্রাণশক্তিরূপে চিত্রিত করতে চাইলেও এ দাবি যে নিতান্ত অতিশয়োক্তি ও ভিত্তিহীন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরই সংকলিত দলিল থেকে। যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সারা বাংলাদেশে প্রাদেশিক কমিটি ছাড়া যুব লীগের আরও মোট ১৪টি কমিটি ছিল। এর মধ্যে ৬টি ছিল জেলা কমিটি—রংপুর, বগুড়া, সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামালপুর ও কিশোরগঞ্জ মহকুমায় দুটি মহকুমা কমিটি ছিল। বগুড়া শহরে একটি শহর কমিটি ছিল। আর ছিল আক্কেলপুরে একটি স্থানীয় কমিটি। তৎকালীন নোয়াখালী জেলাতে কোন কমিটি ছিল না, ফেনীতে একটি মহকুমা কমিটি ছিল। ঢাকায় কোন জেলা কমিটি ছিল না—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ কলেজে দুটি কমিটি ছিল। উপরোক্ত আটটি জেলা ছাড়া অবশিষ্ট আটটি জেলায় ("রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রাম জেলায়") যুব লীগের কোন কমিটিই ছিল না (৩য় খণ্ড, পৃ ২০২)।

যুবলীগের সংগঠনও ছিল অত্যন্ত দুর্বল। "জেলা ওয়ার্কিং কমিটি হইতে শুরু করিয়া স্থানীয় কমিটি পর্যন্ত কোন কমিটিরই নিয়মিত বৈঠক হয় না। গত ৯ মাসে প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইয়াছে ৮টি এবং দুঃখের বিষয় ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সভ্যগণও সমস্ত বৈঠকে উপস্থিত হন নাই" (যুবলীগ সম্পাদকের রিপোর্ট, উদ্ধৃতি, ঐ, পৃ ২০৩)।

সহজ কথায় ঢাকা শহরে ও কয়েকটি জেলায় যুবলীগের কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল ও সচেতন কর্মী সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু যে সব জেলা কমিটির কথা বলা হল তাদের অস্তিত্ব কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরূপ একটি সংগঠন যে সারা বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে মূল প্রাণশক্তি রূপে কাজ করতে পারে এমন চিন্তা নিতান্তই দুর্বল কল্পনা। এরূপ একটি দুর্বল তত্ত্বগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বদরুদ্দীন উমর যখন ভাষা আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ করে এর ইতিহাস রচনা করেন তখন আমরা কিছুটা শঙ্কিত হই।

বদরুদ্দীন উমর অযাচিতভাবে যুবলীগের ওপর ভাষা আন্দোলনের সফল পরিচালনার সমস্ত কৃতিত্ব অর্পণ করা সত্ত্বেও যুবলীগের কোন দায়িত্বশীল নেতা আজ পর্যন্ত সে কথার প্রতিবাদ করেন নি। এজন্য তাঁদের প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাসে খানিকটা চিড় ধরে বই কি। তাঁদের বিবৃতি ও কথার উপর নির্ভর করে যদি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করতে হয় তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন—এ সত্য ভবিষ্যতের গবেষক ও ঐতিহাসিকরা উপলব্ধি করবেন এ কামনাও আমাদের মনে জাগে।

বদরুদ্দীন উমর কি কারণে যুবলীগকে ভাষা আন্দোনের প্রধান চালিকা শক্তিরূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন তা অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর এ প্রয়াসের ফলে ভাষা আন্দোলনের একটি প্রধান চালিকা শক্তিরূপে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত অবদানও অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে।

শেখ মুজিব প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমরের মধ্যে যে যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১ম খণ্ডে বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেছেন, ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (যথা, বহিষ্কারাদেশ, জরিমানা, প্রভৃতি) গ্রহণ করেন। কর্তৃপক্ষ শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিকট থেকে সৎচরিত্রের সার্টিফিকেটও দাবি করেন। বদরুদ্দীন উমর এ তথ্য বিবৃত করে মন্তব্য করেন: "এদের মধ্যে অনেকে এই ধরনের সার্টিফিকেট দাখিল করে এবং জরিমানা দিয়েই কর্তৃপক্ষের সাথে আপোষ করেন।" (১ম খণ্ড, পৃ ২০৩)

কিন্তু বদরুদ্দীন উমর যা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি তা হল, জরিমানা প্রদানে অস্বীকৃত হওয়ার দরুনই শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। শেখ মুজিবের প্রতি বদরুদ্দীন উমরের এই বিরূপ মনোভাব ভাষা আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে।

১৯৪৭-৪৯ সাল থেকে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ যে গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করে আসছিলেন এবং এর ফলে সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ঘটেছিল সেটাই ছিল মূল কারণ যার দরুন ভাষা আন্দোলন এতখানি দেশব্যাপী ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করেছিল। এ সত্য কথাটা অনুধাবন করতে না পারার জন্যই সম্ভবত বদরুদ্দীন উমর যুবলীগের ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখেছেন এবং নানা রকম কাল্পনিক তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

মাও সেতুঙ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে।' তারপর মন্তব্য করেছেন: "মনে রাখা দরকার যে, যে কোন অত্যাচার নির্যাতন তা যতই নির্মম হোক, সব সময় দাবানল সৃষ্টিকারী স্ফুলিঙ্গের কাজ করতে পারে না। সেটা সম্ভব হয় তখন যখন দাবানল সৃষ্টির মত ক্ষেত্র জনজীবনে তৈরী হয়। এই ক্ষেত্রটিই তৎকালীন পূর্ব বাংলায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বে তৈরী হয়ে গিয়েছিল" (৩য় খণ্ড, পৃ ৪৮৭-৮)। বদরুদ্দীন উমরের এ কথাটা যদি অর্থহীন নাও হয়, অন্তঃসারশূন্য বটে। কারণ, কোন্ প্রক্রিয়ায়, কাদের কাজের ফলে ঐ ক্ষেত্রটি তৈরি হয়েছিল সেটাইতো আমরা জানতে চাই।

বদরুদ্দীন উমর আরো বলেছেন, "লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক বিকাশ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।...বেকারত্ব, ফসলের উচিৎ মূল্য না পাওয়া এবং কৃত্রিম খাদ্য ঘাটতির মাধ্যমে অর্ধাহার ও অনাহারে মৃত্যু পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের প্রতিরোধ প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছিলো এবং তাঁদের চেতনার মধ্যে স্বপ্নসৃষ্ট যে স্যাঁৎসেতেমী ছিল তা দূর করে তাকে দান করেছিল এক ধরনের শুষ্কতা যা ছিল দাবানল সৃষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।" (৩য় খণ্ড, পৃ ৪৯০)

উদ্ধৃতি দুটি মন দিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে, বদরুদ্দীন উমর প্রয়োজন মত তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, তথ্যও সৃষ্টি করেন। এ সব মনগড়া তত্ত্বের মধ্যে স্বভাবতই অসঙ্গতি থাকে এবং বাস্তবের সাথেও এ সকল তত্ত্ব ও তথ্যের অমিল থাকে। যেমন, একবার তিনি বলছেন সব সময় অত্যাচার নির্যাতন দাবানল সৃষ্টির সূচনা করতে পারে না, আবার পর মুহূর্তেই বলছেন, দুর্ভিক্ষ অনাহার প্রভৃতি মানুষের মনে শুষ্কতা সৃষ্টি করে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। আমরা সন্দেহ না করে পারি না যে, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্রলীগ প্রভৃতি সহ যে সকল অজস্র দেশপ্রেমিক কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা দেশের মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটেছিল, এবং যে রাজনৈতিক বিকাশের পটভূমিতেই ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হয়েছিল, সে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে দৃষ্টির আড়ালে রাখার উদ্দেশ্যেই বদরুদ্দীন উমর উপরোক্ত মনগড়া তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এর ফলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যে খর্বিত হয়েছে সেটাই আমাদের প্রধান আক্ষেপের বিষয়।

ভাষা আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অর্জনের পেছনে যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ও সক্রিয় ভূমিকা ক্রিয়াশীল ছিল আমাদের এ দাবি প্রমাণ করার চেষ্টা আমরা এ মুহূর্তে করব না। এ দায়িত্ব ভবিষ্যতের গবেষকদের উপর অর্পণ করব। তবে আমাদের এ দাবির প্রতি পাঠকের প্রাথমিক প্রত্যয় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আমরা একজন বিশ্বাসযোগ্য রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য উদ্ধৃত করব।

কামরুদ্দীন আহমেদ বলেছেন:

১. "অনেকে বলেন যে মুজিব পাকিস্তান আমলে কেবল ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন ছাড়া যত আন্দোলন হয়েছে তার কোনটারই নেতৃত্ব দেন নি। তাহলে তিনি কি কারণে দশবার জেল খাটলেন?" ('বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী', ঢাকা, ১৯৭০, পৃ ৪)

২. "আওয়ামী লীগের কোন সুসংহত সংগঠন তখনো হয়নি। মওলানা ভাসানী বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গাঁয়ের দরিদ্র জনসাধারণের সভায় বক্তৃতা করেছেন—১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত। কিন্তু সংগঠন করার চেষ্টা কখনও করেননি। বাংলার প্রতিটি গ্রামে মওলানা সাহেব ও শেখ মুজিবের অজ্ঞাতে এক বিশেষ ধরনের আওয়ামী লীগার জন্ম নেন। তাঁরা হলেন ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যালঘু দল। এক অর্থে বিনা প্রচেষ্টায় দেশের সর্বত্র আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হল।" (ঐ, পৃ ৪)

বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকাকে অস্বীকার করার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির অবদানকেও কার্যত অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করেছেন, যদিও তিনি বলেছেন: "সেখানে [ঢাকার বাইরে] অনেক এলাকায় যুবলীগ কর্মীরা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা থাকলেও অন্যেরাও সক্রিয় ছিলেন এবং সর্বত্র অন্যদের প্রভাব ও নেতৃত্ব ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ" (৩য় খণ্ড, পৃ ৪৯৪)। এ অন্যেরা কারা? তারা যে আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ ও কমিউনিস্ট সে উল্লেখ না থাকার কারণ কি? কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ যে শুধুমাত্র কয়েকটি প্রচারপত্র বিতরণের মধ্যেই সীমিত ছিল না, তারা যে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল সে তথ্য সংগ্রহ করা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু এ গ্রন্থে কমিউনিস্ট পার্টির ঐ সকল মূর্ত কাজের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

লক্ষণীয় যে, তিন খণ্ডে রচিত প্রায় ১৩০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় খণ্ডের প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠার পরিসরে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা

আন্দোলনের ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে এবং ১ম খণ্ডের শেষাংশ, ২য়খণ্ডের সম্পূর্ণ অংশ ও ৩য় খণ্ডের প্রথমাংশ জুড়ে রয়েছে কমিউনিস্ট আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, প্রজাস্বত্ব, দাঙ্গা, কৃষক আন্দোলন, শিক্ষক ধর্মঘট, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতির বিবরণ। এ সব বিবরণ যে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক তা হয়ত নয়। কিন্তু এ সব বিবরণে সুসংবদ্ধতা বা ধারাবাহিকতা নেই এবং ভাষা আন্দোলনের সাথে সকল আন্দোলনের যোগসূত্রও স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নি। এতে একদিকে যেমন এসব বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে খাপছাড়াভাবে, তেমনি অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনের জন্য নির্ধারিত পৃষ্ঠা সংখ্যা গেছে কমে। ফলে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সুষ্ঠু ইতিহাস রচনার কাজটিও বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসটিও খর্বিত হয়ে পড়েছে।

এ কথা সত্য যে, বদরুদ্দীন উমরের উল্লিখিত গ্রন্থে ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ও তথ্য সংকলিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ভ্রান্ত গবেষণা পদ্ধতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে পক্ষপাতমূলক দৃষ্টি-ভঙ্গীর কারণে তাঁর লিখিত সকল বিষয়কে সমান আস্থার সাথে গ্রহণ করা যায় না। তিনি প্রধানত দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও একটি দৈনিক পত্রিকার উপর নির্ভর করেছেন (যথাক্রমে 'নওবেলাল' ও 'সৈনিক' এবং 'দৈনিক আজাদ,' অবশ্য ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' এবং 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা দুটিকেও কিয়দংশে ব্যবহার করা হয়েছে)। এ সব পত্রিকার সংবাদ ও অভিমতকে তিনি যাচাই করেছেন স্বতন্ত্র কোন উৎসের সাথে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলনা দ্বারা নয় বরং মূলত নিজস্ব মন্তব্য চিন্তা ও বিশ্লেষণ দ্বারা (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দ্রষ্টব্য ২য় খণ্ডের ৩৭১ পৃষ্ঠায় 'নওবেলালের' প্রতিবেদন সম্পর্কে)। বদরুদ্দীন উমর এমন সব গ্রন্থ ও জনশ্রুতিকে গ্রহণ করেছেন যাদের কোন-ক্রমেই প্রাথমিক উৎস বা নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, যেমন, প্রমথ গুপ্ত রচিত গ্রন্থ 'যে সংগ্রামের শেষ নেই' (২য় খণ্ড, পৃ ২৬৪-৬৮, ৪৩৪)।

বদরুদ্দীন উমর অল্পসংখ্যক ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। ভাষা আন্দোলনে এঁরা অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করলেও শুধু তাঁদের সাক্ষ্যের মধ্যে তুলনা করে সত্য নিরূপণ করা কঠিন কাজ। বদরুদ্দীন উমর যখন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তখন ভাষা আন্দোলনের অনেক সক্রিয় কর্মী জীবিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য সংগ্রহ না করায় তাঁর গবেষণা পদ্ধতিতে গুরুতর ত্রুটি রয়ে গেছে।

বদরুদ্দীন উমরের গবেষণা পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি হচ্ছে, তিনি যে কোন কারণেই হোক ভাষা আন্দোলনকে তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করেছেন। এ কথা সত্যি যে, তিনি তাঁর গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক ভিত্তির প্রতি আপাত-সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন (৩য় খণ্ড, পৃ ৪৮৬-৭)। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি ভাষা আন্দোলন যে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনেরই একটি ব্যাপক প্রকাশ এ সত্য প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই করেন নি (৩য় খণ্ড, পৃ ৪৯৫-৬)। সংস্কৃতিকে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করার এ ভ্রান্ত প্রচেষ্টা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছে। ভাষা আন্দোলনকে রাজনীতি-নিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম রূপে গণ্য করার যে প্রবণতা বর্তমানে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে, বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থের প্রভাব তার জন্য কিছু পরিমাণে হলেও দায়ী। বশীর আলহেলালের গ্রন্থে এ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বদরুদ্দীন উমরের গবেষণা পদ্ধতির আরও গুরুতর ত্রুটি এই যে, যে তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গীকে অবলম্বন করে কাজে অগ্রসর হবেন বলে তিনি দাবি করেন, কার্যক্ষেত্রে তথ্য নির্বাচন, বাছাই ও যাচাই করার সময় সে তত্ত্ব প্রয়োগ করেন না। ফলে কথিত তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক হলেও বাস্তবে তার কোন প্রয়োগই হয় না। সংগৃহীত তথ্যগুলো প্রায়শই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। যেমন, তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন: "এই খণ্ডে (দ্বিতীয় খণ্ডে) বাংলাদেশের কৃষক সমাজ ও গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতির উপর যে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন সারা দেশে যে ব্যাপকতা লাভ করেছিলো সেটা সম্ভব হতো না।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "পূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলন" শীর্ষক তৃতীয় পরিচ্ছেদে বদরুদ্দীন উমর সমগ্র বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন-বিষয়ে আলোচনা করেন নি, বরং প্রধানত নানকার-বিরোধী, টঙ্ক-বিরোধী ও নাচোল বিদ্রোহ নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। 'পূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলনের এলাকা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে (২য় খণ্ড, পৃ ১৯৩) তিনি লিখেছেন: "কৃষক সমিতি যে সমস্ত এলাকায় ১৯৪৮-৫০ সালে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালিত করেছিলো সেগুলি প্রধানত ছিলো আদিবাসী, নমশূদ্র ও সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা।" এ পরিচ্ছেদেই 'অন্যান্য অঞ্চলে

কৃষক আন্দোলন' শীর্ষক অনুচ্ছেদে (২য় খণ্ড, পৃ ২৯৮-৩০৪) তিনি খুলনা জেলার কয়েকটি অঞ্চল এবং যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকার কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে যৎসামান্য (অনধিক ৭ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করেছেন। সে তুলনায় তিনি নানকার, টঙ্ক ও নাচোল বিদ্রোহ বিষয়ে ১১৯ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। দীর্ঘ পরিসরে বিবৃত কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরের নিজেরই বক্তব্য হল: "চতুর্থতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির এই সশস্ত্র সংগ্রাম দেড়-দুই বৎসর কেবলমাত্র অমুসলমান-প্রধান এবং নমঃশূদ্র আদিবাসী অঞ্চলগুলিতেই হয়েছিলো। এর ফলে সরকার সমগ্র কৃষক আন্দোলনকে হিন্দুদের আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত...করতে সমর্থ হয়েছিলো। ...ষষ্ঠত, কতকগুলি এলাকাতে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে সারা দেশব্যাপী কৃষক সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলিকে ভিত্তি করে তাঁরা এমন কোন নির্দিষ্ট ধ্বনি ও কর্মসূচী কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণভাবে শোষিত জনগণের সামনে রাখতে পারেন নি যা তাঁদেরকে সংগ্রামের জন্যে উপযুক্তভাবে উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীবিত করতে পারে।" (২য় খণ্ড, পৃ ৩১৪)

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে; মূল গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বদরুদ্দীন উমর যে বিবরণ দিয়েছেন এবং তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে গভীর অসঙ্গতি রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি দাবি করেছেন যে, দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র বাংলাদেশের কৃষক সমাজ ও গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতির উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে এবং ভাষা আন্দোলনের উপর তার প্রভাব ছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তিনটি সীমিত অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে—যেসকল আন্দোলনকে তিনি নিজেই ব্যর্থ এবং প্রভাবহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে বিদ্যমান অসঙ্গতি ভাষা আন্দোলনের কারণ ও প্রকৃতি অনুধাবনের পক্ষে বিশেষরূপে প্রাসঙ্গিক বলে কোন অবস্থাতেই হাল্কাভাবে গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য এ ধরনের অসঙ্গতির কারণ কি সে-বিষয় বদরুদ্দীন উমরের একটি বিবৃতি কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "অন্যান্য নানা কাজে ব্যাপৃত থাকলেও বইটির কাজও তার সাথে অগ্রসর হতে থাকে এবং ছাপাও সেইভাবে চলে। এ জন্যে সব সময়ে প্রথম খসড়াই পর্যায়ক্রমে লেখার সাথে সাথে প্রেসে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যে ছাপাখানার

গণ্ডগোল ও হরেক রকম অসুবিধার জন্যে ছাপার কাজ বন্ধ থাকে এবং লেখাও সেই অনুসারে প্রায়ই স্থগিত থাকে।" (পৃ ৬)

বলা বাহুল্য, ভাষা আন্দোলনের মত গুরুতর বিষয়ে গবেষণা ও সন্দর্ভ রচনার এটি একটি বিপজ্জনক পদ্ধতি। সমগ্র তথ্য সংগ্রহ, আত্মস্থ ও বিশ্লেষণ করে তবেই কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং রচনার কাজে হাত দেয়া উচিত। অন্যথায়, যখন যে তথ্য হাতে এল, যখন যে চিন্তার উদয় হল, তাকেই বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত করলে, যে কোন সুদীর্ঘ রচনায় পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করাতো কঠিন হবেই, বাস্তবের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করাও হবে অসম্ভব।

বদরুদ্দীন উমর আরো লিখেছেন: "এ ছাড়া ঢাকার বাইরে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের বিস্তার যেভাবে ঘটেছিল তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে ১৯৫২ সালে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে এই আন্দোলনের একটা গভীর ঐক্যসূত্র ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিলো। এবং এই ঐক্যের সূত্র ধরেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পরিগ্রহ করেছিলো এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপকতা।" (৩য় খণ্ড, পৃ ৪৮৬-৭)

লক্ষ্য করার বিষয়, ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতার যে কয়েকটি সাধারণ কারণ বদরুদ্দীন উমর অনুমান করেছেন, সে অনুমান-গুলোকেই তিনি 'প্রমাণিত' রূপে গণ্য করছেন। এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক। সমাজতাত্ত্বিক জরিপ, ঐতিহাসিক গবেষণা ও পূর্বাপর বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের কারণগুলো উদঘাটন করবেন, গবেষকদের কাছে এটাই প্রত্যাশা। তার পরিবর্তে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতা অবলোকন করে তার কতগুলো আনুমানিক কারণকেই প্রমাণিত রূপে গণ্য করার পদ্ধতি যদি একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে এর ইতিহাস রচনা তো পরের কথা, তরুণ ও শিক্ষার্থী গবেষকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই কোনদিন আয়ত্ত করতে পারবেন না।

মনগড়া ও অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন তত্ত্ব দ্বারা বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন: "ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের সাধারণ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সম্পর্ক খুব গভীর ছিল না এ কথা সত্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোটি কোটি কৃষক ও

শ্রমিকসহ মেহনতী জনগণের জীবনে ভাষা-নির্যাতনের নিজস্ব কোন তাৎপর্য ছিল না। তা অবশ্যই ছিল। কারণ ভাষা-নির্যাতন সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের লোকদের শিক্ষাদীক্ষাকে, এমনকি তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে যতখানি বিপর্যস্ত করে তার থেকে অনেক বেশী বিপর্যস্ত করে নিম্নতর শ্রেণীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে। এই শেষোক্তদের জীবনে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এমনিতেই খুব সঙ্কুচিত। তার উপর তাদের নিজেদের মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য একটি ভাষা যদি তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষার সুযোগ হয়ে পড়ে আরো বেশি সঙ্কুচিত। এ কারণে ভাষা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যে শুধু উচ্চ শ্রেণীর এবং উচ্চ স্তরের মানুষরাই করে থাকেন, তা নয়।" (৩য় খণ্ড পৃ ৪৯৫-৬)

সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে, এ সকল ভ্রান্ত তত্ত্ব তাঁকে পছন্দ-মতো তথ্য সংগ্রহেও প্ররোচিত করেছে। এ রকম ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে রূপকথায় পর্যবসিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ভাষা আন্দোলনের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বদরুদ্দীন উমরের উল্লি-খিত গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশের সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, ঐ গ্রন্থটি মূল্যহীন। বস্তুত ঐ গ্রন্থে বহু দলিল, আইন সভার কার্যবিবরণী প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে যা ভবিষ্যতের গবেষকদের সহায়ক হবে। তদুপরি, এ গ্রন্থ রচনার সূত্রে আহৃত প্রচুর দলিলপত্র পৃথকভাবে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। এসকল পরিশ্রমসাধ্য কাজ সম্পাদনের জন্য বদরুদ্দীন উমর অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু, ভ্রান্ত গবেষণা পদ্ধতি এবং পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দরুন তাঁর গ্রন্থটিতে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত রূপটি প্রতিফলিত হয় নি। আমরা তাই মনে করি, ভাষা আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ইতিহাসরচনার কাজ অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন।

আবদুল হালিম

কবি একজন ক্ষতিকর ব্যক্তি

কবি, আমরা যে-ভাষায় কথা বলি, সে-ভাষায়ই কথা বলেন, কিন্তু তার অর্থ করেন ভিন্ন। আমরা যে-অর্থ করি সে-অর্থ তিনি করেন না, আমরা সাধারণ মানুষ, এমনকি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকও যে বাক্য-সূত্র ব্যবহার করেন, তা তিনি করেন না। তিনি ব্যাকরণ মানেন না, তবে ঐ শব্দের মূল অর্থকে বর্জন করেন না, যেমন 'কাক' শব্দ দিয়ে তিনি কালো পোশাক পরিহিত পুরোহিতকে বোঝাতে পারেন, কিন্তু শব্দটির মূল অর্থকে অস্বীকার না-করে। অর্থাৎ যাকেই প্রতিবিম্বিত করেন 'কাক' শব্দের মাধ্যমে, কাকের চারিত্রিক, দৈহিক গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য তার ভেতরে প্রবিষ্ট করেই করেন। কিন্তু ঐ প্রতিনিধিকে বুঝতে কষ্ট হয় আমাদের, কোন্ ধারণার প্রতিনিধিত্ব করাবেন তিনি 'কাক' শব্দ দিয়ে, তা আমাদের ভাষাজ্ঞানের অন্তর্গত নয় বলে।

তাই ভাষা ছেড়ে যেতে হয় concept-এর জগতে, অর্থাৎ যেখানে সকল ভাষার ব্যাকরণ এক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে Universal Grammar, যার কথা চমস্কি বলেছেন—তা যে আছে তা অস্বীকার করার উপায় থাকে না। আর চমস্কির Transformational Grammar-এর কাঠামোতে কবির ভাষা, ঔপন্যাসিকের ভাষা, নাট্যকারের ভাষার বিশ্লেষণ করা যায়। কেননা চমস্কির ব্যাকরণ একটি গভীর কাঠামোর (deep structure) কথা বলে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্যেরই একটি গভীর কাঠামো (deep structure) আছে ওপরকাঠামো (surface structure) ছাড়াও। তা'হলে ব্যাকরণ শুধু বাক্য উৎপাদনেই সৃষ্টিশীল নয়, সৃষ্টিশীল সে বিশেষ অর্থ উৎপাদনেও।

এই নতুন ব্যাকরণ আবিষ্কার করে চমস্কি কবিকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন অনেকখানি, বলতে পারি উদ্ধার করেছেন ডুবন্ত কবিকে। ভাষার মধ্যে তিনি ডুবে যান, সাঁতরাতে পারেন না দক্ষ সাঁতারুর মত। যেহেতু জানেন না সূত্র রক্ষা করে কবিতায় পাড়ি দেয়া। কিন্তু কেন ডোবেন, কেন মানেন না কবি ব্যাকরণ, যিনি ভাষা ব্যবহার করার জন্যে নানাভাবে সাধ্য-সাধনা করেন, সপ্ত-আকাশ বিচরণ করেন একটি শব্দের জন্যে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নাকি 'উডডীন' শব্দটির ধরা পেয়েছিলেন Holy Grail-এর

মত এক দীর্ঘ কঠিন ভ্রমণের পর। কবি তো চিন্তা করেন সর্বক্ষণ কেমন ক'রে প্রকাশ করবেন তাঁর ধারণাকে, প্রত্যক্ষণকে, সর্বোৎকৃষ্টভাবে। কেন তবে মানেন না ব্যাকরণ? মানেন না এ কারণে যে, তাঁর ধারণাগুলো যথাযথ বিন্যস্ত করতে হয়, শুধু শব্দকে নয়, যথাযথ ব্যাকরণের মত। তিনি শব্দকে সাজান ধারণাকে শক্তিশালী করার জন্যে, সংঘবদ্ধ করার জন্যে, নিছক বাক্য তৈরির জন্যে নয়। কিন্তু কেউ-ই তো নিছক বাক্য তৈরি করেন না, একটা ধারণা সবাই-ই প্রকাশ করেন। যিনি পেঁয়াজ বিক্রি করেন তিনিও সুষ্ঠুভাবেই তাঁর ধারণাকে প্রকাশ করেন। না হলে তো খদ্দেরের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বাধার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাজার-ঘাটে কবি থাকবেন না, হিসেবের জগৎ তাঁর অপছন্দ, বড় অসহ্য। সে কারণেই তিনি ধাবিত হন বাক্যের ঊর্ধ্বে। ফলে তিনি পাশাপাশি অনেক বিশেষ্য বাক্যাংশে ব্যবহার ক'রে যান যা ব্যাকরণ অনুমতি দেয় না তাঁকে করতে, কিন্তু তাই তো তিনি করেন। তিনি ক্রিয়াপদ বসিয়ে যান পর পর অসংখ্য, মানেন না ব্যাকরণ, কেননা ভাষায় যে ধারণাটি প্রকাশের জন্যে তিনি অতগুলো ক্রিয়াপদ এক জায়গায় জড়ো করেন, তা একটি শক্তিশালী ক্রিয়াপদের অনুপস্থিতির কারণে।

তাহলে কি আমরা বলবো কবি পৃথিবীকে বিকৃতভাবে প্রত্যক্ষ করেন, যার জন্যে ভাষা তৈরি করতে হয়, যা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিককে করতে হয় না? করেন বৈকি। পৃথিবীর দিকে তাকাবার সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের সম্পর্ক অতি গভীর, যেমনভাবে দেখব তেমনটিই তো হবে ভাষা। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সবকিছু বিশ্লেষণ করেন, বিশ্লেষণ করেই তাকে বোঝাতে হয়। ফলে তিনি একটি concept-এর জন্যে একটি যথার্থ শব্দও আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু কবি তা পারেন না। তাহলে কবি কি পৃথিবীকে বিকৃতভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন? করলে নিশ্চয়ই কবি ক্ষতিকর ব্যক্তি—সমাজের জন্য, মানুষের জন্য।

এদিক থেকে কবি যে ক্ষতিকর ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ থাকে না, কেননা কবি দু'টি কাজে ব্যর্থ হন: এক, কবি জগৎকে আর পাঁচজনের মত দেখতে অপারগ, সত্যকে নিশ্চিত করে বলতে পারেন না, ফলে কোন ভাষাই তাঁর কাছে যথেষ্ট নয়, যে কারণে তিনি শব্দের ওপর নিজস্ব অর্থ আরোপ করেন, নিজস্ব কাঠামো রচনা করেন বাক্যের। দুই, তিনি আমাদের মত, এমনকি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মত ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না। অর্থাৎ দু'টি ক্ষতি তিনি করেন,—যেমন তিনি ভাষাকে যথাযথ ব্যবহার করতে অপারগ, তেমনি পৃথিবীকেও তিনি যথার্থরূপে

দেখতে অপারগ। কবির অক্ষমতা এখানেই যে তিনি স্পষ্ট ক'রে কিছু বলতে পারেন না, ফলে verb to be থাকে না তাঁর বাক্যে, থাকেনা ব্যাকরণের অনেক কিছু। তিনি ভাষার মূল ধারা থেকে সরে যান, যেহেতু পৃথিবীর বাস্তব ধারণা থেকে সরে যান। এভাবে তিনি আমাদের চিন্তাকেও বিকৃত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন কি? মানুষ ব্যাকরণের ভাষাতেই কথা বলে, কবির ভাষায় নয়। ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক সূত্র নিয়ে গঠিত, তাই বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের সূত্রকে ব্যবহার করতে পারেন সহজেই, আর ব্যাকরণের ভাষায় তাঁর প্রত্যক্ষণ, তাঁর ধারণা, তাঁর বিশ্লেষণ প্রকাশ করতে সুবিধা হয়। ব্যাকরণ নিজে বিজ্ঞান বলে বৈজ্ঞানিকের ঐ সুবিধাটুকু করে দেয়। নইলে পৃথিবীর কত বড় সর্বনাশ যে হয়ে যেত তা বোধ হয় কবির পক্ষে বোঝা কঠিন। ব্যাকরণের ভাষাই বৈজ্ঞানিকের প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়। তিনি শৃঙ্খলার বাইরে যেতে পারেন না, যাবেন না। ফলে ব্যাকরণ লঙ্ঘিত হয় না। পারেন না তিনি ব্যাকরণ লঙ্ঘন করতে, কেননা তাকে দেখতে হয় সুনির্দিষ্টভাবে, স্পষ্টভাবে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় অস্পষ্টতা থাকলে চলে না।

কিন্তু কবি জড়িয়ে ফেলেন একটির সঙ্গে আরেকটিকে। একটির মধ্যে দেখেন অচিন্ত্যনীয় আরেকটিকে। 'কাক'কে কালো-পোশাক পরিহিত পুরোহিতরূপে দেখেন, যিনি দাঁড়িয়ে আছেন কফিনের সামনে। ভাষাকে কবি বেশি নাড়াচাড়া করেন, কিন্তু তবু তাঁর ট্রাজেডি, তিনি তাঁর ধারণাকে স্পষ্ট ক'রে বলতে পারেন না তারপরও। দুঃখ, সুখ, বেদনা—কোন ধারণাকেই কবি সুস্পষ্ট ক'রে তুলতে পারেন না, কিন্তু চেষ্টা করেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি অনুষঙ্গের ব্যবহার করেন, কিন্তু তারপরও স্পষ্ট হয় না তাঁর কথা। প্রকারান্তরে তিনি ক্ষতি করে বসেন সমাজের, মানুষের। কারণ তিনি একটি ধারণা দিতে চান মানুষকে, কোন বিষয় সম্পর্কে, কিন্তু ব্যর্থ হন অস্পষ্টতার কারণে। অনেক হয় তার ব্যাখ্যা, তার কারণে অনেক অনেক হয় তার অর্থ। অর্থাৎ কবি মূলতই ব্যর্থ দ্রষ্টা। তিনি দেখতে পান না স্পষ্ট করে, পান না বলেই বলতেও পারেন না স্পষ্ট করে। এই ব্যর্থতার কারণে, অস্পষ্টতার কারণে, সুনির্দিষ্টতার অভাবের কারণে সাধারণ মানুষ কবিতা পড়তে আগ্রহ বোধ করে কম। কারণ তার ব্যাকরণের সঙ্গে কবির ব্যাকরণের কোন মিল নেই। পাঠককে তিনি ফেলেন ফ্যাসাদে। তাকে তৈরি করতে হয় কবির ব্যাকরণ, যা কারো পক্ষেই, কি সাধারণ পাঠক, কি সমালোচক, সহজসাধ্য

নয়। তাঁর স্পষ্ট semantic বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে হয়—সেটা সাধারণ পাঠক ন্যায়ত মনে করেন না। সেজন্যে যত বেশি খবরের কাগজ মানুষ পড়ে তত বেশি বই পড়ে না, কবিতা আরো কম। খবরের কাগজ নতুন ব্যাকরণ উপস্থিত করে না পাঠকের সামনে, শব্দের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিগত অর্থও প্রদান করেনা। ফলে পাঠক গ্রহণ করে তাড়াতাড়ি, কবি দারোয়ান বন্দুক হাতে ভাষার দরজায় ভীষণ-মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে নেই সেখানে। আর সবচেয়ে বড় কারণ সে পৃথিবীকে, জীবনকে—কোন বিষয়কে বিকৃত করে না, করলে সমাদৃত হয় না। কিন্তু কবি করেন। এভাবে তিনি সংস্কৃতিরও ক্ষতি করেন। পৃথিবী সম্পর্কে তিনি ভুল ধারণা দেন। তিনি তো নির্দিষ্ট করে, স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেন না, তিনি যা বলেন তা সমাজকে পরিচালিত করতে, জীবনকে একটি কাঠামোর মধ্যে আনতে সাহায্য করে না। বরং তার কবিতাই হয়ে যায় জীবন, সমাজ—সবকিছু। একটা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় ধারণায়, চিন্তায়—সর্বত্র। খুব সম্ভব কবি anarchy-তে বিশ্বাস করেন, যেখানে সবকিছুই উচ্ছৃঙ্খল, গণ্ডগোল, কোনকিছুই বিধি-সম্মত নয়, নয় সুনির্দিষ্ট। নইলে ঐ ভাষা কেন ব্যবহার করবেন তিনি? 'Did' ক্রিয়াপদকে Noun হিসেবে কেন ব্যবহার করবেন—('he sang his didn't, he danced his did'/'he danced his did'=all his past activity was like a dance)?

তাহলে কবিকে কি আমরা বর্জন করব? দেখতে হবে কবি কতখানি আমাদের সমাজের মানুষ। এক অর্থে তিনি মোটেও এই সমাজের নন। কেননা, যে-সমাজে তিনি বাস করেন তার কোনকিছুই তিনি মানেন না, অন্তত কবিতায়। কিন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবন তো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ নয় একারণে যে তিনি প্রেরিত পুরুষ নন। প্রেরিত পুরুষের ব্যক্তিগত জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর ধর্মকে আগে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেন, তারপর প্রচার করেন বা যতটুকু বাস্তবায়িত করেন বা যেভাবে বাস্তবায়িত করেন ততটুকুই এবং সেভাবেই তা প্রচার করেন, প্রকাশ করেন, অন্তত চেষ্টা করেন।

কিন্তু কবি বলেন, করেন না। ফলে কবি-জীবনে দু' রকমের বিকৃতি বা অতিশায়ন দেখা যায়। এক, তাঁর ধারণায় ও ভাষায়। দুই, তাঁর আচরণে। কবিতা যেদিকে অগ্রসর হয় তাঁর আচরণ নেতিবাচক অর্থেই কেবল সেদিকে অগ্রসর হয়। সদর্থকভাবে হয় না। অর্থাৎ তিনি উল্টো দিকেই অগ্রসর হন। ফলে আমরা কবিকে অনুসরণ করিনা, করতে পারি না, কিন্তু প্রেরিতপুরুষকে

করি। বৈজ্ঞানিকের মত প্রেরিত পুরুষও স্পষ্ট ক'রে বলেন তাঁর কথা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে থাকেন প্রেরিত পুরুষ। সেটা হ'ল তিনি আচরণে প্রকাশ করেন যা তিনি বলেন। প্রেরিত পুরুষ জগতের সুনির্দিষ্ট একটিমাত্র ব্যাখ্যা দেন, তা ভ্রান্ত কিনা—ঐ কাঠামোর মধ্যে তা বিবেচ্য নয়। ফলে উপমা, রূপক-শব্দ অনেক কিছু ব্যবহার করলেও তিনি ব্যাকরণকে মান্য করেন। করেন এ কারণে যে তিনি সাধারণ মানুষের জন্যে, সব মানুষের জন্যে বলেন। ফলে সেটা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার প্রতি তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, গুরুত্ব দেন সুনির্দিষ্টতার প্রতি। অস্পষ্টতার কোন স্থান নেই ধর্মে, যেমন নেই বিজ্ঞানে ও দর্শনে।

এজন্যে কবি কোন জীবন-ধারা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন না। কেননা তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা জানিনা। কবির ভাষায় ব্যাকরণ না থাকার আরেকটি কারণ তিনি সহজে বিচলিত হন, ফলে সব সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় তাঁর চিন্তায়। তাই ভাষাকে তিনি ব্যাকরণের মধ্যে ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। কবি মূলত কোন তত্ত্বও দেন না। তিনি পারেন না তত্ত্ব দিতে। তত্ত্ব দিতে হলে সুনির্দিষ্ট একটি কাঠামো নির্মাণ করতে হয়। কবি তা পারেন না। তিনি একটাকিছু তৈরি করতে গিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলেন সমগ্র জিনিসটাকে। সে কারণে কবির ওপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারিনা। তাঁর কোন কিছুই আমাদের নিকটবর্তী নয়, যদিও তিনি বলতে চান অতি নিকটবর্তী। তাঁর ভাষা নয়, তাঁর চিন্তা নয়, তাঁর আচরণও নয় সে কারণে। এ কারণে তিনি সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষই। কবিকে যদি কাছে আসতে হয় মানুষের তবে তাঁকে হওয়া উচিত আরো স্পষ্ট, তাঁর ভাষা হওয়া উচিত অত্যন্ত সুবোধ্য, তাঁর আচরণ হওয়া উচিত আদর্শ। ঐ স্পষ্টতা নয়, যার কথা উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র : "গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, চেঁচাইলে হয় না।" আবার আচরণে কমলাকান্ত হলেও না। যে স্পষ্টতার দাবি ভাষায়, যে স্পষ্টতার দাবি ধারণায়, চিন্তার প্যাটার্নে তা যদি মেটাতে না পারেন কবি, তবে তিনি যে একান্ত মিথ্যাচারী, বিভ্রান্তিসৃষ্টিকর শক্তি—এতে কোন সন্দেহ থাকে না। তিনি যদি আমাদের ভাষা না মানেন, আমাদের ব্যাকরণ না মানেন (কেননা ব্যাকরণের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ, যোগ চিন্তার প্রত্যক্ষ) তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কেউ নন, বরং ক্ষতিকর বহিঃশক্তি।

কবি ভাষা ব্যবহারে সংযত নন বলে তাঁর ভাষা কিছুটা উন। তারল্য বেশি সেখানে। কিন্তু অন্যদের ভাষায় সেই তারল্য নেই, নেই হেঁয়ালি।

কবি ছাড়া আর যাঁরা মানবজাতির সেবক, কল্যাণে ব্রতী, তাঁরা সুনির্দিষ্টতার ওপর জোর দেন। সুনির্দিষ্টতাই তাঁদের লক্ষ্য। সামান্যতম অস্পষ্টতাকেও ঘুচিয়ে স্পষ্টতায় নিয়ে আসতে প্রাণপণ সচেষ্ট। স্পষ্টতা ব্যতীত মানবজাতির মঙ্গল যে অসম্ভব সে-বিষয়ে কবি খুব সচেতন নন। তাঁর যাত্রা উল্টো দিকে। অন্ধকারের দিকে। যেমন রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের তত্ত্ব গ্রহণ করে বলেন, তমসার ওপারেই আছে সে মহাপুরুষ। অর্থাৎ আলো। কিন্তু সেই আলোর চারপাশে তিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেন, আমরা হোঁচট খাই, আমরা জখম হই—কবির তাতে কি আসে যায়! আবার অন্ধকারের চারপাশেও সৃষ্টি করেন আরো অন্ধকার। কবি বাজে কথাই বেশি বলেন। আবার সেই বাজে কথাকেই আবার মহিমান্বিত করেন, যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, বলেছেন, 'বাজে কথাই কাজের কথা' ('বাজে কথা' প্রবন্ধ)। বলেছেন, বাজে কথায়ই আত্মপরিচয় ঘটে, কিন্তু যে আত্মপরিচয় ঘটে তা কেবল ব্যক্তির বাজে কথার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অতএব ব্যক্তির যে সেটা আসল পরিচয় নয় তা রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেননি। আর বাজে কথাকেই তিনি সাহিত্য বলেছেন। যা কিছু কাজের কথা তার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই, শুধু আছে বাজে কথার। সে কারণেই তিনি 'অকারণ অশ্রুজলের' মূল্য বেশি দিয়েছেন, সমর্থন সংগ্রহ করেছেন Tennyson-এর দ্বারস্থ হয়ে। Tennyson-এর idle tears ঐ 'অকারণ অশ্রুজল'। সত্যিকার অশ্রুজল তাই সাহিত্যে গৌণ থেকে যায় (কবি ভয় পান বুঝি সত্যিকার অশ্রুজলকে), অসংজ্ঞায়িত থেকে যায়। ফলে অশ্রুজলে দেশ শুধু বার বার ভেসেই যায়, ফসল ফলাবার মাঠ সেখানে পাওয়া যায় না। কবি এ উপকারটুকু আমাদের করেন। কবি আমাদের ভাই। বিভীষণ না হলে এ উপকার কে করবে? কিন্তু যেখানে সত্যের চেয়ে মিথ্যার মূল্য বেশি, কাজের কথার চেয়ে বাজে কথার মূল্য বেশি, সেখানে পৃথিবী যে সুস্থ নয়, স্বাস্থ্যকর নয় যে সে পৃথিবী বসবাসের জন্যে, তা আমরা বুঝতে পারি যখন কবির হাতে হাত-কড়া পড়ে তাঁর কাব্যে, ধরা পড়ে যান তাঁর ভাষার অন্ধকার চোরাগলিতে।

কবির মধ্যে স্ব-বিরোধ প্রবল। সে স্ব-বিরোধ সম্পর্কেও তিনি সচেতন নন বোধ হয়। তিনি ব্যাকরণের আইন মানেন না, ব্যাকরণের আইন মেনে কবিতা লিখতে তাঁর কষ্ট হয়; কিন্তু ছন্দের আইন লঙ্ঘন করতে অপারগ, ভীতও। ছন্দের জটিল, কট্টর আইন তিনি মানেন, যত কষ্টই তাঁর হোক,

কিন্তু ব্যাকরণের আইন-মানবেন না। কারণ কি এই যে, একটির আইন সাধারণের, সমষ্টির, আরেকটির আইন ব্যষ্টির, ব্যষ্টিকে তিনি ভয় পান, সমষ্টিকে থোড়াই কেয়ার করেন। পুঁজিবাদ তো আছে কবিরও পায়ের নীচে। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি লেখেন কবিতা। ফলে তাঁর ঐ পণ্যের প্রচারের জন্যে শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়, সমালোচক ম্যানেজারের দরকার হয়, যিনি paraphrase করবেন, ব্যাখ্যা করবেন সাধারণের ব্যাকরণে। কবি উন্নাসিক, অভিজাততন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই তিনি নিজের কিছুই নিজে পাল্টান না। অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেন। তবু ব্যর্থ তো কবি ঐখানে। সাধারণের ভাষায়, ব্যাকরণের দ্বারস্থ তাকে হতে হয়, শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্পষ্ট ক'রে বোঝাবার জন্যে। যেন বলেন, "আমি যা পারলাম না, তোমরা তাই করো।" সেকারণে কবির দায় সম্পর্কে সমাজ বিশেষ জ্ঞাত নয়। বিভিন্ন কবির ভাষার জন্যে বিভিন্ন ব্যাকরণ তৈরি করতে হয় পাঠককে, সমালোচককে। হাজার কবির জন্যে হাজার ব্যাকরণ। কিন্তু তিনি কি পারেন না কোটি মানুষের ব্যাকরণকেই (একটিমাত্র ব্যাকরণকেই) সুদক্ষভাবে, সুযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে? তাহলে তিনি যা করতে চান, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের, সব মানুষের উপকার করতে, তা তিনি হয়তো সফলভাবে পারতেন। আবু সাঈদ আইয়ুব 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' গ্রন্থের এক জায়গায় আধুনিক কবিদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'ওঁরা শব্দ নিয়ে খেলা করেন।' অর্থাৎ serious কিছু করেন না। তা বোধ হয় সত্য নয়। তবে ভাষা নিয়ে যে তাঁরা খেলা করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দূরে থাকতে চান সাধারণ থেকে, ম্লেচ্ছদের থেকে। সনেটের নানারকম আইন-কানুন মেনে ছোট খোপের মধ্যে চলে যেতেও তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু খোলা ময়দানে আসবেন না, আসতে তিনি ভীত। আভিজাত্য নষ্ট হয়—একারণেও। চলে যান লোকালয় থেকে আরো দূরে।

এভাবে ভাষায়, ব্যাকরণে, আচরণে, আবাসে দূরে থেকে মানুষের যে আপন হওয়া যায় না তা বিশ্বের কবিকুল কি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখবেন? কবিকে কি গভীর কথা স্পষ্ট করে বলার কথা ছিলনা আমাদের? কবির সঙ্গে কি সমাজের কোন বৈধ চুক্তি ছিল সমষ্টির ভাষা ত্যাগ করে তার নিজের ভাষা চাপিয়ে দেয়া? নাকি কবি ভয় পান ভগবানের মত স্পষ্ট হলে সব ফাঁস হয়ে যাবে? কিন্তু অস্পষ্ট, ভ্রান্ত ভাষা থেকে কোন্ আশ্বাস আসবে অভ্রান্তের, স্পষ্টের।

শহিদুজ্জামান

১

সত্যের মুখোমুখি

['সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা', যতীন সরকার। মুক্তধারা, ঢাকা। মূল্য সাদা ৫০·০০, লেখক কাগজ ৩৫·০০।]

বাংলাদেশে মার্কসীয় পদ্ধতিতে যে কজন গবেষক নানাকিছুর আলোচনা-সমালোচনায় কার্যরত তাঁদের ভেতর যতীন সরকার অন্যতম। একজন শ্রমিকের মতই তাঁর রচনারীতিতে রয়েছে হাতুরি শাবলের নিনাদ, বক্তব্যে আপসহীন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রত্যয় এবং ভাষায় শাণিত কোদালের আঘাতে কেটে কেটে অগ্রসর হওয়ার ব্যঞ্জনা। সুসংস্কৃতিবানের (?) কাছে খুব উপাদেয় এসব নয় এজন্যই যে শ্রমজীবীরা অবশ্যই অনেক বেশি অকপট খোলামেলা রাখঢাকহীন সহজ সরল। কিন্তু এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে যে সত্য তা এতই তীব্র ও উজ্জ্বল যে তাতে চমকিত হতে হয়। সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না।

এমনি কিছু সত্যের মুখোমুখি করেন যতীন সরকার 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা'য়। যেমন, 'ইকবাল আমাদের' প্রবন্ধে। একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কবি হাতুড়ে-রাজনীতিবিদদের হাতে পড়ে কেমন খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হতে পারেন, ইকবাল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে যাঁকে একদা আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে তাঁর অভিমত কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে এরূপ: 'কোনরূপ জাতিগত বা ধর্মগত সংস্কারের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আমি ইসলামী সমাজকে আমার যাত্রাবিন্দু বলে বেছে নিই নি, নিয়েছি এ কারণে যে এটিই সমস্যা মোকাবেলার সবচেয়ে কার্যকর পথ' (প্রবন্ধে যতীন সরকারের উদ্ধৃতি)। যতীন সরকার এ বিষয়ে সত্য তুলে ধরেন এভাবে: 'সমস্যা মোকাবেলার একটি কার্যকর পথ হিসাবে ইকবালের দ্বারা যেমন ইসলামী ঐতিহ্য নির্বাচিত, অন্য কোনো কবির দ্বারা তেমনি নির্বাচিত হতে পারে অন্য কোন ঐতিহ্য বা দর্শন; যেমন রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন সাধারণভাবে 'হিন্দু দর্শন' ও 'হিন্দু ঐতিহ্য' নামে যা পরিচিত সেই ঔপনিষদিক তথা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য। তাই বলে রবীন্দ্রনাথের জন্যে 'হিন্দুর কবি' আখ্যা যেরূপ বিচারসহ নয়, সেরূপই নয় ইকবালের প্রতি প্রদত্ত 'মুসলমানের কবি' অভিধা।'

এমনি খণ্ডিত বিচার হচ্ছে আজো নজরুলের ব্যাপারেও। তাঁকেও কেবল মুসলমানদের কবি হিসাবে তথাকথিত ইসলামবাদীরা দেখতে আগ্রহী। অথচ নজরুলই ইব্রাহীম খাঁকে বলেছেন: 'আপনার 'মুসলিম ঐতিহ্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলেছেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য না মুসলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য। যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় তবে তা সকল জাতিরই হবে।' (যতীন সরকারের উদ্ধৃতি 'তাঁর রচিত নীল আকাশে' প্রবন্ধে)

এ ধরনের সাম্প্রদায়িক বিভেদাত্মক দৃষ্টিতে বিচার যেমনি একটি সমস্যা তেমনি শ্রেণীতত্ত্ব দিয়ে বিচার করতে গিয়েও ভিন্ন এক ধরনের চোরাবালিতে অনেকেই পা দেন। যেমন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একদা প্রগতিবাদীদের প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা। যতীন সরকারের তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য 'অশেষের সন্ধানী রূপে অবলোকনই হবে হিরন্ময় পথ' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

রবীন্দ্র-অনুরাগী প্রজেশ কুমার কিন্তু সরকারের বিচারে 'স্বভাব কবি' ও আধুনিকতার 'সহজিয়া' পথের পথিক। তাঁর প্রসঙ্গে যতীন সরকার বলেন: 'রবীন্দ্র প্রসারী যে আধুনিকতা নিয়ে প্রজেশ কুমার কাব্যাঙ্গনে প্রবিষ্ট, তাকে একটি বিশেষ অনুসরণীয় ধারায় পরিণত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে মূল্যবোধ নিয়ে তাঁর যাত্রা, সে মূল্যবোধকে একটি সংকীর্ণ সীমায় লালন করেই তাঁর যাত্রাবসান।' তবু সরকার যে এই বিস্মৃতপ্রায় ও সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য খঞ্জরে নিহত কবিকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে 'একজন নিহত ও বিস্মৃত কবি' প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে টেনে এনেছেন তাঁর জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিতে যতীন সরকার শরৎচন্দ্রকে দেখেছেন 'কথক শরৎচন্দ্র: তাঁর কথাসরিৎসাগর' প্রবন্ধে। তাঁর ভাষায়: 'শরৎ-মানসের লৌকিক ভিত্তিটাকে অনুধাবন ও অনুমোদন করতে না পারার জন্যই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজ শরৎ সাহিত্যের প্রতি বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা দেখিয়েছে, সাহিত্যের তথাকথিত স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদে নানা হাস্যকর মন্তব্য ও আচরণ করেছে। আবার এ-কালের আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও বিদগ্ধ সমালোচক শরৎ চন্দ্রের রক্ষণশীলতায় ব্যথিত হয়েছেন।' তাই সরকার শরৎচন্দ্রকে বিচার করেন এভাবে: 'আবহমানকালের লোকমানসে অন্তর্লীন যে বিপ্লব চেতনা, শরৎচন্দ্রের সমগ্র সত্তায় ছিল তা অঙ্গীকৃত।'

'কবিতায় আর্কেডিয়া সন্ধান' করতে গিয়ে যতীন সরকার রফিক আজাদ (এবং তাঁর মতো আরো অনেক)-কে বলেছেন যে, 'রিরংসার জান্তব ভুবনে,

পরাবাস্তবের ভুতুড়ে জঙ্গলে, নৈরাশ্যের ধু ধু মাঠে কিংবা উদ্দেশ্যহীনতার কানাগলিতে ঘোরায় কোন সার্থকতা নেই,' 'সার্থকতা বরং জনতার আসল শত্রুকে নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে চিহ্নিত করা, তাতে যুক্তিগ্রাহ্য আবেগ-গ্রথিত করা, গণ-অভীপ্সার উপযোগী উপমা-প্রতীক-চিত্রকল্প সংযোজন করে কবিতার দেহকে একই সঙ্গে পেশল, দৃঢ় ও সাফল্যমণ্ডিত করা।' কারণ 'অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতা যাই কবিতার মূল হোক না কেন, এ-দুয়েরই মূল নিহিত মানবিক বাস্তবের মধ্যে। সে মানবিক বাস্তব প্রাকৃতিক বাস্তবকে ভিত্তি করেও তাকে বদলাবার মানবিক প্রয়াস থেকেই গড়ে ওঠে। সে প্রয়াসেরই নাম শ্রম। সে শ্রমই উৎস সকল মানবিক কৃতির—সংস্কৃতি আর কবি-কৃতিরও।'

আমাদের দেশের অনেক কীর্তিমান নিজেকে শ্রম-সংলগ্ন ভাবতে ঘৃণা-বোধ করলেও সেনেগালের লিওপোল্ড সেংঘর, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, মোজাম্বিকের মার্সেলিনো ডস সান্টোস, গিনির আহমদ সেকুতুরে, গিনি বিসাউয়ের এমিলকার কাব্রাল, এঙ্গোলার অগাস্টিনো নেটো কিন্তু বরং মৃত্তিকা-সংলগ্ন হতেই বেশি ইচ্ছুক। 'আফ্রিকার কবিতা' পাঠোত্তর ভাবনা : বাংলার কবির কাছে প্রত্যাশা' প্রবন্ধে যতীন সরকার সেংঘর প্রসঙ্গে বলেন : 'ফরাসী ভাষা, সভ্যতা ও শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত থেকেও, বোদ-লেয়ারের কাব্য সম্পর্কে গবেষণা নিবন্ধ রচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করেও, সেংঘর কিন্তু ফরাসী তথা আধুনিক পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ী চৈতন্যে আক্রান্ত হন না, বোদলেয়ারী জগতের বিবরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন না। বোদলেয়ারীয় সর্বগ্রাসী অমঙ্গল ভাবনার বিপরীতেই অবস্থান নেন কবি সেংঘর। ফরাসী দেশের প্রবাস জীবনে বোদলেয়ারসহ প্রধান প্রধান ফরাসী কবিদের কাব্যপ্রবাহে অবগাহন করে অবশ্যই কাব্যের মর্মবস্তু বা নির্মাণকলা সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেন তিনি, কিন্তু সে-পাঠ তার 'আফ্রিকীয়তা' বা 'নিগ্রোতা'কে ভুলিয়ে দিতে পারে না।' যতীন সরকার অবলোকন করেন, 'আপন ঘরের খবর জানলে—অর্থাৎ লোকসমাজের কৃতির আসল পরিচয় নিলে,—দেখা যাবে যে : লোকসমাজের চৈতন্য মোটেই বদ্ধ জলাশয়-সদৃশ সংকীর্ণ নয়...সব দেশের লোকসমাজের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ-প্রকরণেই আন্তর্জাতিকতা বিধৃত।...সব দেশের লোকশিল্প ও লোক-সংস্কৃতিই আধুনিকতার সকল প্রকরণকে চিরকালীনতার ভ্রূণরূপে গর্ভে ধারণ করে রাখে।' তবে তিনি বলেন, 'ঐতিহ্যের অনুবর্তনে সিদ্ধি নেই, সিদ্ধি

আছে ঐতিহ্যের আত্মীকরণে, তার সম্প্রসারণে, তার নবায়নে,' যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ইকবাল, সেংঘর।

'মানব কল্যাণকর বিষয়বস্তু, সহজ সংক্রমণধর্মী প্রকাশভঙ্গি ও গভীর অন্তরিকতা' তলস্তয়কে যেমনি মহৎ শিল্পীতে পরিণত করেছে, তেমনি 'সর্বজনীন শিল্পকলার জন্য যে এক সর্বজনীন সমাজবিধানের প্রয়োজন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শিল্পও-যে শ্রেণীশিল্প হতে বাধ্য, এবং কর্তৃত্বশীল শ্রেণীই যে সে-সমাজে স্বাভাবিকভাবে শিল্পকলার উপরও কর্তৃত্ব করবে—এসব বস্তুগত তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে ভাববাদী, মানব-প্রেমিক শিল্পী তলস্তয়ের সচেতনতা খুব গভীর নয়' বলে যতীন সরকার যেভাবে আঙুল দিয়ে 'তলস্তয়ের শিল্পাদর্শ ও তাঁর উত্তরাধিকার' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, তা অনুধাবনযোগ্য।

আর গোর্কী? তাঁর সম্বন্ধে 'মাক্সিম গোর্কী ও আমরা' প্রবন্ধে যতীন সরকারের মন্তব্য: 'গোর্কির অনন্যতা মানব প্রেমের সক্রিয়তায় এবং যা কিছু অমানবিক তার প্রতি সঠিক ঘৃণায়।...শ্রমিক শ্রেণীর পবিত্র ঘৃণাকে তাঁর চৈতন্যে ধারণ করেছিলেন বলেই ঘৃণার পঙ্কে তিনি পঙ্কজ ফোটাতে পেরেছিলেন।'

পঙ্কজ যতীন সরকারও ফুটিয়েছেন 'ইতিহাস ব্যাখ্যায় সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে—মনস্তত্ত্বকে ইতিহাসের আওতায় টেনে এনে: 'ইতিহাস রচনায় ব্যবহৃত উপাদানগুলোর কোন্‌টিতে কোন্ শ্রেণীর কী ধরনের ভূমিকা ছিল, সতর্কভাবে তা উন্মোচন করতে পারলেই এসবগুলো থেকে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শ্রেণীর মনস্তত্ত্বের স্বরূপ নিষ্কাষণ করা যায় আর তারই সাহায্যে ইতিহাস ব্যাখ্যায় সামাজিক মনস্তত্ত্বের সুস্থ প্রয়োগ সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।'

অনুরূপভাবে সরকার 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ: উদারতা অনুদারতার দিগন্তরেখা'য় সাহিত্যবিচারে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ব্যাপারে যে বাংলাদেশের অনেকেই উদাসীন—এ বিষয়টি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন: 'এখানকার সাহিত্যিক সাহিত্যরসিক বা সাহিত্যতাত্ত্বিক সবারই মনমেজাজ গঠিত বুর্জোয়া সাহিত্য বিচারের আবহাওয়ায়, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা তথা প্রগতিশীল সাহিত্য বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান থেকে আমাদের বিদগ্ধজনও বঞ্চিত।'

কিন্তু বঞ্চিত নয় এদেশের শ্রমজীবী মানুষ তাদের নিজেদের জমিনের অধিকার-চেতনা থেকে। যতীন সরকারের 'মানব জমিন রইলো পতিত' প্রবন্ধের ভাষায়: 'নিজের জমিনের জন্য সাচ্চা কৃষকের মমতা অপরিসীম,

তার জমিনে অনধিকার প্রবেশকারীকে সে রুখে দাঁড়ায় সুতীব্র ঘৃণা দিয়ে।' সেই ঘৃণার মধ্য দিয়ে ফোটে যে পঙ্কজ তার রূপটি এরূপ: 'মানবজমিনে উর্বরতা সীমাহীন, ফলন-সম্ভাবনা অফুরান; অথচ তার তুলনায় সে জমিনের আবাদ নিতান্তই সামান্য, ফলন অকিঞ্চিৎকর। অভিযানের পর অভিযানে মানবজমিনের নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে যতোই, সম্ভাবনার বাস্তবায়নে ফসলের অকিঞ্চিৎকরতাজনিত ক্ষোভও বর্ধিত হতে থাকে ততোই। এ-ক্ষোভ হাহাকারের জনক নয়, এতে যথার্থ মানবীয় স্বাভাবিকতারই প্রকাশ। হাহাকার বলে আপাত-প্রতীয়মান হলেও এ-ক্ষোভ একান্ত সদর্থক ও বাস্তবানুগ অথচ প্রগতিমুখী। কারণ এ-ক্ষোভ নিষ্ক্রিয়তাকে প্রশ্রয় দেয় না, বিকৃতির পঙ্কে নিমজ্জন ঘটায় না, বরং সক্রিয়তা দিয়ে সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন ঘটায়, মানবজমিন আবাদে উন্নত থেকে উন্নততর আয়ুধের প্রয়োগে নতুন নতুন ফসল ফলিয়ে নবান্নের উৎসব জমায়।'

বারোটি প্রবন্ধে যতীন সরকারও যেভাবে 'উন্নততর আয়ুধের প্রয়োগে নতুন নতুন ফসল ফলিয়ে নবান্নের উৎসব' জমিয়েছেন তাতে তাঁর 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা'র স্বরূপটি লুকোনো থাকে না কিছুতেই।

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম

২

নির্বিরোধ নতুন পৃথিবীর জন্য

['যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা,' সৈয়দ আবুল মকসুদ। মুক্তধারা ঢাকা। মূল্য: সাদা ৬৫·০০, লেখক কাগজ ৪৮·০০]

যুদ্ধ এবং মূর্খতা আলাদাভাবে বা একত্রে মানবসমাজের অনেক অকল্যাণ সাধন করেছে, ধ্বংস করেছে শতাব্দীকালের সৃষ্ট বহু মূল্যবান সম্পদ। মূর্খতা অনেক সমরনায়কের ধ্বংসলীলায় ঘৃতাহুতির মত সহায়ক হয়েছে। আর্যশ্রেষ্ঠত্ব ও জাত্যভিমান 'সেমিটিক ইহুদি' নিধন থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী নিষ্ঠুরতার ইন্ধন যুগিয়েছে। হিটলারের ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে তথাকথিত আর্যতত্ত্বের বিরাট প্রভাব ও সমর্থন এবং আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানে উন্নত

জার্মান জাতির জাত্যাভিমানী অজ্ঞতার অন্ধ সমর্থন যে দায়ী একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্বযুদ্ধোত্তর অনেক কয়টি বড় সংঘর্ষ ও ধ্বংসলীলার পেছনেও কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। যেমন ছিলনা ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ। নিরাপত্তার (?) অজুহাতে আজো বিশ্বের সর্বত্র প্রশান্ত মহাসাগর থেকে মেরুসাগর পর্যন্ত পরাশক্তি বা তাদের দোসরদের শক্তির পাঁয়তারার কোন কমতি নেই, নেই মহাশূন্যে সমরসজ্জার কোন প্রকার বিরতি।

এসব কথা মনে এলো সৈয়দ আবুল মকসুদের প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা' পড়ে।

নিরক্ষর মানুষ মূর্খ হবে এটা স্বাভাবিক। নিবন্ধকারের আলোচনা তাঁদের নিয়ে নয়। সমাজের মূর্খতা সমকালীন সমাজের মানব গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবী (সম্প্রদায়ের) সমাজের 'মূর্খতা'। নিবন্ধগুলোর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা সূক্ষ্ম সম্পর্ক সে ক্ষেত্রেই। ''সরকারের শাসনকর্তা' বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও চিন্তাবিদগণ, তাঁদের দায়িত্ব স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী শাসকগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উন্নত সমাজ, অগ্রসর সমাজ, মূর্খহীন সমাজ গড়তে সাহায্য করা।'' অতীত এবং বর্তমানের ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা ও ব্যর্থতার সমালোচনা ভবিষ্যতে উন্নত সমাজ গঠনের সহায়ক—এই প্রত্যয়ে লেখক স্থির। তাঁর বিশ্বাস ভবিষ্যতে, ভবিষ্যতের মুক্তিতে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট, বিশ্বাসে রয়েছে গভীরতা। ''শিল্পী সাহিত্যিকদের অনুভূতি, মানুষের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি অন্যান্যের তুলনায় আরো প্রখর, গভীর ও সূক্ষ্ম ... কম হোক বেশি হোক রাজনীতির কার্যকলাপ প্রতিটি মানুষকেই স্পর্শ করে.... শিল্পী সাহিত্যিকদেরও।'' উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। সৈয়দ আবুল মকসুদ সেই দলে থাকতে চান যাঁরা শিল্পের নামে শিল্পসৃষ্টিকে জীবনের সত্য থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান না—নেয়ার পক্ষপাতী নন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, বিস্তৃত পটভূমিতে আলোচনাকে সম্প্রসারিত করে তিনি বিরাট ক্যানভাসে অঙ্কিত চিত্রের মত সামান্যকে সমগ্রের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেন। সুস্পষ্ট ও সাহসী উপস্থাপনা, নিপুণ পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

নিবন্ধগুলো তে অনেক ব্যক্তিত্ব এসেছেন আলোচনার সূত্র ধরে। এসেছেন জাঁ পল সার্ত্রে, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, পিকাসো, প্রমোদিয়া অনন্ত ত্যুয়ের, এসেছেন লাতিন আমেরিকার পাবলো নেরুদা, লুই বোর্হেস, নাদিনগোরদিনার, নাইজেরিয়ার ওলে সোইংকা, এসেছেন আইনস্টাইন, টয়েনবি, জয়নুল আবে-

দীন, ডঃ খুদা, গোবিন্দ দেব, ইবনে সিনা, আলকিন্দি, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়, বিশ্বের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই। এঁদের অবদান, বুদ্ধিবৃত্তির উচ্চতা বা মানবিকতা উচ্চমানের তাতে কোন সংশয় নেই। এঁদের সকলের বিচরণক্ষেত্র সংস্কৃতির আলাদা আলাদা অঙ্গনে। সমাজের ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে সমাজ ও মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করে গেছেন। এঁদের সকলের কমবেশি বলিষ্ঠতা বা জীবনবিমুখতা, ত্যাগ বা আত্মসমর্পণের মধ্যে ইহজাগতিক সুখের সন্ধান, কপটতা বা সততা নিবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু। লেখক তাঁদের দায়িত্ব পালনের দিকটির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। এঁদের অনেকেরই নেতিবাচক দিকগুলোর বিতর্কিত আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই ইতিবাচক দিকগুলোই আলোচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। এঁদের সকলের কমবেশি সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষের কল্যাণের উদার দিগন্ত সকলেরই লক্ষ্য যা এই পৃথিবীর সংগ্রামী ইতিহাসের সাধারণ সম্পদ। প্রগতির উপাদান তাঁদের মধ্যেও ছিল তবে ছিল না ব্যাধির নিদান নির্ণয়ের যথাযথ ব্যবস্থা। সমস্যাসংকুল জীবনের মুক্তিতে তাঁদের অবদান বা ভূমিকা তাঁদের মেধা ও মনীষার তুল্য নয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ডহীনতার কথা এসেছে, এসেছে সুবিধাবাদী, আত্মসমর্পণবাদী মনোভাবের কথা। লেখক আশাহতভাবে এঁদের সমালোচনা করেছেন দু' একজন ব্যতিক্রমকে সামনে রেখে। কিন্তু আমাদের মনে হয় আশাহত হওয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গি যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই। কারণ পাশ্চাত্যের স্বাধীন বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে পশ্চাৎপদ, বিকলাঙ্গ পুঁজিবাদ-সৃষ্ট আমাদের দেশের বা উপমহাদেশীয় খর্বিত বুদ্ধিজীবীদের তুলনা চলতে পারে না। লেখক তাঁদের কাছে যে ভূমিকা প্রত্যাশা করছেন তা পালন করাও তাঁদের জন্যে স্বাভাবিক ছিল না কিংবা এখনো নেই। তাই ব্যাপক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্ধ অনুকরণ, মেরুদণ্ডহীন সংকীর্ণতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা ছাড়া অন্য কিছু আশা করাকে বলা যায় অতিপ্রত্যাশা।

"কোন্ দর্শন কতটা বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিবাদী সেটা পরিমাপের চেয়ে কোন্ দর্শন মানব সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে এবং জীবনকে শান্তি দিতে পারে সেটাই আগে বিচার্য, কারণ সীমিত জীবনে অগ্রগতি ও শান্তিই সর্বাগ্রে কাম্য। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি নয়।" এই উক্তি থেকে বোঝা যায়

সার্তরে প্রভাব লেখকের উপর অত্যন্ত স্পষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী বিশ্বে যে নিদারুণ অবক্ষয় ও হতাশার সৃষ্টি হয় তারই বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের শীর্ষবিন্দু অস্তিত্ববাদ। বাস্তবতাবর্জিত আধ্যাত্মিক চিন্তপ্রধান দার্শনিক মতবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্বকারী অন্যান্য মতবাদের প্রতিবাদ করে মূলত অস্তিত্ববাদের আত্মপ্রকাশ। অনেকের মতে তাই অস্তিত্ববাদ হতাশাপ্রাপ্ত সামাজিক পরিবেশের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীর বিপর্যস্ত মনের প্রতিক্রিয়া। অস্তিত্ববাদ সামাজিক শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তবতাকে স্বীকার করতে চায় না। নিপীড়নকে আত্মিকভাবে বিচার করে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। অস্তিত্ববাদী দর্শনের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন সার্তে, তাই ব্যক্তিক আত্মিকতাকে মানবিক আত্মিকতায় উন্নীত করে সমন্বয় করতে চেয়েছেন 'মার্কসবাদ ও মানবিকতাবাদ'কে। কিন্তু তাঁর পক্ষেও স্ববিরোধ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। হতাশাগ্রস্ত অবক্ষয়িত সমাজের পরিবর্তনের বিপরীতে মানবতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদের আড়ালে শোষক নিপীড়কের সাথে শোষিতের সমন্বয়ের বিধান, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে কাজ করে। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য, অসমবিকাশ, শোষণ-নির্যাতনের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। 'যুদ্ধ নয় শান্তি', 'মানবতাবাদ' এমন সব শ্লোগান বিশ্লেষণের মায়াজাল মূল সত্যটি আড়াল করে শোষণ নির্যাতনকে পুষিয়ে নেবার সূক্ষ্ম চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। নির্মম সত্যটি হল, শোষণ যত বেশি নিষ্ঠুর, প্রবল প্রতিঘাত ততই তীব্র ও হিংস্র। শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ মানবসমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারা, সভ্যতার আদি যুগ থেকে পূর্বাপর তা একই ধারায় প্রবাহিত, কখনও তীব্র কখনও নম্র। অনেকের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রবন্ধকার সংশয়হীন, "তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির উচ্চতা সম্পর্কে কারো সংশয় নেই। কিন্তু সমস্যাসংকুল জীবনের মুক্তিতে তাঁদের অধিকাংশেরই ভূমিকা অনুল্লেখযোগ্য।" অন্যদিকে বিদ্যমান সমস্যাকে যে প্রবন্ধকার তলিয়ে দেখেছেন, প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ চিহ্নিতকরণে যে প্রয়াস পেয়েছেন, তার প্রমাণ এই উক্তি "মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পাক বাহিনী আমাদের মেধাবী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিলো। কিন্তু ৭২-৭৩এ বুদ্ধিজীবীদের গুলি করে মারা হলনা ঠিকই কিন্তু যা হলো তাকে বলা চলে অনাগতকালের সংখ্যাহীন বুদ্ধিজীবীকে অগ্রিম গলা টিপে মারার নামান্তর।"

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি, একটা বিশেষ অবস্থান, ইতিহাসের একটা খণ্ড অংশ মাত্র, বলা যায় বড় নাটকের একটা দৃশ্যের ভগ্নাংশ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সময় মিলে যে চিত্রটি সামনে উপস্থিত তার আরো গভীর অনুধাবন প্রয়োজন ছিল। যুগ ও সময়ের ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটে আপাত-প্রগতিশীল অনেকের ভূমিকাই ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে প্রগতিবিরোধী, গণবিরোধী রূপটির স্বরূপ উদঘাটনে আরো ঋদ্ধ চেতনায় সমৃদ্ধ হতে পারতো। লেখকের স্বীকারোক্তির মধ্যেই তার প্রমাণ মিলবে, "সেগুলোতে আমার একটি পর্যায়ের চিন্তা-চেতনার চিত্র পাওয়া যাবে। অবশ্য অনেক ব্যাপারে আমি আগের অবস্থানে অনড় নেই, আমার মন মানসিকতার নড়চর হয়ে থাকবে।" এই স্বীকৃতির মধ্যে সততা, উদারতা ও মেধার পরিচয় রয়েছে নিঃসন্দেহে।

তিনি আশা করেন, তাঁর কথায়, "যুদ্ধ ও বিবাদ বিসম্বাদহীন শান্তিময় এক নির্বিরোধ সাম্যবাদী সমাজ বা পৃথিবী আমার কাম্য; সেই সঙ্গে অজ্ঞতার অন্ধকারজনিত অপকর্ম তথা মূর্খতা থেকে সমাজকে মুক্ত করাও আমার আরাধ্য।"

ফজলুর রহমান

৩

খলিল জিবরানের মুক্ত চিন্তা

['শয়তান', খলিল জিবরান, অনুবাদ বেলাল মোহাম্মদ। রূপম প্রকাশনী, ঢাকা। মূল্য ২০·০০।]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী খলিল জিবরান একাধারে ছিলেন দার্শনিক নিবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, কবি, রেখাচিত্রী ও লেখক সমিতির সংগঠক-প্রতিষ্ঠাতা। তবে পাঠক-সাধারণ্যে তাঁর পরিচিতি বহুমুখী প্রতিভার কারণে যতটা না তারচেয়ে অনেক বেশি তিনি প্রিয় ছিলেন মুক্ত চিন্তার ধারক-বাহক হিসেবে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মের নামে শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আমৃত্যু প্রতিবাদী ও সোচ্চার ছিলেন তিনি। জগৎ ও জীবনের সমুদয় ঘটনা ও

প্রচলিত রীতি-নীতিকে তিনি ভাববাদের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে না-দেখে বস্তুগত-ভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য চিন্তার বিশিষ্টতা মূলত এখানেই।

'শয়তান'ও খলিল জিবরানের এই প্রগতিবাদী চিন্তার ফল। 'খলিল জিবরানঃ পরিচিতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়' অংশে অনুবাদক জানিয়েছেন যে, অনূদিত রচনাগুলো "খলিল জিবরান রীডার" গ্রন্থের 'সিক্রেট অব দ্য হার্ট' ও 'টিয়ার্স এণ্ড লাফটার' খণ্ড থেকে গৃহীত। গ্রন্থে সংকলিত সাতটি রচনার সূচীক্রমানুযায়ী শিরোনামা হচ্ছে—দুষ্কৃতকারী, ওরা জীবন জয়ী, দাসত্ব, শয়তান, গোরখুঁড়ে, পাগলা জন ও কবির কণ্ঠস্বর। রচনাগুলোতে যুগপৎ গল্প ও মননশীল রচনার স্বাদ পাওয়া যায়। 'দুষ্কৃতকারী' নামের ক্ষুদ্র অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রচনাটিতে লেখক দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, ধন-বৈষম্যমূলক সমাজে মানুষের স্বার্থপরতার ফলে কি করে একজন নিরীহ মানুষ দুষ্কৃতকারী হলো, হত্যাকারী হলো শান্ত সুবোধ সুঠামদেহী এক যুবক।

অর্থনৈতিক বৈষম্যপ্রসূত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রেমও শ্রেণী-চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, যার কারণে বিত্তহীন কোনো পুরুষের সাথে উচ্চবিত্ত কোনো নারীর প্রেম চূড়ান্তে ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করে। এবং এটাই স্বাভাবিক। অসম শ্রেণীর প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুগল-মরণে স্বস্তি খুঁজে পায়। খলিল জিবরানের 'ওরা জীবন জয়ী' নামের গল্পধর্মী রচনা এই নির্মম সত্যেরই ভাষাগত প্রকাশ। রচনাটির শেষাংশের দু'টি বাক্যে পাচ্ছি, 'পরে এক সময়, দেশের শেষ প্রান্তে আমীরের অনুচররা দেখতে পেয়েছিল নরকঙ্কাল। একটি কঙ্কালের কণ্ঠদেশে জড়ানো সোনার লকেট' (পৃ ১৫)। বলা বাহুল্য, গলায় সোনার লকেট জড়ানো কঙ্কালটি ছিলো আমীর কন্যার। আর অন্য কঙ্কালটি ছিলো বিত্তহীন যুবকের, যে-যুবক মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিলো আমীর-কন্যাকে। আমীর-কন্যা তার ভালো-বাসায় সাড়া দিয়েও সফল হতে পারেনি কেবলমাত্র শ্রেণী-বৈষম্যের কারণে।

একথা নির্মম হলেও সত্য, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে দাসত্ব করে তবে বেঁচে-বর্তে আছে, যদিও অনেকেই তা মেনে নিতে নারাজ। খলিল জিবরানের 'দাসত্ব' নামের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক নিবন্ধে সমাজ-মানুষের এই দাস মনোভাবের পরিচয় উদ-ঘাটিত হয়েছে। লেখকের বর্ণনায়, 'আমি ধর্ম মন্দির ও পূজার বেদী দর্শন করেছি, প্রবেশ করেছি রাজপ্রাসাদে, সিংহাসনে করেছি উপবেশন; দেখেছি

শিক্ষানবীশ দাসত্ব করছে কারিগরের, কারিগর দাসত্ব করছে চাকরিদাতার এবং চাকরিদাতা দাসত্ব করছে সৈনিকের, সৈনিক দাসত্ব করছে শাসনকর্তার, শাসনকর্তা দাসত্ব করছে সম্রাটের। আর সম্রাট দাসত্ব করছে পুরোহিতের, পুরোহিত দাসত্ব করছে প্রতিমার। এবং প্রতিমাতো অপপ্রজ্ঞাজাত, মাটির তৈরি এবং করোটির গোলকের ওপর স্থাপিত' (পৃ ১৬)। অন্যত্র, 'আমি অতীতকে সঙ্গ দিয়েছি Kange নদীর তীর থেকে ইউফ্রেটিস সৈকত এবং নীল নদের মুখ থেকে আসিরীয় সমতল ভূমি পর্যন্ত, এথেন্সের মল্লযুদ্ধ প্রান্তর থেকে রোমের গীর্জা পর্যন্ত এবং কনস্টান্টিনোপলের নোংরা বস্তী থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত।... তবু দেখতে পেয়েছি সবখানেই দাসত্বের গতিবিধি, সবখানেই অজ্ঞানতার গৌরবময় ও রাজসিক শোভাযাত্রা। আমি দেখেছি লোকেরা তরুণ-তরুণীকে প্রতিমার পায়ে বলিদান করে, প্রতিমাকে গণ্য করে ঈশ্বররূপে। ...তার নামে হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং তাকেই বলে সমতা বিধান। প্রতিমার শতনাম, কিন্তু বাস্তবতা একই। তার মুখাবয়ব বহু বিচিত্র, কিন্তু একই উপাদানে-গড়া। মূলতঃ এ যেন একটি একটি স্থায়ী বিকার, যা বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রামিত। আমি দেখেছি অন্ধ দাসত্ব, যা লোকদের বর্তমান সময় কালকে পিতৃপুরুষের অতীতকালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। যার ফলে অটুট থাকে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও লোকাচার সমূহ, নতুন বোতলে পুরাতন মদিরা' (পৃ ১৭)। রচনাটিতে খলিল জিবরান অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে দেখাতে সফল হয়েছেন যে, এই দাসত্বের কারণে মানব সমাজে আজ বুদ্ধির মুক্তি ব্যাহত। ফলত মানুষ মাত্রেই আজ পরাধীন।

গ্রন্থ শিরোনামের 'শয়তান' রচনাটি খলিল জিবরানের বস্তুবাদী চিন্তা ও বিশ্লেষণের উজ্জ্বল নিদর্শন। এ রচনা ধর্মীয় শাসন-শোষণ ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। রচনাটিতে খলিল জিবরান বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দৈবশক্তি, ঈশ্বর, পাপ, পুণ্য, শয়তান ইত্যাদির—এক কথায় ধর্মোৎপত্তির সামাজিক ইতিহাস বিবৃত করেছেন। এবং এসব যে ভোগেচ্ছু অথচ অলস, প্রভুত্বকামী অথচ শারীরিকভাবে দুর্বল মানুষের কূটবুদ্ধিপ্রসূত তা প্রমাণ করেছেন। একটি স্যাটায়ারধর্মী কাহিনীর মধ্য দিয়ে খলিল জিবরান এখানে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের আদি ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। ফাদার স্যামানের সাথে আহত ও মৃতপ্রায় শয়তানের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের সামাজিক ব্যাকরণ।

এ রচনা পাঠে আমরা জানতে পারি গোত্রতান্ত্রিক সমাজে কি করে দেবের আবির্ভাব ঘটে এবং তারই সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠা পায় শয়তানের অস্তিত্ব। অতঃপর লোভী, শোষক ও চতুর মানুষ শয়তানের কল্পিত অস্তিত্বকে তার নীতিবোধের সাথে সংযুক্ত করে একে জীবিকার সহজ উপায় হিসেবে বেছে নেয়। এর ফলেই উদ্ভব ঘটে যাজক-তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের, যা পরবর্তীকালে একটি চূড়ান্ত ও পবিত্র পেশায় পরিণত হয়। এই পেশাজীবীরাই শয়তানের মিথ্যে ধারণাটিকে সমাজ জীবনে টিকিয়ে রাখছে। কারণ তারা জানে, শয়তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে সমাজে তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। শয়তানের সংলাপে পাই, 'সকল পাপাচারের আমিই জন্মদাতা। যদি পাপের বিলোপ ঘটে, তবে তো পাপের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধরত, তাদেরও অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। তাদের পরিবার-পরিজন আর সংগঠন হবে বিপর্যস্ত' (পৃ: ৩১)। ফাদার স্যামানও তা জানে এবং মানে। তাই আহত ও মৃতপ্রায় শয়তানকে বাঁচাতে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। রচনাটির শেষাংশে দেখতে পাই, 'ফাদার স্যামান তাঁর জামার আস্তিন গুটিয়ে নিলেন এবং এগিয়ে গেলেন। আহত শয়তানকে কাঁধে চড়িয়ে নিজের বাড়ীর দিকে ছুটলেন।... ...তাঁর পরনের কালো পোষাক আর লম্বা দাড়ি আহতের শরীর থেকে ক্ষরিত ফোঁটা ফোঁটা রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু প্রাণপণে এগিয়ে চলেছেন ফাদার স্যামান। তাঁর ঠোঁট নড়ছে, মরণোন্মুখ শয়তানের প্রাণরক্ষার জন্য তিনি নিবিড় প্রার্থনারত' (পৃ: ৩২)।

পরবর্তী রচনা 'গোরখুঁড়ে'ও অনেকাংশে পূর্ববর্তী রচনার সমধর্মী, অন্তত প্রতিপাদ্য বক্তব্যের দিক থেকে। এখানেও খলিল জিবরান দেখিয়েছেন যে, 'ঈশ্বর' শব্দটি মূলত অস্তিত্বকামী চতুর মানুষের ব্যক্তিসত্তারই নামান্তর। সে কারণেই মানুষ হচ্ছে আত্ম-প্রবঞ্চক। এক একজন জিন্দা লাশ।

'পাগলা জন' নামের গল্পধর্মী রচনাটিতে ধর্মীয় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত জনের প্রতিবাদী চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মের নামে সমাজ জীবনে যে সব ব্যভিচার চলছে তারও করুণাঘন প্রকাশ ঘটেছে রচনাটিতে। প্রতিবাদী এবং সেকারণেই ধর্ম-ব্যবসায়ীদের হাতে নির্যাতিত ও অপমানিত জনের ভাষায়, "তোমরা সংখ্যায় অনেক, আর আমি একজন মাত্র। রাতের অন্ধকারে নেকড়ের থাবায় মেষের শরীর ছিন্নভিন্ন হতে পারে। কিন্তু রক্তের দাগ লেপটে থাকে পাথরের গায়ে; দিনের আলোয় তা সবাই দেখতে পায় এবং রাতের পাপ প্রকাশ পেয়ে যায়" (পৃ ৪৯)।

শেষ রচনা 'কবির কণ্ঠস্বর'-এ শোষিত সমষ্টির প্রেমিক, বিপ্লবী খলিল জিবরানের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। এ রচনায় খলিল জিবরানের

বিশ্বত্ববোধের পরিচয় মেলে: 'মনুষ্য জাতি নানা বর্ণ ও বংশধারায় খণ্ডিত, বিভিন্ন দেশ শহরের বাসিন্দা। কিন্তু আমার আনাগোনা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে; আমার নেই কোনো স্থায়ী নিবাস। বিশ্বচরাচর আমার স্বদেশ এবং অখণ্ড মানবতা আমার বংশ পরিচয়' (পৃ ৫০)। রচনাটির সমাপ্তি ঘটেছে এক প্রবল আশাবাদের মধ্য দিয়ে: 'আজ একটি হৃদয় দিয়ে আমি যা উচ্চারণ করি, অনাগত দিনে সহস্র হৃদয় থেকে তা হবে উচ্চারিত' (পৃ ৫৫)।

সন্দেহ নেই যে, খলিল জিবরানের উল্লিখিত সাতটি রচনার অনুবাদ আমাদের সংকটাপন্ন দেশ-কালের পটভূমে একটি সময়োপযোগী কাজ।

হেলাল আহমেদ

৪

দায়বদ্ধ কবিতা

['কাঙাল দীর্ঘকাল', 'পৃথিবীর গৃহকোণ', 'দগ্ধ ধূলিকণা', কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়।]

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কাঙাল দীর্ঘকাল' প্রকাশিত হয় আশির প্রথমার্ধে। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা বয়সের দিক থেকে তখন যৌবন-উচ্ছ্বাসে মুখরিত। মুক্তির প্রত্যাশায় এদেশের সিংহভাগ মানুষ বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না তাদের শেষ রক্তবিন্দু, তার প্রতিদান সংরক্ষিত হচ্ছিল স্বাধীনতা-বিরোধী শিবিরে। অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর সামাজিক অবক্ষয় আনে হতাশা। সৎ রাজনীতিক বা তাঁদের সংগঠন গড়ে ওঠেনি সুদৃঢ়ভিত্তি। অর্থনৈতিকভাবে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যাদির ঊর্ধ্বগতির ম্যারাথন রেস, বৈদেশিক নির্ভরতা আঘাত হানে তার অন্তঃপ্রদেশে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে এই কবির লেখায়। 'আজও বাংলার আন্ধার গ্রামে-গ্রামে ঘোরে লাঠি, গর্জায় ধমক/ঝলমলে রাজধানী শহরেও।/দেশ জুড়ে বাড়ে মাতব্বর।/আর কী আশ্চর্য!/গণতন্ত্র ঘাতকেরা সব দূরবর্তী সিনেটের কমণ্স

সভার প্রাণের দোসর।" (বেহুলা বাংলা/কাঙাল দীর্ঘকাল]। অন্যত্র শীর্ণ নদীতে উত্তাল তরঙ্গের গর্জনে তিনি ফেটে পড়েন। এই গর্জন বিবেকের মুক্তিতে, কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর মহান ব্রতে সমর্পিত। এর সুর ঝাঁঝ-মেশানো, আক্রমণাত্মক। 'নেংটীতে সান্‌কিতে কেটে গেছে আমাদের বহুকাল,/অনেক দেরিতে আজ এসে দিই ডাক : হরতাল হরতাল!/রা-টি ছাড়া, শ্লোগান শব্দ ছাড়া, টুঁটি-টেপা কি যে ছিল হাল!/অসহ্য হলেই শেষে ডাক আজ, হরতাল, হরতাল!/কেটে গেছে সেই সব দিন শুধু বেয়ে-টেনে হাল, বুকে গাঁথা লাঙলের ফাল,/আর নয়, হরতাল, ডাক আজ হরতাল, হরতাল।" [হরতাল/কাঙাল দীর্ঘকাল]।

সমসাময়িক বিশ্বের প্রভাবও এখানে প্রত্যক্ষ। শ্রেণী বৈষম্য, বর্ণবাদ এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনতা ঐক্যবদ্ধ। নিরাপস তাদের আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবেই কবি এখানে বিক্ষুব্ধ, সংগ্রামমুখর, বিপ্লবীদের সাথী। তাঁর দু'চোখ জুড়ে আশা, চেতনায় দাবানল। প্রত্যয়-বিশ্বাস লক্ষ্য-অভি-যাত্রার সম্মিলনে সোচ্চার কবির বলিষ্ঠ আশাবাদ, "যথার্থ নিয়ম মেনে আমরা ব্যথিত যারা/শ্রমিকের কাছে যাবো, তাকাবো তাদের চোখে/শিখে নেবো লক্ষ্যভেদী, নিরাপোস দৃষ্টির ভাষা,/শত্রু-মিত্র লক্ষ্য, নির্ধারণ, ক্রুদ্ধ হাতুড়ির বলিষ্ঠ আঘাত।/তারপর দেখো ঠিক, সূর্য ওঠার আগে/সকলে আমরা জাগবো, জাগবো।" [একদিন সূর্য ওঠার আগে/কাঙাল দীর্ঘকাল]।

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আর সমাজ বদলের গতি সমমাত্রায় প্রবাহিত হয়না অনেক সময়। সাহিত্যের যেমন আবর্তন চলে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, ঠিক তেমি দীর্ঘদিনের ত্যাগ-তিতিক্ষার অনুশীলনে সমাজে পরিবর্তন আসে। এই দীর্ঘ সময়ে অনেকেই বিচ্যুত হয়। ব্যক্তিস্বার্থ করে অন্ধ। প্রলোভন, সংশয়, সন্দেহের গজায় বিষবৃক্ষ। এতে প্রাণবান কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েন। কখনো নিজের ব্যর্থতায় আবার কখনো বা সমষ্টিক ব্যর্থতায়। কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় এই সংশয় গোপন থাকে না যখন তিনি উচ্চারণ করেন, "এ্যাতোদিনে আমি ধরে আছি হাতে/আর এক মেয়ের চাল-ধোয়া সাদা হাত,/আমার অনীক-অসহায়তায় কেঁপে ওঠে তার/মোহনীয় সম্মান। দু'জনারই খুব দেরি হলে পথে,/বিবেকী যুবক প্রশ্ন সাজাই মনে, আমি কি পার্টিজান ?' (স্বপ্নপ্রশ্ন/পৃথিবীর গৃহকোণ]। অবশ্য আমাদের এই সংশয়-সন্দেহ একদিন পরম সত্যের নিকটবর্তী করে। যা সত্য তা-ই বয়ে আনে সুফল। কবির এই

UNIVERSITY LIBRARY

সংশয়-সন্দেহ অমূলক নয়, বরঞ্চ মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ থেকে উৎসারিত। যেমন, "ভালোবাসা পৃথিবীর ফল, পৃথিবীতে নিদেন তো দ্বন্দ্বের নিয়ম;/ তুমিও পৃথিবীরই মেয়ে, দ্বন্দ্বের অধীন,।/স্বাভাবিক দ্বিধায় কাতর।" [প্রেমের শহরে ট্রেন যাবে/পৃথিবীর গৃহকোণ]।

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যভাষা সুন্দর। আর ভাব প্রকাশের গতি প্রবহমান রেখে যতিচিহ্ন প্রয়োগের যে সাম্প্রতিক ধারা, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানেও সাবলীল। যেমন, "আকস্মিক এক অন্ধকারে/যুবতী বউর কোনো নিরুদ্ধার চিৎকারে ভেঙে যায়/খান খান আর্দ্র তার বুক, কৃষ্ণকায় সবুজের মাঠ,/নিরেট নিপাট—নৈঃশব্দ—'বন্য পশুরা তখন লজ্জিত, ত্রস্ত-পলাতক।" [সোনালি আঁশের গল্প ৩/কাঙাল দীর্ঘকাল]

যদিও গদ্যেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তথাপি কবি মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত কিংবা মুক্তক বা প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের প্রতিও অগাধ আস্থাভাজন। বিভিন্ন ছন্দের স্বাদ চেখে তিনি নিজস্ব কাঠামো নির্মাণে প্রয়াসী। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তা বলা যাবে না। তরুণের নতুন দোয়ার উন্মোচনের যে সম্ভাবনা, তা স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ প্রাপ্তির শুধু দাবি রাখে। প্রচলিত ছন্দের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় ব্যবহার :

ক. আজ অবধি পাইনি যাকে,/অথচ যা খুব জরুরি/সমাজ দেহের তেমনি এক/সুসঙ্গতি পায় যে খুঁজে নিভৃত এক/ছোট্ট আদল, ও নন্দিনী, তোমার মাঝে।

[রূপের সপক্ষে/কাঙাল দীর্ঘকাল]

খ. তোমার প্রতি ভালোবাসায় অন্ধ হলে/সেদিন থেকে, তুমি আমায় ঘৃণাই করো/সবার জন্যে খোলা আমার ঘরের দুয়ার বন্ধ হলে,/তুমিও সেদিন আমায় যেন পরই করো।

[দগ্ধ ধূলিকণা]

গ. অনেক পেছনে সময়কে ফেলে এসে,/হলেও সকল প্রচণ্ড প্রতিকূল,/ এখন দুজনা অদ্ভুত প্রতিযোগী—/প্রতিদিন নানা অসুখের সংবাদে,/ অসঙ্গতির বাছাই বর্ণনায়,/কবুল করতে একটিই সে-যে ভুল।

[অবশেষ/পৃথিবীর গৃহকোণ]

ঘ. বিবাহিত প্রেমে বিষয় ছড়ায় বিষ,/পরকীয়া হলে, প্রাণ তোলে খোলা শিস্।

[অবশেষ/পৃথিবীর গৃহকোণ]

ঙ. দূরে, বহুদূরে শুধু নিরুদ্দেশ ফসলের ঘ্রাণ/ভেসে পড়ে অবসন্ন বাতাসের সাথে,/প্রসন্ন মাড়াই শেষে অট্টহাস্য কাঁপে/উঠোনের

পাশে-খোদাকে শোকর কিছু/কিছুটা কপাল, বাকি সব ন্যায্য হৈ চৈ/উথাল উল্লাসে

[নিরুদ্দেশ ফসলের ঘ্রাণ/কাঙাল দীর্ঘকাল]

লিরিকের প্রতি আকর্ষণ কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-শরীরে একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে। তাঁর কবিতার যদি দু'টো প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের কথা বলা হয়, তাহলে তার একটি গদ্যে সহজ বিচরণ এবং অপরটি বহু প্রচলিত (এবং এ-ক্ষেত্রে মন ফস্‌কে যাবার প্রতুল আশঙ্কা সত্ত্বেও) লিরিক নিয়ে অভিযাত্রা। লিরিকের যে সকল প্রধান গুণ আবশ্যক, তার উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় এই কবির কিছু রচনায়ঃ

ক: নগরীর কাছে নগরীর মতো/চেয়েছো তো হতে ক্ষুন্ন,/মুখের সস্তা শতরূপ লোভ/দেবে নাকো দাম ভিন্ন!

[তিরস্কার/কাঙাল দীর্ঘকাল]

খ. যার প্রতি যতো তুমি অকারণ মুগ্ধ,/তার গতি সম্মুখে ততো রবে রুদ্ধ।

[অবশেষ/পৃথিবীর গৃহকোণ]

গ: শুধু বর্ধিত দুঃখেই যদি বিপ্লব হতো,/তোমার অবহেলায়ই হতাম তবে প্রেমার্ত।

[অবশেষ/পৃথিবীর গৃহকোণ]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জনজীবনে বহুমাত্রিক বিপর্যয় নেমে আসে। যে চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এদেশের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল, কালক্রমে তা হয় ভূ-লুণ্ঠিত। জাতীয়করণকৃত ব্যাংক বীমা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে কতিপয় লুটেরা বণিক পুঁজিপতিদের হাতে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে দেশ ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে পুঁজিবাদের করাল পরিধিতে। কবি এসবের পুরাটাই অবলোকন করছেন। তারপরও তাঁর কৌমচোখ সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের দিকে ফেরানো। কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক ধারাকে মেনে নিয়ে এ জন্যেই ক্ষুরধার প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাঃ "একে-একে সবাই বিরুদ্ধে যাবে।/ মানুষ তে শ্রম করে,/শ্রমের ফসল তার চুরি হলে, কেড়ে নিলে,/ সে তো চারিদিকে শুধু শত্রুই দেখতে পাবে" [দগ্ধ ধূলিকণা]। কিংবা কখনো তাঁর বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি এ রকমঃ "দূর আঙিনায় দেখি পাঁজা খড় কিছু,/মুখে ঝুঁকে ঝুঁকে ঠেসে, আহা আগু পিছু/তাকে কাঁধে নাও তুমি তুলে,/একদিন ওইভাবে, ভিন্ন অভাবে,/আমি নেবো তোমাকেই সদেহে—সমূলে।" [দগ্ধ ধূলিকণা]।

অঙ্গীকার রক্ষা করতে গিয়ে শিল্পের একটা বিরাট অংশ কালের গণ্ডি অতিক্রমনে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার গ্লানি যদিও শিল্পীকে স্পর্শ করেনা, তবুও মহৎ শিল্পীমাত্রই স্থান-কাল ভেদে হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিকতাসম্পন্ন বা কালোত্তীর্ণ। সমকালীন দেশজ এবং বহিঃবিশ্বের নানা ঘটনা প্রবাহে সচেতন কবি কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলিত হয়েছেন। সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে তাঁর কবিতাকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এর ভাষা ঋজু। আর তা সমাজদেহের মতো নারী দেহেও পরিসঞ্চারমান। "...খসে পড়ে ঘোমটা.../কষ্টকৃত উবু, ঝাপ্‌সা দৃশ্যপট, চাপা শ্বাস যদি,/তখন হঠাৎ পষ্ট টের হল যেটুকু বোঝার ছিল বাকি;/মোড়লের ইটের ভাটায় গেলে, খাক হয়/যা-কিছু নরোম মাটি" [টের/কাঙাল দীর্ঘকাল]। মেহনতি মানুষের জন্যে কবি হৃদয়ের দরদ ঢেলে সাজিয়েছেন এই পংক্তিমালা।

সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল-মুক্তির জন্যে প্রাণপণ কবির ঐ লড়াই যেমন সত্য-অবিসংবাদিত, প্রকারান্তরে তাঁর কাব্যসাধনার বিচ্যুতি যুগের প্রয়োজন মিটিয়েই খালাসও অপ্রিয় ধ্রুব সত্য। তাই কবি-কর্মী যখন ঘোষণা করেন, "শেক্সপীয়র সত্য হলে মার্কোসের পতন হবে।/তিন ডাইনীর দরকার নেই, ফিলিপাইনের হরিত সকল,/সবুজ মনের ব্যাপক মানুষ এগিয়ে এলে/মার্কোসের পতন হবে।" [ম্যাকবেথ এবং মার্কোস/কাঙাল দীর্ঘকাল], তখন আমাদের বুক কেঁপে ওঠে। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। কিন্তু সংশয়ের থেকে যায় গাঢ় প্রলেপন। এ সংশয় শিল্পের প্রশ্নে।

'সোনালী আঁশের গল্প' কবিতাবলীর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা এসেছে। রচনাশৈলীতে গ্রামীণ আমেজের স্বাদ লোভনীয় এবং এর শিল্পমানও খর্বিত হয়নি কোন পত্রে। "কৃষকের ধুলোট সন্তান সহসা ধরে না সোনারঙ,/উঠোনে এসেই হাসেনা সে উজ্জ্বল সোনালী হাসিটি।/...গোটা গেরস্থালি হলে নোংরা, ঘিন্‌ঘিনে, দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন,/তখনই কেবল/প্রাকৃতিক পট্ট আঁশ ধরে বাণিজ্যিক সোনারঙ/," [সোনালি আঁশের গল্প ২/কাঙাল দীর্ঘকাল]—এই শৈল্পিক দ্যোতনায় উজ্জীবিত কবিতাবলী নিঃসন্দেহে একটি সার্থক এবং পৃথক কাব্য সৃষ্টির উপাদান হতে পারতো—যে কোনো কারণেই হোক কবি এর সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হন নি।

তরুণ রক্তধারা একদিন নিজের অজান্তেই যেমন সংসারের যাবতীয় আয়োজন তুলে দেন আগামী প্রজন্মের হাতে তেমনি কবিও হয়ে ওঠেন প্রবীণ বৃক্ষ। কীট পতঙ্গ এবং অন্যান্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করে যোগান

দেন সরস শস্য, যার বংশ বৃদ্ধির নিশ্চয়তা থাকে, নিশ্চয়তা থাকে সুস্বাদুর, পরিপুষ্টির। কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা-শস্যের গায়ে সোনা-রঙের একটি আবরণ লক্ষ্য করা যায়। এই আবরণ পরবর্তী প্রত্যুষের সূর্যাভায় সুস্পষ্ট হবে, তার ইঙ্গিত—"রাজবাড়ি ছেড়ে, পুঁজির বিকল ট্রেন ছেড়ে-ছুড়ে,/বউ কথা কও-পক্ষীর সাথী, মানবিক প্রকৃতির,/আমিও কুমার নদী, আজ আমিও যৌক্তিক/নারীর হৃদয়ে যাবো, হৃদয়েও স্থান আছে জানি" [নূতন হৃদয় দেশ/পৃথিবীর গৃহকোণ]। এখানে পুরুষের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা চিরায়ত সত্যের উদ্বোধক, মানবিক পৃথিবীর শান্তির দূত। যেমন, "তাসের দেশের ধ্বংসশেষে চূর্ণ হলে দুর্বুদ্ধির শাঁখের করাত,/পূত প্রাত কালে-লব্ধ ফলাফলে/ প্রয়োজনে বিনারাক্যে মেনে নেবো রাণীর শাসন আমি,/মেনে নেবো প্রজার বরাত" [আবেগের অনুকূলে/পৃথিবীর গৃহকোণ]। কিংবা "ধূসরিত পায়ে-পায়ে বিভীষণ-মানুষের সাথে তোমার মুক্তিযুদ্ধ হলে,/সমষ্টির কাছে তুমি কর্মের মূল্যকে পাবে, আবেগ তোমার হবে।/যুদ্ধ হতে জয়ী হলে তুমি নিরাপদ হবে, হবে অখণ্ড নিখাদ," [ধুলোর চিহ্নে পরিচয়/পৃথিবীর গৃহকোণ]।

এদেশের অনেক সাময়িক কবিদের ভিড়ে কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অঙ্গীকার ও বিশ্বাসের ভূ-ভাগ থেকে চ্যুত না হয়ে অব্যাহত রয়েছেন। তাঁর এগোনো আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হোক—সঙ্গতকারণেই আমাদের এই প্রত্যাশা।

শামসুল আরেফিন

৫

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত

['স্বরবৃত্তে স্বরাঘাত', জয়দুল হোসেন। সাহিত্য একাডেমী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মূল্য ১৬'০০।]

জয়দুল হোসেনের প্রথম বই, ছড়ার সংকলন 'স্বরবৃত্তে স্বরাঘাত'। যখন তাঁর ছড়াকে 'রক্ত দিয়ে গড়া' শিরোনামে নিম্নোক্ত পংক্তিমালায় বিন্যস্ত করেন তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট হয়ঃ

ছড়া ছড়া ছড়া
লিখতে হলে লড়তে চলো
মুক্ত করো ধরা

ছড়া ছড়া ছড়া
বলতে আমি জানি শুধু
জীবন যুদ্ধে লড়া।

এ বইতে ছড়াকার শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর নানা নগ্নচিত্র উন্মোচন করেছেন। যেমন 'টেবিল টেনিস'-এ তিনি তৃতীয় পক্ষ বলতে একদিকে যেমন তৃতীয় বিশ্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তেমনি আবার অন্যদিকে ক্ষমতাবান দুই পক্ষের মাঝে পিষ্ট হওয়া বৃহৎ জনসাধারণকে বুঝিয়েছেন, অন্য ছড়ায়, যাকে তিনি বলেছেন, 'শিলের পাটার ঘষাঘষি'। গ্রন্থভুক্ত ছড়াগুলোর ভঙ্গি ও আবেদন সরল ও প্রত্যক্ষ। শেষ ছড়া 'ডাক'-এ এভাবেই তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম বই বলে তাঁর ওপর পূর্বসুরী কবি ও ছড়াকারদের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য 'পাখি নয়, ক্রীতদাস'-এ তিনি বলে কয়েই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর রচনারীতির অনুসরণ করেছেন। কিন্তু অন্যত্রও এর স্বাক্ষর আছে, যেমন, 'সাম্যের কবি'তে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্পষ্ট প্রভাব।

কবির উৎসাহ ও প্রলোভন অনেকক্ষেত্রে সরলীকরণের মোহ এড়াতে পারেনি। ফলে 'ক্রীতদাসের কাহিনী'তে তিনি চেয়েছেন শাসকের কাছে অনুগত থেকে তাকে আঘাত করার কায়দা শিখতে। অস্ত্রের এই ভুল ব্যবহার ছড়াকারের অতি-সরলীকরণের ফল। একই কারণে বিভিন্ন ধরনের আমলাতন্ত্র সম্পর্কে যতটা ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশিত, এর বস্তুনিষ্ঠ রূপ ততটা তাঁর ছড়ায় চিহ্নিত ও প্রকাশিত হয়নি।

আশা করি, নিয়মিত চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর অস্ত্রকে তিনি শুধু শাণিতই করে তুলবেন না, ভুল ব্যবহারের অপচয় থেকেও তাকে রক্ষা করবেন। কারণ, ছড়ার সূক্ষ্মতা তার ধারকেই তীব্র করে। তবু যথার্থ লক্ষ্যে আঘাতের এই প্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

শান্তনু কায়সার

একুশের সাহিত্য পুরস্কার
১৩৯৫ বাং ১৯৮৯ খ্রীঃ

মুক্তধারা

৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
ফোন ২৩৫৩৩৩/২৩১৩৭৪

সংকলন প্রতিযোগিতা

১৩৯৫ বাং ১৯৮৯ খ্রীঃ ঘোষণা

আমাদের জীবনে মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা সম্ভব করে তুলেছিল।

এই অমর শহীদদের স্মরণে প্রতি বছরই অসংখ্য সাহিত্য সংকলন বেরোয়। এসব সংকলনের ভেতর আমাদের জাতীয় প্রতিভা উন্মেষের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তাকে উৎসাহিত করার জন্য গত কয়েক বছর ধরে একুশের সেরা সংকলনগুলোকে 'মুক্তধারা' পুরস্কার দিয়ে আসচে।

(ক) ১৩৯৫ সালে (১৯৮৯ খ্রীঃ) সংকলনগুলোর পুরস্কারের পরিমাণঃ

প্রথম পুরস্কার টা. ২,৫০০·০০
দ্বিতীয় „ টা. ২,০০০·০০
তৃতীয় „ টা. ১,৫০০·০০

(খ) সংকলনের প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায়।

প্রথম পুরস্কার টা. ১,৫০০·০০
দ্বিতীয় পুরস্কার টা. ১০০০·০০

[প্রত্যেক পুরস্কারের অর্ধেক নগদ টাকায় এবং অর্ধেক 'মুক্তধারা' প্রকাশিত বইয়ে দেওয়া হবে।]

তিন কপি করে সংকলন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৯।

সংকলন প্রতিযোগিতা

১৩৯৪ বাং ১৯৮৮ খ্রীঃ ফল

১৩৯৪ বঙ্গাব্দে (১৯৮৮ খ্রীঃ) পুরস্কারপ্রাপ্ত সংকলন এবং সংকলন সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা।

প্রথম পুরস্কার

দিক
সম্পাদক ঃ মাসুদ আলী খান ও দীপু হাসান
ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় পুরস্কার

অনুভা
সম্পাদক ঃ মৃদুল মৃত্যুঞ্জয় উপেত সাহিত্য পরিবার, ঢাকা

তৃতীয় পুরস্কার

সূচীপত্র
সম্পাদক ঃ সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
বাসা ২০, সড়ক ৪
ব্লক ডি, মিরপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায় পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার

শিল্পী ঃ মুনীর খান
সংকলন ঃ কবিতালাপ
১ টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড
খুলনা

দ্বিতীয় পুরস্কার

শিল্পী ঃ উত্তম সেন
সংকলন ঃ কবিতা সমকালীন
অচিরা, ৪৬ বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, গুটেনবার্গ, চট্টগ্রাম

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

১৩৯৫ বাং ১৯৮৯ খ্রীঃ ঘোষণা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'মুক্তধারা' ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহবান করছে।

ক বিভাগ ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

বিষয় ঃ বাংলাদেশের মূল সমস্যা কি? দারিদ্র্য নাকি বৈষম্য?

খ বিভাগ ঃ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

বিষয় ঃ ভাল বই বলতে কি বুঝি?

গ বিভাগ ঃ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

বিষয় ঃ ইতিহাস পড়ি কেন?

প্রতি বিভাগের জন্যই প্রথম পুরস্কার এক হাজার পাঁচশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার এক হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার আটশ টাকা।

[প্রত্যেক পুরস্কারের অর্ধেক নগদ টাকায় এবং অর্ধেক মুক্তধারা প্রকাশিত বইয়ে দেওয়া হবে]

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বা বিভাগীয় প্রধানের সার্টিফিকেটসহ প্রবন্ধ পৌঁছানোর শেষ তারিখ ঃ ১৫ই শ্রাবণ ১৩৯৬/৩০শে জুলাই ১৯৮৯

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

১৩৯৪ বাং ১৯৮৮ খ্রীঃ ফল

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

প্রথম পুরস্কার

আবদুস সামাদ সোহেল
৫ম বর্ষ এম. বি. বি. এস,
সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ
ঢাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার

দিলরুবা আহমেদ
৩য় বর্ষ লোক প্রশাসন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

তৃতীয় পুরস্কার

কুমার প্রীতীশ বল
সম্মান রসায়ন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

২. মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

প্রথম পুরস্কার

এস. এম. আবদুর রউফ
দ্বাদশ শ্রেণী
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল

দ্বিতীয় পুরস্কার

মোঃ সাইফুল আলম
২য় বর্ষ মানবিক
নটারডেম কলেজ, ঢাকা

তৃতীয় পুরস্কার

এ. বি. এম. জামাল
৪র্থ বর্ষ এম. বি. বি. এস.
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
ময়মনসিংহ

৩. উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

প্রথম পুরস্কার

খুরশিদা সামাদ স্বাতী
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীনী
ধানমণ্ডী সরকারী উচ্চ বালিকা
বিদ্যালয়, ঢাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার

সীমানা শারমীন
সপ্তম শ্রেণী
অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

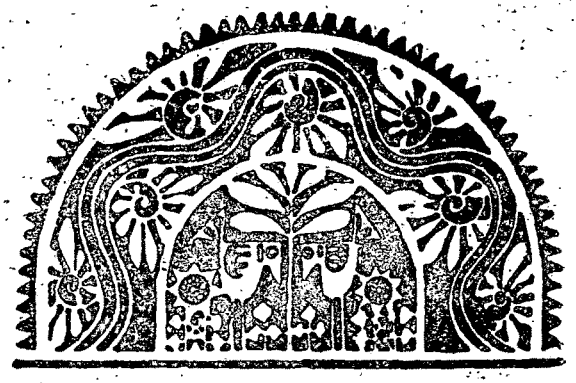

বই কিনুন বই পড়ুন
বই উপহার দিন
পাঠাগার গড়ুন

৭৪ করাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
ফোন ২৩১৩৭৪/২৩৫৩৩৩
বিক্রয়কেন্দ্র ২২ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০
ফোন ২৫৯৮৬৭
চৌমুহনী নোয়াখালী ফোন ৩৯৫১

মুক্তধারা

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

মুখবন্ধ

১৯৭১ সালের ২৮শে মে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে জন্ম হয়েছিল 'মুক্তধারা'র। মুক্তিসংগ্রাম থেকে নামকরণ হয়েছে 'মুক্তধারা'। মুক্তিযুদ্ধ কালে এর আদর্শকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নতির লক্ষ্যে 'মুক্তধারা' গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে দু'বছর বিশেষ কোন বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে কাগজ, কালি, বোর্ড প্রভৃতির মূল্য সর্বাধিক, তদুপরি মুদ্রণ ব্যয় ও বাঁধাইয়ের খরচও বেড়েছে দারুণভাবে। তবু এ পর্যন্ত 'মুক্তধারা' থেকে এক হাজার চারশ বই প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের শ্রেণী বিভাগের কথা বিবেচনা করে বড়দের এবং শিশু-কিশোরদের জন্য আলাদা আলাদা পুস্তক-তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

অতি পরিচিত ও অল্প পরিচিত, প্রখ্যাত এবং নবীন, প্রবীণ এবং প্রৌঢ়—এক কথায় সকল শ্রেণীর লেখকের বই প্রকাশ করে চলেছে 'মুক্তধারা'।

'মুক্তধারা' শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বই প্রকাশের বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে এবং এ পর্যন্ত তিনশর বেশি বই প্রকাশ করেছে।

উচ্চতর পর্যায়ে পঠন-পাঠনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সমালোচনা, গবেষণা সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রকাশের আরও একটি পরিকল্পনা 'মুক্তধারা' গ্রহণ করেছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক বই বের হয়েছে।

'মুক্তধারা' শুধু বই প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি। সারাদেশে পোস্টার, বিজ্ঞাপন এবং টিনপ্লেট বিলি ও মাইকে প্রচারের মাধ্যমে বই পড়া, পাঠ্যাভ্যাস গঠন ও পাঠাগার সৃষ্টির একটি সুস্থ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছে। কারণ পাঠমনস্কতা ও পাঠাগার সৃষ্টি না হলে প্রকাশনা শিল্প সত্যিকারের ভিত্তির উপরে দাঁড়াতে পারে না।

'মুক্তধারা' এখনো একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং এর অভিজ্ঞতাও সীমিত। এ প্রতিষ্ঠানের বয়স মাত্র সতের বছর। সঙ্গত কারণে 'মুক্তধারা' সকল শ্রেণীর স্বাগরিক ও সংগঠনের সহযোগিতা কামনা করে। পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে যে-কোনো প্রকার পরামর্শ ও সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

চিত্তরঞ্জন সাহা
প্রধান পরিচালক

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমালোচনা সাহিত্য	৭১৪
(ক) মধুসূদন বিষয়ক	৭১৫
(খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিষয়ক	৭১৫
(গ) রবীন্দ্র বিষয়ক	৭১৫
(ঘ) নজরুল বিষয়ক	৭১৫
(ঙ) জীবনানন্দ বিষয়ক	৭১৬
প্রবন্ধ সাহিত্য	৬১৬
(ক) সাধারণ	৭১৬
(খ) স্মারক গ্রন্থ	৭১৭
(গ) লোকসাহিত্য	৭১৭
(ঘ) ইতিহাস	৭১৭
(ঙ) রাজনীতি	৭১৭
(চ) অর্থনীতি	৭১৮
(ছ) দর্শন	৭১৮
(জ) চিত্রকলা	৭১৮
(ঝ) সমাজবিজ্ঞান	৭১৯
(ঞ) সাধারণ জ্ঞান	৭১৯
বিজ্ঞান	৭১৯
চিকিৎসা বিজ্ঞান	৭২০
জীবনী আত্মজীবনী	৭২০
উপন্যাস	৭২১
ছোটগল্প	৭২৫
কাব্য-গ্রন্থ	৭২৮
নাটক	৭৩০
স্মৃতি-চারণ	৭৩২
রম্য-রচনা	৭৩২
অনুবাদ সাহিত্য	৭৩৩
(ক) ছোটগল্প	৭৩৩
(খ) কাব্যগ্রন্থ	৭৩৪
(গ) উপন্যাস	৭৩৪
(ঘ) নাটক	৭৩৬
রচনাবলী	৭৩৭
রোজনামচা	৭৩৭
ক্লাসিক সাহিত্য	৭৩৭
ভ্রমণ-কাহিনী	৭৩৮
শিকার কাহিনী	৭৩৮
মুক্তিযুদ্ধের বই	৭৩৯
পত্র সাহিত্য	৭৩৯
কোষগ্রন্থ	৭৪০
অদৃশ্য প্যাকেট	৭৪০

মুক্তধারার বই

প্রমালোচনা সাহিত্য

	মূল্য লেখকপ্রিন্ট	নিউজপ্রিন্ট সাদা
বিশ্বসাহিত্য (৩য় সং)—মোবাশ্বের আলী '৮৩	৬০·০০	৭৫·০০
বঙ্কিম-চর্চা—নারায়ণ চৌধুরী '৮৭	২৫·০০	৩৫·০০
শরৎ-চর্চা—নারায়ণ চৌধুরী '৮৭	৩৮·০০	৫২·০০
রবীন্দ্রচর্চা—নারায়ণ চৌধুরী '৮৭	৪৫·০০	৬০·০০
ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ—মনসুর মুসা '৮৪	১৮·০০	২৮·০০
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—১ম খণ্ড (৩য় সং) '৮৬ —গোপাল হালদার	৩২·০০	৫০·০০
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—২য় খণ্ড (৩য় সং) —গোপাল হালদার '৮৭	৪০·০০	৫৫·০০
বাংলা উপন্যাসে বিধবা (২য় সং)—খোন্দকার রেজাউল করীম	৩৫·০০	৫০·০০
বঙ্কিম সাহিত্য পরিক্রমা—রশীদ-আল-ফারুকী সম্পাদিত		৫০·০০
আধুনিক আরবী সাহিত্য—আবদুস সাত্তার		১৫·০০
কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা—মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ		১৪·০০
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ		২১·০০
মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (২য় সং)—আনিসুজ্জামান		৬০·০০
ছন্দ সমীক্ষণ—আবদুল কাদির		৩৫·০০
প্রতিক্রিয়াশীলতা : আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য (২য় সং) —সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী		৫·০০
হাউসম্যানের কাব্যের স্বভাব (২য় সং)—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	১৭·০০	২৫·০০
সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২য় সং)—আবুল ফজল '৮৪	১৮·০০	২৮·০০
নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ—জিয়া হায়দার		১৫·০০
মনীষা মঞ্জুষা—৩য় খণ্ড—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক '৮৪		৬০·০০

সমালোচনা সাহিত্য

	লেবকপ্রিণ্ট/নিউজপ্রিণ্ট	মূল্য সাদা
সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ (২য় সং)—আবদুল হক		১৬·০০
কথা ও কবিতা—আবু হেনা মোস্তফা কামাল	১৪·০০	২১·০০
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পাঠের ভূমিকা—নীলিমা ইব্রাহিম '৮৬	২৫·০০	৩৭·০০
মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহমদ —আবু জাফর শামসুদ্দিন '৮৮	১৫·০০	২০·০০
কবিতায় বাক প্রতিমা—বিপ্রদাশ বড়ুয়া		১৬·০০
সাহিত্য ও ঐতিহ্য—গোলাম সামদানী কোরায়শী		১০·০০

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ বিষয়ক

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্য-জিজ্ঞাসা—তানভীর মোকাম্মেল '৮৭	৩২·০০	৪৫·০০
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ—আবদুল মান্নান সৈয়দ '৮৬	৩০·০০	৪০·০০

মধুসূদন বিষয়ক

মধুসূদন ও নবজাগৃতি (৪র্থ সং)—মোবাশ্বের আলী '৮৬	৫০·০০	৭০·০০

রবীন্দ্র বিষয়ক

রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক (২য় সং)—আহমদ কবির '৮৬	২৪·০০	৩২·০০
ফুলের বন্ধন (৩য় সং)—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী '৮৬	১৫·০০	
রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (২য় সং)—আবুল ফজল		১২·০০
রবিচ্ছবি—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত	৫২·০০	৩০·০০
রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প—সিদ্দিকা মাহমুদা		২১·০০

নজরুল বিষয়ক

নজরুল কাব্য সমীক্ষা (৩য় সং)—আতাউর রহমান '৮৭	৩০·০০	৪০·০০
কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন—মুহম্মদ জাহাঙ্গীর '৮৭		২০·০০
কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা (৩য় সং)—মুজফ্ফর আহ্মদ '৮৮	৬৫·০০	৮৫·০০
নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী		
গুল ইংরেজী থেকে অনুবাদ : আফজালুল বাসার	২৭·০০	৩৭·০০

জীবনানন্দ বিষয়ক

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/বিউজপ্রিন্ট	সাদা
জীবনানন্দ—আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত '৮৭		১০০.০০

প্রবন্ধ সাহিত্য

সাধারণ

শ্রেণী সময় ও সাহিত্য—ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী '৮৬	৩৩.০০	৪৫.০০
আমার পিতার মুখ (২য় সং)—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী '৮৫	২০.০০	২৮.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ ২য় খণ্ড—আবদুল মান্নান সৈয়দ '৮৭	৩৫.০০	৫০.০০
বিষয় : নাটক—রামেন্দু মজুমদার '৮৭	২৫.০০	৩৫.০০
বাংলাদেশের নাট্যচর্চা—রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত '৮৬	৫২.০০	৭০.০০
বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান—বেগম জাহান আরা '৮৬		৩৫.০০
এক ও অনেক—খান মোহাম্মদ ফারাবী '৮৬	২৭.০০	৪০.০০
বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি—আহমদ রফিক '৮৬	২৪.০০	৩২.০০
বাংলার কথা—বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন '৮৬	১৬.০০	২২.০০
ইদানীং আমরা—ডঃ আহমদ শরীফ '৮৬	৩৪.০০	৪৫.০০
কালের দর্পণে স্বদেশ—ডঃ আহমদ শরীফ '৮৫	২৭.০০	৩৭.০০
মূল্যবোধের অবক্ষয় : আপেক্ষিকতার আলোকে—আবুল কাশেম চৌধুরী '৮৬		২৫.০০
চেতনাধারায় এসো—ওয়াহিদুল হক '৮৫	৩৬.০০	৫০.০০
লেভ্ তলস্তোয়—আফ্রো এশীয় লেখক ইউনিয়ন '৮৫	৭০.০০	৯০.০০
সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা—যতীন সরকার '৮৫	৩৫.০০	৫০.০০
ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব (২য় সং)—আবদুল হক '৮৪	৯.০০	১৩.০০
বিশুদ্ধ চিন্তা—কায়সার সেলিম '৮৭		২৫.০০
কালের সমুখ ভেলা—নূরুন্নাহার ফয়জননেসা সম্পাদিত '৮৮	৫৫.০০	৭৫.০০
গ্রন্থ উন্নয়ন—গোলাম মঈনউদ্দিন '৮৮	৪৫.০০	৬০.০০
যুদ্ধ ও মানুষের মূর্খতা—সৈয়দ আবুল মকসুদ '৮৮	৪৮.০০	৬৫.০০
উপমহাদেশে কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি—দেবেন সিকদার '৮৮	৩৭.০০	৪৮.০০

স্মারক গ্রন্থ

	মূল্য	
	লেখকপ্রিণ্ট/নিউজপ্রিণ্ট	সাদা
আবুল ফজল : ব্যক্তি স্বরূপ ও সাধনা—আবুল হাসনাত সম্পাদিত '৮৭	৫০.০০	৭০.০০

লোকসাহিত্য

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস—আশরাফ সিদ্দিকী '৮৭	২৫.০০
লোক-সাহিত্য—১ম খণ্ড (৩য় সং)—আশরাফ সিদ্দিকী '৮৭	৭০.০০
লোক-সাহিত্য—২য় খণ্ড (২য় সং)—আশরাফ সিদ্দিকী	৪০.০০
আবহমান বাংলা—আশরাফ সিদ্দিকী '৮৭	৩০.০০

ইতিহাস

ইতিহাস সন্ধান—সৈয়দ আমীরুল ইসলাম '৮৮	৪৫.০০	৬০.০০
কান্তজীর মন্দির—মেহরাব আলী		৫০.০০
বাংলাদেশের সন্ধানে—মোবাশ্বের আলী '৮৬	৫০.০০	৭০.০০
নানকার বিদ্রোহ—১ম খণ্ড (২য় সং)—অজয় ভট্টাচার্য '৮৬	৩২.০০	৪৮.০০
নানকার বিদ্রোহ ২য় খণ্ড (২য় সং)—অজয় ভট্টাচার্য '৮৮	৭০.০০	৯৫.০০
নানকার বিদ্রোহ (৩য় খণ্ড)—অজয় ভট্টাচার্য	৩৭.০০	৫০.০০
ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি—সুকান্ত একাডেমী সম্পাদিত '৮৫	২০.০০	২৮.০০
বাঙালীর ইতিহাস—সুভাষ মুখোপাধ্যায়	২৮.০০	৪০.০০
মহাবিদ্রোহের কাহিনী—সত্যেন সেন	১৭.০০	২৫.০০
পলাশীর যুদ্ধ—সত্যেন সেন	৫.৫০	৯.০০

রাজনীতি

মার্কস ও তাঁর দ্বন্দ্ববাদ—আবদুল মতিন খান '৮৭	৫.০০	
বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক —বদরুদ্দীন উমর '৮৫	২৮.০০	৩৮.০০

রাজনীতি

	মূল্য	
	লেখকপ্রিণ্ট/নিউজপ্রিণ্ট	সাদা
সংস্কৃতির সংকট (৪র্থ সং)—বদরুদ্দীন উমর '৮৪	১৮·০০	২৫·০০
বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা (২য় সং)—বদরুদ্দীন উমর '৮৩	১৭·০০	২৫·০০
যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ (৪র্থ সং)—বদরুদ্দীন উমর '৮৭	৬৫·০০	৯০·০০
যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ (৪র্থ সং)—বদরুদ্দীন উমর	৩৭·০০	৫০·০০
Towards the Emergency Rule in Bangladesh —Badruddin Umar	৩০·০০	৬০·০০
রাজনীতি কি ও কেন—অজয় রায় '৮৬	১৭·০০	২৫·০০
সমকালীন চিন্তা (২য় সং)—আবুল ফজল	১৫·০০	২২·০০
ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান—শান্তিময় রায় '৮৮	২৪·০০	৩২·০০
বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সমাজ—প্রেমেন আড্ ডি ইবনে আজাদ ভাষান্তর—আনোয়ারুল হক	২৪·০০	৩৩·০০
বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (৩য় সং)—আহমদ ছফা	২০·০০	৩০·০০

অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি : সংকটের স্বরূপ—ডঃ আবদুল গফুর সম্পাদিত '৮৭	৩৮·০০	৫৫·০০
পুঁজিবাদী অর্থনীতি—অজয় রায় '৮৬	৩২·০০	৪৮·০০

দর্শন

কল্যাণ দর্শন—সাইদুর রহমান '৮৭	১৮·০০	২৫·০০
দর্শনের দারিদ্র—আলাউদ্দিন আহমেদ '৮৭	৪২·০০	৬০·০০

চিত্রকলা

শিল্পী দর্শক ও সমালোচক (২য় সং)—আবুল মনসুর '৮৭	২৮·০০	৪২·০০

সমাজ বিজ্ঞান

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
তত্ত্ববুদ্ধি (৩য় সং)—আবুল ফজল '৮৫	৩০.০০	৪০.০০
মানবতন্ত্র (৩য় সং)—আবুল ফজল		১০.০০
বাংলার রেনেসাঁস—অন্নদাশঙ্কর রায় '৮৪	১৪.০০	২১.০০
সংস্কৃতির রূপান্তর (২য় সং)—গোপাল হালদার '৮৪	৪০.০০	৬০.০০
সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব—বুলবন ওসমান		৯.০০
আমাদের জাতীয়তা বিকাশের ধারা—অজয় রায়		৬.০০
নিরাশ্রয় গৃহী ও অন্যান্য প্রবন্ধ (২য় সং)—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী '৮৪	২২.০০	৩০.০০
শতাব্দীর অন্ধকারে (২য় সং)—ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম '৮৬	২০.০০	২৭.০০
সাম্প্রদায়িকতা (৫ম সং)—বদরুদ্দীন উমর '৮৭	২২.০০	৩২.০০
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (৩য় সং)—বদরুদ্দীন উমর	১১.০০	১৭.০০
অপরাধ বিজ্ঞান (২য় সং)—হামজা হোসেন '৮৭	৫৫.০০	৭৫.০০

সাধারণ জ্ঞান

অচেতন বিস্ময়—খোন্দকার রেজাউল করিম '৮৭	৩০.০০	৪০.০০

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান আন্দোলন—আলী আসগর '৮৯	৩০.০০	৪০.০০
এ যুগের বিজ্ঞান (২য় সং)—আবদুল্লাহ আল-মুতী '৮৮	৪৫.০০	৬০.০০
বাংলাদেশে বিজ্ঞান চিন্তা—আবদুল্লাহ আল-মুতী সম্পাদিত '৮৮		১০০.০০
পুরুষের যৌন সমস্যা ও চিকিৎসা—ডাঃ জে. বি. এম. জাফর সাদেক	৩২.০০	৪২.০০
বাংলাদেশের বানর নরবানর—ডঃ রেজা খান '৮৭		৯০.০০
বিচিত্র যত পদার্থ (২য় সং)—আবদুল হক খন্দকার '৮৭	৪০.০০	৫৭.০০
মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়—ভবেশ রায় '৮৭	৩০.০০	৪৫.০০
সাগর তলে যারা চলে—ভবেশ রায় '৮৭	৩৫.০০	৫০.০০
বিজ্ঞান চর্চা : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ—সুব্রত বড়ুয়া '৮৭	১৭.০০	২৫.০০
বিজ্ঞানের ইতিকথা : সন্ধানী মানুষ—সুব্রত বড়ুয়া '৮৬	৩০.০০	৪০.০০
দেখা আলো না দেখা রূপ—মুহম্মদ জাফর ইকবাল '৮৬	২৫.০০	৩৭.০০

বিজ্ঞান

	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	মূল্য সাদা
পরমাণুর রাজ্যে—এ. এইচ. এম. হাবিবুল ইসলাম '৮৬	৪৫.০০	৬০.০০
বিজ্ঞান বর্ণালী (২য় সং)—মুহাম্মদ ইব্রাহীম '৮৭	২০.০০	৩০.০০
শিক্ষা বিজ্ঞান দর্শন (২য় সং)—মুহাম্মদ ইব্রাহীম '৮৫	৩৩.০০	৪৫.০০
পুষ্টি পরিচয়—বাদল, চন্দ্র সাহা		৫.০০
বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী (২য় সং)—মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী	৫২.০০	৭২.০০
বিচিত্র বিজ্ঞান ও পরমাণু জগৎ (২য় সং)—স্বপন কুমার গায়েন '৮৪	২৫.০০	৩৫.০০
মানুষের জন্য বিজ্ঞান (৩য় সং)—তপন চক্রবর্তী '৮৮	৩০.০০	৪০.০০

চিকিৎসা বিজ্ঞান

প্রাথমিক চিকিৎসা পরিচর্যা ও পুষ্টি—ডঃ এস. খলিলউল্লাহ '৮৬	২৫.০০	৩৫.০০
মুখ ও দাঁতের সাধারণ রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধ (৩য় সং) —ডাঃ মোহাম্মদ ইমাদুল হক '৮৬	২৭.০০	৩৬.০০
বিচিত্র স্বাস্থ্য—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী '৮৮	৩২.০০	৪৫.০০
আপনার কুশল (১ম খণ্ড)—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী '৮৫	২২.০০	৩০.০০
আপনার কুশল (২য় খণ্ড)—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী '৮৬	১৮.০০	২৫.০০
আপনার কুশল (৩য় সং)—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী '৮৬	৩৩.০০	৪৫.০০
আপনার কুশল (৪র্থ খণ্ড)—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী '৮৭	৩০.০০	৪৫.০০
আপনার কুশল (৫ম খণ্ড)—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী '৮৮	৩২.০০	৪৫.০০
স্বাস্থ্য বিচিত্রা—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী '৮৮	২৪.০০	৩২.০০
মনের এ দুয়ারটুকু—ডাঃ শুভাগত চৌধুরী '৮৫	২০.০০	২৮.০০
ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী—আবদুল হক খন্দকার '৮৫	৩৬.০০	৪৮.০০
পুরুষের যৌন সমস্যা ও চিকিৎসা— ডাঃ জে. বি. এম. জাফর সাদেক '৮৮	৩২.০০	৪২.০০
আরো বেশি দিন বাঁচুন—ডাঃ বরেন চক্রবর্তী '৮৯	৩০.০০	৪০.০০
চিকিৎসা বিজ্ঞানের মজার কথা—এ. বি. এম. জামাল '৮৯	২৪.০০	৩৫.০০

জীবনী/আত্মজীবনী

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
গাফ্ফার খানের আত্মজীবনী—সলিমুল্লাহ '৮৭	৩৭.০০	৫২.০০
সঙ্গীত গুণীজন—মোবারক হোসেন খান '৮৬	৩০.০০	৪০.০০
খানের রাজা হাসান রাজা—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত '৮৫	১১.০০	১৬.০০
গল্পে ফজলুল হক—(২য় সং)—ইবরাহীম খাঁ	১৪.০০	২০.০০
শেক্সপীয়র জীবনী (২য় সং)—সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত '৮৫	৮.০০	১৪.০০
সেরা গুপ্তচর কাহিনী (২য় সং)—আবদুল মতীন জালালাবাদী '৮৬	৩০.০০	
এক শতাব্দী (২য় সং)—খোন্দকার খালেক	৪৫.০০	৬৫.০০

উপন্যাস

সংশপ্তক (৬ষ্ঠ সং)—শহীদুল্লাহ কায়সার '৮৮	৯৫.০০	১৩০.০০
নদী নির্জন নীল—সুচরিত চৌধুরী '৮৭	৫০.০০	৭৫.০০
বন্দরে জাহাজে সাগরে—ইউসুফ হায়দার '৮৭	৯৫.০০	১৩৫.০০
দ্বীপ অনামিকা (২য় সং)—ইউসুফ হায়দার '৮৪	২২.০০	৩৫.০০
কাশবনের কন্যা—শামসুদ্দীন আবুল কালাম '৮৭	৫৫.০০	৭৫.০০
নবান্ন—শামসুদ্দীন আবুল কালাম '৮৭	২২.০০	৩২.০০
সমুদ্র বাসর—শামসুদ্দীন আবুল কালাম '৮৬	৫৫.০০	৭৫.০০
যার সাথে যার—শামসুদ্দীন আবুল কালাম '৮৬	৩২.০০	৪৮.০০
মনের মত ঠাঁই—শামসুদ্দীন আবুল কালাম '৮৫	১৬.০০	২২.০০
আগামীদিনের গল্প—মঈনুল আহসান সাবের '৮৭	৩৩.০০	৫০.০০
আদমের জন্য অপেক্ষা—মঈনুল আহসান সাবের '৮৬	১৭.০০	২৩.০০
ভালোবাসার পাঁচ পা—সৈয়দ ইকবাল '৮৭	২২.০০	৩০.০০
উজানে যায় ভাটিতে যায়—আহমেদ মুসা '৮৭	১৭.০০	২৪.০০
মহানদী নিরবধি—মীর আবুল হোসেন '৮৭		২৫.০০
অভিশপ্ত নগরী (৩য় সং)—সত্যেন সেন '৮৭	৩২.০০	৪৮.০০
পাপের সন্তান (৩য় সং)—সত্যেন সেন '৮৭	৫৪.০০	৭৬.০০
পুরুষমেধ (৩য় সং)—সত্যেন সেন '৮৭	৫৫.০০	৭৫.০০
আলবেরুনী (৩য় সং)—সত্যেন সেন '৮৭	৪০.০০	৬০.০০

উপন্যাস

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
পূর্ণগ্রাস—রেজোয়ান সিদ্দিকী '৮৮	২৫·০০	৩৫·০০
শূন্যতায় হাত—রেজোয়ান সিদ্দিকী '৮৬	১৮·০০	২৭·০০
ধরাদাহ—আবুবকর সিদ্দিক '৮৬	৩০·০০	৪৫·০০
জলরাক্ষস—আবুবকর সিদ্দিক '৮৫	২২·০০	৩০·০০
সামনে নতুন দিন (২য় সং)—আবু রুশ্‌দ্‌	৪৫·০০	৬৫·০০
অনিশ্চিত রাগ্বিণী (২য় সং)—আবু রুশ্‌দ্‌ '৮৭	২৭·০০	৩৮·০০
স্বর্গিত দ্বীপ—আবু রুশ্‌দ্‌ '৮৫	১৭·০০	২৪·০০
ডোবা হল দীঘি—আবু রুশ্‌দ্‌		২২·০০
কলকাতার কাছেই—গজেন্দ্রকুমার মিত্র '৮৬	৪৫·০০	৬০·০০
উপকণ্ঠে—গজেন্দ্র কুমার মিত্র '৮৮	৭৫·০০	১০০·০০
পরাজয়—হাবীবুল্লাহ সিরাজী '৮৮	৩৭·০০	৫০·০০
শুধু তোমাদের জন্য—রিজিয়া রহমান '৮৮	১৮·০০	২৫·০০
একটি ফুলের জন্য—রিজিয়া রহমান '৮৬	২৬·০০	৩৫·০০
প্রেম আমার প্রেম—রিজিয়া রহমান '৮৫	১৮·০০	২৪·০০
বং থেকে বাংলা (২য় সং)—রিজিয়া রহমান '৮৫	৫০·০০	৬৫·০০
অলিখিত উপাখ্যান (২য় সং)—রিজিয়া রহমান '৮৫	১৮·০০	২৪·০০
একাল চিরকাল—রিজিয়া রহমান '৮৪	২০·০০	৩০·০০
রক্তের অক্ষর (২য় সং)—রিজিয়া রহমান '৮৪	১৬·০০	২২·০০
ধবল জ্যোৎস্না—রিজিয়া রহমান		১৫·০০
শিলায় শিলায় আগুন (২য় সং)—রিজিয়া রহমান '৮৬	২২·০০	৩০·০০
সূর্য সবুজ রক্ত—রিজিয়া রহমান		২২·০০
দেশান্তর—নির্মলেন্দু গুণ '৮৪	১৫·০০	২২·০০
পরাবর্তন (২য় সং)—আবুল ফজল '৮৫	২৮·০০	৩৮·০০
সামনে সময় (২য় সং)—নাজমা জেসমিন চৌধুরী '৮৬	২০·০০	২৮·০০
ঘরের ছায়া—নাজমা জেসমিন চৌধুরী '৮৪	১৬·০০	২২·০০
অমল ধবল চাকরি—রাহাত খান (২য় সং) '৮৭	২০·০০	৩০·০০

উপন্যাস

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
কদম আলিদের বাড়ি—সরদার জয়েনউদ্দীন '৮৯	২৪·০০	৩২·০০
ফিরে চলো—মিরজা আবদুল হাই		১৯·০০
তোমার পতাকা—মিরজা আবদুল হাই '৮৪	২৭·০০	৪০·০০
যমনিস সংবাদ—মিরজা আবদুল হাই '৮৪	১৯·০০	২৭·০০
প্রেম একটি লাল গোলাপ (৪র্থ সং)—রশীদ করীম '৮৬	৩০·০০	৪০·০০
আমার ঘত গ্লানি (২য় সং)—রশীদ করীম '৮৬	৫০·০০	৬৫·০০
উত্তম পুরুষ (৪র্থ সং)—রশীদ করীম '৮৫	৩৫·০০	৫৫·০০
প্রসন্ন পাষাণ (২য় সং)—রশীদ করীম '৮৫	৪০·০০	৫০·০০
বড়ই নিঃসঙ্গ—রশীদ করীম '৮৫	১৭·০০	২৫·০০
সোনার পাথর বাটী—রশীদ করীম '৮৪	১০·০০	১৫·০০
সাধারণ লোকের কাহিনী—রশীদ করীম	১৫·০০	২২·০০
একালের রূপকথা—রশীদ করীম		১২·০০
শঙ্খ করাত—দিলারা হাশেম '৮৯	৩০·০০	৪০·০০
সিন্ধুপারের উপাখ্যান—দিলারা হাশেম '৮৭	১৮·০০	২৫·০০
মিউর‍্যাল—দিলারা হাশেম '৮৬	২৭·০০	৪০·০০
আমলকীর মৌ (২য় সং)—দিলারা হাশেম '৮৫	৫৫·০০	৭৫·০০
কাকতালীয়—দিলারা হাশেম '৮৫	৬০·০০	৮০·০০
স্তব্ধতার কানে কানে (২য় সং)—দিলারা হাশেম '৮৪	২২·০০	৩০·০০
নায়ক—দিলারা হাশেম		২২·০০
বাদামী বিকেলের গল্প—দিলারা হাশেম		২৫·০০
যাপিত জীবন—সেলিনা হোসেন '৮৮	৫০·০০	৭০·০০
হাঙর নদী গ্রেনেড (২য় সং)—সেলিনা হোসেন '৮৮	২২·০০	৩০·০০
মগ্ন চৈতন্যে শিস (২য় সং)—সেলিনা হোসেন '৮৬	৩৬·০০	৪৮·০০
জলোচ্ছ্বাস (২য় সং)—সেলিনা হোসেন '৮৯	৪৫·০০	৬০·০০
তিমি (২য় সং)—হাসনাত আবদুল হাই '৮৫	২০·০০	২৮·০০
প্রভু—হাসনাত আবদুল হাই '৮৬	১৬·০০	২২·০০
যুবরাজ—হাসনাত আবদুল হাই '৮৫	১২·০০	১৬·০০
আমার আততায়ী—হাসনাত আবদুল হাই	৪·৫০	৮·০০

মুক্তধারার বই ১২৩

উপন্যাস

	মূল্য	
	লেখকপ্রিণ্ট/নিউজপ্রিণ্ট	সাদা
অন্ধকূপে জন্মোৎসব—হরিপদ দত্ত '৮৭	৩০·০০	৪৫·০০
ঈশানে অগ্নিদাহ—হরিপদ দত্ত '৮৬	১৬·০০	২২·০০
নগ্ন আগন্তুক—মঞ্জু সরকার '৮৬	২০·০০	২৭·০০
পদ্মার পলিদ্বীপ—আবু ইসহাক '৮৬	৬০·০০	৮০·০০
ফেরারী—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন '৮৭	৩২·০০	৪৫·০০
ঝর্ণা ঝরে রে—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন '৮৬	১৮·০০	২৪·০০
চর আতরজান—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন '৮৫	১৬·০০	২২·০০
বাতাসীর প্রেমকথা—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন '৮৪	১৩·০০	১৮·০০
দক্ষিণায়নের দিন—শওকত আলী '৮৫	৩০·০০	৪৫·০০
ফুলায়ে কালস্রোত—শওকত আলী '৮৬	৩২·০০	৪৫·০০
পূর্বরাত্রি পূর্বদিন—শওকত আলী '৮৬	৩০·০০	৪০·০০
আজো কাঁদে ডাহুকী—মনোয়ারা নজমুল '৮৬	৭২·০০	৯০·০০
শতর্পণি—ফাতেমা বারী	২৫·০০	৪০·০০
আধুরের পরে—বদরুন্নেসা আবদুল্লা '৮৪	৩০·০০	৪২·০০
এইখানে কখনো—শহীদ আখন্দ '৮৫	২৬·০০	৩৬·০০
পলাশ ও শিমুলের গল্প—মাহবুব তালুকদার '৮৮	২০·০০	২৭·০০
অপলাপ—মাহবুব তালুকদার '৮৫	২৩·০০	৩২·০০
আরেকজন আমি—মাহবুব তালুকদার '৮৭	১৮·০০	২৫·০০
কর্ণফুলী (৪র্থ সং)—আলাউদ্দিন আল আজাদ '৮৫	২০·০০	২৮·০০
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (৫ম সং)—আলাউদ্দিন আল আজাদ '৮৪	১৩·০০	২২·০০
যাবজ্জীবন—ইমদাদুল হক মিলন	১৮·০০	২৮·০০
অরণ্যানী—অজয় ভট্টাচার্য	১৬·০০	২২·০০
বাতাসীর মা—অজয় ভট্টাচার্য '৮৫	৩২·০০	৪২·০০
কুলিমেম—অজয় ভট্টাচার্য '৮৫	৩৫·০০	৪৮·০০
ইস্পাত প্রত্যয়—তাসাদ্দুক হোসেন		২৪·০০
মহুয়ার দেশে (২য় সং)—তাসাদ্দুক হোসেন '৮৪	২৮·০০	৪২·০০
সুদূরের রংধনু—আজিজুর রহমান আজিজ '৮৬	২৬·০০	৩৫·০০

উপন্যাস

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
গ্রহণের দিন—সুব্রত বড়ুয়া '৮৫	১৪·০০	২০·০০
ক্রীতদাসের হাসি (৮ম সং)—শওকত ওসমান '৮৬	৩০·০০	৪০·০০
জাহান্নম হইতে বিদায় (২য় সং)—শওকত ওসমান	২৫·০০	৩৬·০০
রূপে অরূপে ম্যাডোনা—হাসনা বেগম '৮৭		১৫·০০
অর্ধসত্য—মাহবুবব হাসান '৮৮	২৭০০	৩৬·০০
তোমার জন্য—নাজমা তাশমীন '৮৮	২৮·০০	৩৮·০০
সব পাখি আসে—আবু কায়সার '৮৮	২২·০০	৩০·০০
ভয় ভালোবাসা নির্বাসন—বিপ্রদাস বড়ুয়া '৮৮	৩৩·০০	৪৫·০০
তুমি আছো বলে—ফরিদা রহমান '৮৮	৪২·০০	৫৫·০০
থই ভরা বাদর মাহ ভাদর—রাবেয়া খাতুন '৮৮	৪৫·০০	৬০·০০
প্লাবন এবং একজন—হাসেন উদ্দীন হোসেন		১০·০০
কদম আলিদের বাড়ি—সরদার জয়েনউদ্দিন '৮৮	২৬·০০	৩৫·০০

ছোটগল্প

পুঁই ডালিমের কাবা—শামসুদ্দীন আবুল কালাম '৮৭	৩২·০০	৪৫·০০
অজাগাঙের গান—সামসুদ্দীন আবুল কালাম '৮৭	২২·০০	৩০·০০
নির্বাচিত গল্প—সুচরিত চৌধুরী '৮৭	৪৮·০০	৭০·০০
রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা (২য় সং)—আবু জাফর শামসুদ্দীন '৮৮	৪২·০০	৫৫·০০
নির্বাচিত গল্প—আবু জাফর শামসুদ্দীন '৮৮	৩৬·০০	৪৮·০০
হারেম (৩য় সং)—আবু ইসহাক '৮৭	৩০·০০	৪০·০০
তখন—রশীদ হায়দার '৮৭	২৫·০০	৩৫·০০
আমার প্রেমের গল্প—রশীদ হায়দার '৮৮	৩৩·০০	৪৫·০০
খাঁচায় (২য় সং)—রশীদ হায়দার	২৫·০০	৩৬·০০
চয়ন—সাদেকা শফিউল্লাহ '৮৭	৩২·০০	৪৫·০০
নির্বাচিত গল্প—রিজিয়া রহমান '৮৭	৩৫·০০	৫০·০০
নির্বাচিত গল্প—আবদুল মান্নান সৈয়দ '৮৭	৩২·০০	৪৫·০০

ছোটগল্প

	মূল্য	
	লেখকপ্রিণ্ট/নিউজপ্রিণ্ট	সাদা
মনোনীত গল্প—আলাউদ্দিন আল আজাদ '৮৭	৩৮·০০	৫৫·০০
নির্বাচিত গল্প—আলাউদ্দিন আল আজাদ '৮৫	২৮·০০	৪০·০০
নদীর নাম গণতন্ত্র—বিপ্রদাশ বড়ুয়া '৮৭	২৭·০০	৩৮·০০
বাঙচিল—বিপ্রদাস বড়ুয়া '৮৬	২২·০০	৩০·০০
যুদ্ধ জয়ের গল্প—বিপ্রদাস বড়ুয়া	১৮·০০	২৫·০০
শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রাণপাখি—শান্তনু কায়সার '৮৭	২০·০০	৩০·০০
দুই নায়ক (২য় সং)—সাইফুল ইসলাম '৮৭	২৮·০০	৪০·০০
জিবরাইলের ডানা (৪র্থ সং)—শাহেদ আলী '৮৭	২৮·০০	৪৫·০০
পঞ্চহরির শেষ বিবাহ—বিপ্লব দাস '৮৬	২৪·০০	৩২·০০
একদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গল্প—সৈয়দ ইকবাল '৮৬	১৬·০০	২২·০০
ফিরে যাওয়া—সৈয়দ ইকবাল	১১·০০	১৫·০০
শাড়ী বাড়ী গাড়ী (৩য় সং)—আবু রুশদ্ '৮৬	৩৩·০০	৪৫·০০
মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—আবু রুশদ্ '৮৫	১৮·০০	২৫·০০
স্বনির্বাচিত গল্প—আবু রুশদ্ '৮৪		২২·০০
নির্বাচিত গল্প—শওকত ওসমান '৮৪	২২·০০	৩০·০০
জন্ম যদি তব বঙ্গে (২য় সং)—শওকত ওসমান '৮৪	১৫·০০	২২·০০
নির্বাচিত প্রেমের গল্প—আবুল খায়ের মুসলেউদ্দিন—'৮৮	৫০·০০	৭০·০০
নিষিদ্ধ শহর—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন '৮৫	২২·০০	৩২·০০
নির্বাচিত গল্প—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন '৮৫	৩২·০০	৪৫·০০
নেপথ্য নাটক—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	১১·০০	১৫·০০
মল খাগড়ার সাপ—আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	১৪·০০	২০·০০
মেঘ কেটে গেলে—নাজমা জেসমিন চৌধুরী '৮৯	২৫·০০	৩৫·০০
অন্য নায়ক—নাজমা জেসমিন চৌধুরী '৮৫	২৬·০০	৩৫·০০
একটি পুরাতন উদি—হরিপদ দত্ত '৮৮	২০·০০	২৭·০০
সূর্যের ঘ্রাণে ফেরা—হরিপদ দত্ত '৮৫	১৫·০০	২২·০০
পারাপার—শহীদুল হক '৮৫	১২·০০	১৬·০০
ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা—অজয় ভট্টাচার্য '৮৪	২০·০০	৩০·০০

ছোটগল্প

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
প্রথম প্রেম—রশীদ করীম '৮৪	১৩·০০	২০·০০
মহাপতঙ্গ (২য় সং)—আবু ইসহাক '৮৪	১৬·০০	২২·০০
মানুষ (২য় সং)—ইবরাহীম খাঁ	১৭·০০	২৪·০০
বিস্ফোরণ—মিরজা আবদুল হাই		১১·০০
নির্বাচিত গল্প—হাসান আজিজুল হক '৮৭	৪৮·০০	৬৮·০০
আত্মজা ও একটি করবী গাছ (৪র্থ সং)—হাসান আজিজুল হক '৮৫	১৬·০০	২২·০০
জীবন ঘষে আগুন (২য় সং)—হাসান আজিজুল হক '৮৫	১৮·০০	২৫·০০
খাতালে হাসপাতালে (২য় সং)—হাসান আজিজুল হক '৮৫	১৬·০০	২২·০০
নামহীন গোত্রহীন (২য় সং)—হাসান আজিজুল হক '৮৫	২০·০০	২৭·০০
ছায়া-প্রচ্ছায়া (২য় সং)—মিরজা আবদুল হাই '৮৪	১৭·০০	২৭·০০
বাজ—আবুল হাসানাত '৮৬	১৪·০০	২০·০০
মোঁফ সন্দেশ (২য় সং)—মাহবুব-উল-আলম		২·০০
হফিজন (৪র্থ সং)—মাহবুব উল-আলম		৬·০০
পায়াহ্ন যুথিকা—মুকবুলা মঞ্জুর		১১·০০
মমামি—জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী '৮৪	২৭·০০	৪০·০০
আগমন সংবাদ—মঈনুল আহসান সাবের '৮৪	১৫·০০	২৪·০০
অন্ধ তীরন্দাজ (২য় সং)—কায়েস আহমেদ '৮৭	২২·০০	৩০·০০
কারা যেন আসছে (২য় সং)—সৈয়দা লুৎফুন্নেসা '৮৫	১৪·০০	২০·০০
খানকৌড়ির রক্ত—আল মাহমুদ	১২·০০	১৮·০০
নিশাত আমি নরকে চলেছি (২য় সং)—শেখ আতাউর রহমান	১৩·০০	১৮·০০
সম্রাটের ছবি (৩য় সং)—আবদুল গাফফার চৌধুরী '৮৪	২৪·০০	৩৫·০০
অনির্বাচিত গল্প সংকলন (২য় সং)—আবুল ফজল '৮৪	৩৩·০০	৫০·০০
ললিহান সাধ (২য় সং)—শওকত আলী '৮৪	১৫·০০	২৫·০০
পোড়ামাটির গন্ধ—খালেদা এদিব চৌধুরী '৮৫	১৬·০০	২২·০০
দেশকাল—১ম খণ্ড—সুলতানা হক সম্পাদিত '৮৭		৭৫·০০
দেশকাল—২য় খণ্ড—সুলতানা হক সম্পাদিত '৮৭		৭৫·০০

ছোটগল্প

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজ প্রিন্ট	সাদা
অবিনাশী আয়োজন (২য় সং)—মঞ্জু সরকার '৮৯	৩০.০০	৪০.০০
একাত্তরের গল্প—এহসান চৌধুরী '৮৬	২০.০০	২৭.০০
ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প—কাজী ফজলুর রহমান '৮৮	২৪.০০	৩২.০০
সুখের ঠিকানা—আমিনা মাহমুদ '৮৮	১৫.০০	২০.০০
স্বপ্নলোক—আবু শাহ্‌রিয়ার '৮৮	১৮.০০	২৫.০০
বহ্নি—ডঃ আশীষ সেন '৮৮	২৪.০০	৩২.০০
অনধিকার (২য় সং)—সুব্রত বড়ুয়া '৮৮	২০.০০	৩০.০০
আত্মচরিত ও অন্যান্য গল্প—সুব্রত বড়ুয়া '৮৮	২২.০০	৩০.০০
জোনাকি শহর (২য় সং)—সুব্রত বড়ুয়া '৮৪	১৪.০০	২০.০০
জেল হাজতের মানুষ—ফজলুল কাশেম '৮৮	২৭.০০	৩৬.০০
গল্প নয়—আখতার ইমাম '৮৮	২৫.০০	৩৫.০০
জনশ্রুতি (২য় সং)—মহসিন শস্ত্রপানি '৮৮	৩৩.০০	৪৫.০০
বীরাঙ্গনার প্রেম—বিপ্রদাশ বড়ুয়া ৮৮	২৪.০০	৩২.০০
বঙ্গললনার আত্মকথা—ইউসুফ হায়দার '৮৮	৫.০০	৯.০০
বাক্সবন্দী সব—রেজাউর রহমান '৮৮	৩২.০০	৪৫.০০
বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটগল্প—আবুল হাসনাত সম্পাদিত		১৪০.০০

কাব্য-গ্রন্থ

বাংলাদেশের নির্বাচিত কবিতা—মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত '৮৯		১৪০.০০
শ্রেষ্ঠ কবিতা—আবদুল মান্নান সৈয়দ '৮৭	৪৫.০০	৬৫.০০
কুসুমের ফণা—মুহম্মদ নূরুল হুদা '৮৮		২৫.০০
নির্বাচিত কবিতা—মুহম্মদ নূরুল হুদা '৮৪		৪৫.০০
ফেরার সময়—ওমর আলী '৮৯		২৮.০০
যে তুমি আড়ালে—ওমর আলী '৮৭		২৪.০০
ডাকছে সংসার—ওমর আলী '৮৫		১৮.০০
শাসন নেই ধমক নেই—সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ '৮৭		২৪.০০
রোজ তোমাকে বেরুতে হয়—সাইয়িদ আতীকুল্লাহ '৮৭		২৪.০০
যদি কিছু পাই—সাইয়িদ আতীকুল্লাহ '৮৭		২৪.০০
একই টেবিলে দশজন—সাইয়িদ আতীকুল্লাহ '৮৭		২৪.০০

কাব্য-গ্রন্থ

	মূল্য লেখকপ্রিন্ট/লিউজপ্রিন্ট সাদা
কে বিতর্কিত কে তর্কাতীত—সৈয়দ হায়দার '৮৯	২৮·০০
ভূমধ্যসাগরে অন্ধঘূর্ণি যা বলুক—আলতাফ হোসেন '৮৭	২৪·০০
পতাকায় রক্তের দাগ—রবীন্দ্র গোপ '৮৭	২২·০০
অশ্বারোহী—মহফিল হক '৮৭	১৮·০০
আমার একজনই বন্ধু—হাবীবুল্লাহ সিরাজী '৮৭	২০·০০
পোশাক বদলের পালা—হাবীবুল্লাহ সিরাজী '৮৮	২২·০০
ভেঙে দাও নারকীয় দেয়াল—হালিম আজাদ '৮৭	২৪·০০
জ্যোৎস্না ও দুর্বিপাক—মাহমুদ আল জামান '৮৭	৩০·০০
পার্থ তোমার তীব্র তীর—খোন্দকার আশরাফ হোসেন '৮৬	২০·০০
অস্তিগড়ী গায়েন—নুরুল আরেফিন '৮৬	১৫·০০
ভূমিদাসের খেদ—নুরুল আরেফিন '৮৬	১৫·০০
পাথরগুলো দুঃখগুলো—নাসির আহমেদ '৮৬	২০·০০
দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে—আবুল হোসেন '৮৫	২০·০০
বাদুঘরে প্রজাপতি—আবু কায়সার '৮৫	১৮·০০
অবাধ্য অর্জুন—হাসান হাফিজ '৮৬	২০·০০
বৃথায় যুদ্ধের ঘোড়া—নাসিমা সুলতানা '৮৫	১৮·০০
শুভব্রত ও অন্যান্য কবিতা—জিনাত আরা রফিক '৮৫	১৮·০০
দুঃখ নয় দীর্ঘ পরিণাম—সানাউল হক খান '৮৫	১৮·০০
সেই নিশ্বাসগুচ্ছ—জাহিদুল হক '৮৯	২৫·০০
নীল দূতাবাস—জাহিদুল হক '৮৫	১৫·০০
হলুদ বিকেলের গান—সুব্রত বড়ুয়া '৮৫	১৮·০০
জয় হবে দীর্ঘশ্বাসে—শিহাব সরকার '৮৫	১৮·০০
ও বন্ধু আমার (৩য় সং)—নির্মলেন্দু গুণ '৮৪	১৬·০০
আনন্দ কুসুম—নির্মলেন্দু গুণ	১৫·০০
ফিরে আসে প্রাচীন পুরুষ—ইকবাল আজিজ '৮৯	২৮·০০
বাজুক লিরিক—মহাদেব সাহা '৮৪	১২·০০
কী সুন্দর অন্ধ ? (২য় সং)—মহাদেব সাহা	১৫·০০
দানব এসেছি কাছে (২য় সং)—মহাদেব সাহা	১৫·০০
তোমার পায়ের শব্দ (২য় সং)—মহাদেব সাহা '৮৪	১৪·০০

কাব্য-গ্রন্থ

	মূল্য লেখকপ্রিণ্ট/নিউজপ্রিণ্ট	মূল্য সাদা
এই গৃহ এই সন্ন্যাস (৩য় সং)—মহাদেব সাহা '৮৫		২৩·০০
পদ্মিনী শঙ্খিনী (২য় সং)—সানাউল হক		১৪·০০
ভলোকা হে নীল যমুনায়—শামসুল ইসলাম		৮·০০
বিত্ত নাই বেসাত নাই (৩য় সং)—আসাদ চৌধুরী '৮৭		২৫·০০
প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড় (২য় সং)—আসাদ চৌধুরী '৮৪		১৪·০০
তবক দেওয়া পান (৩য় সং)—আসাদ চৌধুরী '৮৭		২৫·০০
হে শিকারী অস্তিত্ব—হাসনা বেগম '৮৭		২৪·০০
ঝড় তুফানে—আশরাফ সিদ্দিকী		১০·০০
পঞ্চাশ বছরের প্রেমের কবিতা—ফরিদ কবির সম্পাদিত '৮৫		৬৫·০০
হৃদপিণ্ডে রক্তপাত—ফরিদ কবির '৮৫		২০·০০
আগুনে রেখেছি হাত—মোহাম্মদ সাদিক '৮৫		১৫·০০
ফেরারী—দিলারা হাশেম '৮৬		১০·০০
পূর্বাপর (২য় সং)—রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী '৮৮		৩৫·০০
তবুও বেঁচে আছি—আজিজুর রহমান আজিজ '৮৮		২০·০০
আমার শাঁসে তুমি—শাহেরা খাতুন বেলা '৮৮		২২·০০
আসন্ন বস্তিল ও অন্যান্য কবিতা—জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী '৮৮		২৮·০০
বেলা বাড়ে থিয়েটারে—আবু তাহের '৮৮		২২·০০
কলিযুগ ও অন্যান্য কবিতা—শিহাব সরকার '৮৮		২২·০০
তিমির হনন—আবদুর রশীদ খান '৮৮		২৮·০০
দিয়েছিল সকল আকাশ—রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ '৮৮		২৪·০০
হেমন্তের সোনালতা—আবুবকর সিদ্দিক '৮৮		২৮·০০
পথ কোন দিকে—খৈয়াম ওমর		২০·০০
মানচিত্র—আলাউদ্দিন আল আজাদ		৭·০০

নাটক

এই সেই কণ্ঠস্বর—মমতাজউদ্‌দীন আহমদ	২০·০০
রাজা অনুস্বারের পালা—মমতাজউদ্‌দীন আহমদ	৩০·০০

নাটক

	মূল্য লেবকপ্রিণ্ট/নিউজপ্রিণ্ট	পাবা
প্রথম বিবাহ স্যুটকেস—মমতাজউদ্দীন আহমদ '৮৭		৩২·০৩
ঘুড় পঞ্চদশ—মমতাজউদ্দীন আহমদ '৮৭		২০·০০
ক্ষতবিক্ষত—মমতাজ উদ্দীন আহমদ '৮৬		১৩·০০
জমীদার দর্পণ—মমতাজউদ্দীন আহমদ '৮৫		১৩·০০
ত্রাট্যত্রয়ী (২য় সং)—মমতাজউদ্দীন আহমদ		৯·০০
অববাহিকা—মামুনুর রশীদ '৮৬		১৩·০০
ইবলিশ (২য় সং)—মামুনুর রশীদ '৮৫		১৩·০০
ওরা আছে বলেই (৩য় সং)—মামুনুর রশীদ '৮৫		২০·০০
ওরা কদম আলী (৩য় সং)—মামুনুর রশীদ '৮৫		১৩·০০
কিনিপিগ (২য় সং)—মামুনুর রশীদ '৮৫		১৬·০০
এখানে নোঙর—মামুনুর রশীদ '৮৪		১২·০০
আনকার পালা—আবদুল্লাহ হেল মাহমুদ '৮৭		১২·০০
ঘাত পুরুষের গর্ব—আবদুল্লাহেল মাহমুদ '৮৫		১২·০০
তোমরাই—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৮		১৪·০০
ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার (২য় সং)—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৫		১২·০০
সেনাপতি (৩য় সং)—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৫		২৫·০০
এখনও ক্রীতদাস—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৪		১৩·০০
সুবচন নির্বাসনে (৫ম সং)—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৬		১২·০০
এখন দুঃসময় (৪র্থ সং)—আবদুল্লাহ আল মামুন		৯·৫০
এবার ধরা দাও (৩য় সং)—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৬		১৪·০০
অরক্ষিত মতিঝিল (২য় সং)—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৬		১৩·০০
আয়নায় বন্ধুর মুখ (২য় সং)—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৬		১৩·০০
চারদিকে যুদ্ধ (২য় সং)—আবদুল্লাহ আল মামুন '৮৬		১৩·০০
শাহজাদীর কালো নেকাব—আবদুল্লাহ আল মামুন		১২·০০
বিপথ—আবদুল্লাহ আল মামুন		৯·০০
ইংগিত—এস. এম. সোলায়মান '৮৫		১২·০০
দুটি পথ নাটক—মানুান হীরা '৮৫		১৩·০০
দু'টি নাটিকা—জিয়া হায়দার		৭·০০

নাটক

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
ভদ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ (২য় সং)—জিয়া হায়দার '৮৫		১৮'০০
আদর্শ স্বামী—আনিসুজ্জামান		১০'০০
সম্মেলন—আবদুল মতিন খান		১২'০০
মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (২য় সং)—আবদুল মতিন খান		৮'০০
বজ্রানলে ও লালু—আবদুল মতিন খান		১৩'০০
চোর চোর (২য় সং)—জিয়া আবসারী		৭'০০
চাপা পড়া মানুষ—আখতার হুসেন		৭'০০
লালন ফকির (২য় সং)—কল্যাণ মিত্র		১২'০০
বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটক—রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত '৮৮		১৩০'০০
শেষ নবাব—সাঈদ আহমদ '৮৯		৩০'০০
গৃহবাসী—ইনামুল হক '৮৯		২২'০০

স্মৃতি-চারণ

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন (৩য় সং)—আশরাফ সিদ্দিকী '৮৬	৩৭'০০	৫০'০০
স্মৃতির আয়নায় (১ম পর্ব)—ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী '৮৭		৩০'০০
স্মৃতির আয়নায় (২য় পর্ব)—ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী '৮৭		৩৫'০০
স্মৃতির আয়নায় (৩য় পর্ব)—ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী		৪০'০০
বিমান প্রাঙ্গণের পদাবলী—হালিমা সাত্তার '৮৭	২৫'০০	৩৫'০০
সীমান্তের সংলাপ—হালিমা সাত্তার '৮৭	৩৮'০০	৫৩'০০
সেই যে আমার ঘোলা রঙের দিনগুলি—মোবায়দা মীর্যা '৮৪	২৭'০০	৪০'০০
স্মৃতিকথা—উমরতুল কজল '৮৭	১৭'০০	২৫'০০
গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর—দেবেন সিকদার	২০'০০	৩০'০০
স্মৃতিকণা—তোফাজ্জল হোসেইন '৮৪	১৮'০০	২৭'০০
তাকিয়ে দেখি (২য় সং)—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী '৮৪	১৫'০০	২৪'০০
কবি দিদারুল আলম—ওহীদুল আলম		১৪'০০

গদ্য-রচনা

যৎকিঞ্চিৎ—শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী '৮৭	২২'০০	৩২'০০
অ্যাকাডেমিক শিরঃপীড়া ব্যুরোপ্যাথি অন্যান্য—করহাদ খান '৮৭	১৮'০০	২৫'০০
জীবন যখন যেমন (৩য় সং)—লুৎফর রহমান সরকার '৮৭	১৭'০০	২৫'০০

রম্য-রচনা

	মূল্য লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
চলচিত্রের খুঁটিনাটি—হাসান আজিজুল হক '৮৬	২৮·০০	৪০·০০
আইনের ফাঁকে—গাজী শামছুর রহমান '৮৭	৩৫·০০	
আদালতের কৌতুক (২য় সং)—গাজী শামছুর রহমান '৮৭	১০·০০	
দুর্জন উবাচ—২য় কাণ্ড—খোন্দকার আলী আশরাফ '৮৫	২৩·০০	৩০·০০
নেপথ্যে জনারণ্যে (২য় সং)—হোসনে আরা শাহেদ '৮৭	২৫·০০	৩৫·০০
পরদাদার ভ্রমণকাহিনী—আতাউর রহমান	১৭·০০	২৫·০০

অনুবাদ সাহিত্য

অনূদিত ছোটগল্প

বিশ্বের অনন্য গল্প—মোবারক হোসেন খান '৮৫	২৮·০০	৪০·০০
নির্বাচিত উর্দু গল্প (২য় সং)—মোস্তফা হারুণ		১৫·০০
এক টুকরো মিছরি—সা'দত হাসান মাণ্টো		১৫·০০
অনুবাদ : জাফর আলম		
মিস মালা—সা'দত হাসান মাণ্টো '৮৬	৩৩·০০	৪৫·০০
অনুবাদ : জাফর আলম		
মাণ্টোর শ্রেষ্ঠ গল্প—জাফর আলম	১৪·০০	২০·০০
ললিতা (২য় সং)—মুন্সী প্রেমচাঁদ	৫·০০	৯·০০
অনুবাদ : জাফর আলম		
বীরা—ইসমত চুগতাই	১৫·০০	২২·০০
অনুবাদ : জাফর আলম		
রিটার্ণ টিকেট (২য় সং)—খাজা আহমদ আব্বাস		৮·০০
অনুবাদ : জাফর আলম		
মিস নৈনিতাল (৩য় সং)—কৃষণ চন্দর '৮৫	২১·০০	৩০·০০
অনুবাদ : জাফর আলম		
নির্বাচিত গল্প-১ম খণ্ড—কৃষণ চন্দর '৮৬	১৮·০০	২৫·০০
অনুবাদ : এ.বি. এম. কামালউদ্দিন শামীম		

অনূদিত ছোটগল্প

	মূল্য লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
নির্বাচিত গল্প-২য় খণ্ড—কৃষণ চন্দর '৮৬	২০·০০	২৭·০০
অনুবাদ : এ. বি. এম. কামালউদ্দিন শামীম		
পাথেয়—মুন্সী প্রেমচান্দ '৮৭		
অনুবাদ : এ. বি. এম. কামালউদ্দীন শামীম	৩০·০০	৫৫·০০
স্মরণের রংধনু—কৃষণ চন্দর '৮৫	২০·০০	২৭·০০
অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম		
আধুনিক আরবী গল্প—আবদুস সাত্তার	৯·০০	১৪·০০
বিদেশী সেরা গল্প (২য় সং)—মোস্তাফিজুর রহমান '৮৫	২২·০০	৩০·০০
রাশিয়ার গল্প—মোস্তাফিজুর রহমান '৮৬	১৮·০০	২৮·০০
নির্বাচিত উর্দু গল্প—আবদুল হাফিজ		২৫·০০
আফ্রিকার গল্প (২য় সং)—করুণাময় গোস্বামী '৮৫	২২·০০	৩০·০০
মিখাইল শলোখভ : প্রথম জীবনের গল্প—খালিকুজ্জামান ইলিয়াস '৮৬	৩০·০০	৪৫·০০

অনূদিত কাব্যগ্রন্থ

ফাউস্ট—য়োহান ভোলফগাঙ ফন গ্যোতে '৮৬	১০০·০০	১৫০·০০
অনুবাদ : আহমদ ছফা		
রক্ত আর ফুলগুলি—তো হু		২৮·০০
অনুবাদ : নির্মলেন্দু গুণ		
রুবাইয়াৎ-এ হালী—খাজা আলতাফ হোসেন আনসারী		৪·০০
অনুবাদ : আবুল ফজল		
ত্রিবেণী—আবদার রশীদ, মুহম্মদ ইউনুস আলী ও তিতাস চৌধুরী '৮৫		২৮·০০

অনূদিত উপন্যাস

প্রত্যাগত—এরিখ মারিয়া রেমার্ক অনুবাদ : আবদুল হাফিজ '৮৭	৫০·০০	৭০·০০
অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট—এরিখ মারিয়া রেমার্ক		
অনুবাদ : আবদুল হাফিজ '৮৭	৪৫·০০	৬৫·০০

অনূদিত উপন্যাস

	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	মূল্য সাদা
পথ ফিরে চলে—কৃষণ চন্দর '৮৬	৩৩·০০	৪৫·০০
অনুবাদ : এ. বি. এম. কামালউদ্দিন শামীম		
কালারাণী (২য় সং)—কৃষণ চন্দর	১৮·০০	২৫·০০
অনুবাদ : এ. বি. এম. কামালউদ্দিন শামীম		
কালো পাখির হাজার রাত—কৃষণ চন্দর '৮৪	১৮·০০	২৪·০০
অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম		
কান্দার (৪র্থ সং)—কৃষণ চন্দর '৮৫	১৫·০০	২০·০০
অনুবাদ : আনোয়ারা বেগম		
কাবার আত্মকথা (২য় সং)—কৃষণ চন্দর	১৪·০০	১৯·০০
অনুবাদ : মোস্তফা হারুণ		
কাশ্মীর ফেরেশতে (৩য় সং)—সা'দত হাসান মাণ্টো	১৬·০০	২৩·০০
অনুবাদ : মোস্তফা হারুণ		
অন্নদাতা—কৃষণ চন্দর	৩·০০	৫·০০
অনুবাদ : জাফর আলম		
আমি গান্ধী বলছি—কৃষণ চন্দর		১৪·০০
অনুবাদ : মোস্তফা হারুণ		
কথা লেখক ও অশ্লীলতা (২য় সং)—সা'দত হাসান মাণ্টো		১২·০০
অনুবাদ : জাফর আলম		
চঞ্চল কি রানী—কৃষণচন্দর		
অনুবাদ : জাফর আলম	২২·০০	৩০·০০
একটি কাপড়া মকান (২য় সং)—কৃষণ চন্দর	৯·০০	১৪·০০
অনুবাদ : শফিকুর রহমান		
অন্তানের স্বীকারোক্তি—অমৃতা প্রীতম '৮৫	১৫·০০	২১·০০
অনুবাদ : শওকত ওসমান		
জানিয়া (২য় সং)—পি. লিদোভ		৯·০০
অনুবাদ : আহমদ ছফা		

যুক্তধারার বই ৭৩৫

অনূদিত নাটক

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
ওথেলো (২য় সং)—উইলিয়াম শেক্সপীয়ার '৮৪	২০.০০	৩৩.০০
অনুবাদ : মুনীর চৌধুরী ও কবীর চৌধুরী		
হ্যামলেট (৪র্থ সং)—উইলিয়াম শেক্সপীয়ার '৮৪	২৮.০০	৪২.০০
অনুবাদ : আবু শাহরিয়ার		
গডোর প্রতীক্ষায়—স্যামুয়েল বেকেট	১১.০০	১৬.০০
অনুবাদ : কবীর চৌধুরী		
এন্টিগণি (২য় সং)—সফোক্লিস		৯.০০
অনুবাদ : আবদার রশীদ		
ইলেকট্রা—সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস		১২.০০
অনুবাদ : আবদার রশীদ		
ছায়াহীন কায়া (২য় সং)—জাঁ পল সার্ত্র '৮৪		২৪.০০
অনুবাদ : আবদার রশীদ		
নিঃশব্দ নরকে (২য় সং)—জাঁ পল সার্ত্র		১১.০০
অনুবাদ : মোস্তাফিজুর রহমান		
খুন ঝরা বিয়ে—ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা		৫.০০
অনুবাদ : মোস্তাফিজুর রহমান		
হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার স্যাপার (২য় সং)—আন্তন চেখভ '৮৫		১২.০০
অনুবাদ : মমতাজউদ্দিন আহমদ		
চন্দর কোথায়—জর্জ শো'আবে		১২.০০
অনুবাদ : হাসান আজিজুল হক		
ট্রয়ের রমণীবৃন্দ—য়ুরোপিডাস '৮৭		৩৫.০০
অনুবাদ : জাহাঙ্গীর চৌধুরী		
সম্রাটের দ্বন্দ্ব—তাওফীক আল হাকীম '৮৭		২৫.০০
অনুবাদ : আবদুস সাত্তার		২৫.০০
কিং লিয়র—উইলিয়াম শেক্সপীয়র		
অনুবাদ : মফিজ চৌধুরী '৮৮	৩৬.০০	৪৮.০০

অনূদিত নাটক

	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	মূল্য সাদা
আইভানভ—আন্তন চেখভ অনুবাদ : মোবারক হোসেন খান		৯·০০

রচনাবলী

আবুহাবউদ্দীন রচনা সংগ্রহ	১৬·০০	২৪·০০

রোজনামচা

দুদিনের দিনলিপি (২য় সং)—আবুল কাশেম	২৭·০০	৪০·০০
লেখকের রোজনামচা (২য় সং)—আবুল কাশেম	২০·০০	৩০·০০
রাজবন্দীর রোজ নামচা (৩য় সং)—শহীদুল্লাহ কায়সার '৮৯	৪০·০০	৫৫·০০

ক্লাসিক সাহিত্য

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক

নীলদর্পণ		৪·৫০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

দুর্গেশনন্দিনী '৮৪	৯·০০	১৪·০০
কপালকুণ্ডলা	৫·৫০	৯·০০
মৃণালিনী '৮৪	১০·০০	১৪·০০
বিষবৃক্ষ	১০·০০	১৫·০০
ইন্দিরা (৩য় সং) '৮৮	১২·০০	১৬·০০
চন্দ্রশেখর (৩য় সং) '৮৮	১৬·০০	২২·০০
যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী	৪·৫০	৬·৫০
কৃষ্ণকান্তের উইল (৩য় সং) '৮৫	১৪·০০	২১·০০
দেবী চৌধুরাণী (২য় সং) '৮৫	১১·০০	১৬·০০
রজনী (৩য় সং) '৮৮	১২·০০	১৬·০০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ

কমলাকান্তের দপ্তর	৫·৫০	৯·৫০

মুক্তধারার বই ৭৩৭

মাইকেল মধুসূদনের নাটক

	মূল্য লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট সাদা
কৃষ্ণকুমারী '৮৪	১৩.০০ ২০.০০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক

সাজাহান (৪র্থ সং)	২২.০০ ৩৫.০০
বঙ্গনারী	৪.০০
সোরাব রুস্তম	৩.৫০

ভ্রমণ-কাহিনী

জার্মানীর জর্নাল (৩য় সং)—সৈয়দ আবুল মকসুদ '৮৭	২৮.০০ ৪০.০০
জাপানে—অন্নদাশঙ্কর রায় '৮৬	৪০.০০ ৫২.০০
পথে প্রবাসে—অন্নদাশঙ্কর রায় '৮৪	২৪.০০ ৩৫.০০
প্রবাসীর মন—বদরুদ্দোজা চৌধুরী '৮৬	৩০.০০ ৪৫.০০
দেশের নাম চীন—মহসিন শস্ত্রপাণি '৮৫	২৮.০০ ৪২.০০
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে (২য় সং)—সুরেশ চন্দ্র সাহা '৮৫	২২.০০ ৩৩.০০
বহ্নি বলয়—নীলিমা ইব্রাহিম '৮৫	১৩.০০ ১৭.০০
বিলায়েতনামা—আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ	১৩.০০ ১৮.০০
ঘুলগেরিয়া ভ্রমণ (২য় সং)—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক '৮৫	২৩.০০ ৩৫.০০
প্যারিস সুন্দরী (৩য় সং)—ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী	১০.০০
ওগো বিদেশিনী (৩য় সং)—আ. ন. ম. বজলুর রশীদ	২২.০০ ৩০.০০
সফরনামা (৩য় সং)—আবুল ফজল '৮৭	১৫.০৩
বন্দর থেকে বন্দরে (৩য় সং)—সাদাউল হক	১৩.০০ ২০.০০
পথের দেখা—সৈয়দ আবদুস সুলতান '৮৪	২৮.০০ ৪০.০০

শিকার কাহিনী

জানোয়ারের খাস মহল—আবদুর রহমান চৌধুরী	৩৭.০০ ৫০.০০
শিমুল তলার নরখাদক—আবদুর রহমান চৌধুরী	২৬.০০ ৩৫.০০
মানিগার নরখাদক—আবদুর রহমান চৌধুরী	২৬.০০ ৩৫.০০

মুক্তিযুদ্ধের বই

	মূল্য	
	লেখকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে (২য় সং)—রফিকুল ইসলাম '৮৬		১০০·০০
A Wale of Millions—Rafiqul Islam '86		২০০·০০
আমরা স্বাধীন হলাম (২য় সং)—কাজী সামসুজ্জামান '৮৬	৫৫·০০	৭৫·০০
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (৩য় সং)—যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	২৪·০০	৩২·০০
জাহানুম হইতে বিদায় (২য় সং)—শওকত ওসমান '৮৭	২৫·০০	৩৬·০০
খাঁচায় (২য় সং)—রশীদ হায়দার '৮৭	২৫·০০	৩৬·৫০
যুদ্ধজয়ের গল্প—বিপ্রদাশ বড়ুয়া '৮৫	১৮·০০	২৫·০০
হাওর নদী গ্রেনেড (২য় সং)—সেলিনা হোসেন '৮৪	২২·০০	৩০·০০
বাংলাদেশের গেরিলাযুদ্ধ (৩য় সং)—আবু সায়ীদ		১১·০০
জাগ্রত বাংলাদেশ (৪র্থ সং)—আহমদ ছফা	১২·০০	১৮·০০
বাংলাদেশ কথা কয় (৩য় সং)—আবদুল গাফফার চৌধুরী	২৫·০০	৩৫·০০
একাত্তরের গল্প—এহসান চৌধুরী '৮৬	২০·০০	২৭·০০
রক্তাক্ত মানচিত্র (৩য় সং)—আবদুল হাফিজ '৮৭	৩৫·০০	৫০·০০
ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প—কাজী ফজলুর রহমান '৮৮	২৪·০০	৩২·০০

পত্র-সাহিত্য

জীবনানন্দ দাসের পত্রাবলী—আবদুল মান্নান সৈয়দ '৮৭	২৫·০০	৩০·০০

কোষগ্রন্থ

বাংলা বিশ্বকোষ—১ম খণ্ড	১৫০·০০
বাংলা বিশ্বকোষ—২য় খণ্ড	২২৫·০০
বাংলা বিশ্বকোষ—৩য় খণ্ড	২০০·০০
বাংলা বিশ্বকোষ—৪র্থ খণ্ড	২২৫·০০
আবুল ফজলের এগারটি বই	২৭৫·০০
লাতখানা জনপ্রিয় ছোটগল্প গ্রন্থ	১৩০·০০

মুক্তধারার বই ৭৩৯

সুদৃশ্য প্যাকেট

	মূল্য লেবকপ্রিন্ট/নিউজপ্রিন্ট	সাদা
সাতখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস		১২০০০
আবদুল্লাহ আল মামুনের দশটি নাটক		১২৫·০০
মামুনুর রশীদের ছয়টি নাটক		৭৫·০০
মহাদেব সাহার পাঁচটি কবিতার বই		৮০·০০
মোহাম্মদ নাসির আলীর চারটি কিশোর সাহিত্য		৬৫·০০

আপনি কি বই উপহার দিতে চান

আপনার জন্যে রয়েছে সাত রকমের সদৃশ্য প্যাকেট
বিবাহ, জন্মদিন ও অন্যান্য উৎসবে
সুশোভন ও আকর্ষণীয় প্যাকেটে বই
উপহার দিন

মুক্তধারা

৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০ ফোন : ২৩১৩৭৪/২৩৫৩৩৩
বিক্রয়কেন্দ্র ২২ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০ ফোন : ২৫৯৮৬৭
চৌমুহনী নোয়াখালী ফোন : ৩৯৫১

সাহিত্যপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সম্পাদক : বিজলীপ্রভা সাহা

এতে থাকে : মননশীল প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, আলোচনা, বিতর্কিত বিষয়, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি।

দাম বার টাকা : বার্ষিক চাঁদা আটচল্লিশ টাকা

কার্যালয় : ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা ১১০০

২২ প্যারী দাস রোড ঢাকা ১১০০

ফোন : ২৩১৩৭৪/২৩৫৩৩৩/২৫৯৮৬৭

আনন্দ উপহার

আপনি বই উপহার দিতে চান। সমস্যা হলো—যাকে বই উপহার দেবেন তার কাছে যদি একই বই সংগ্রহ থাকে?

এ সমস্যার সমাধান হলো

মুক্তধারার আনন্দ কুপন কিনে উপহার দিন। আনন্দ কুপনের মাধ্যমে তিনি পছন্দমত বই সংগ্রহ করবেন।

বিভিন্ন মূল্য মানের আনন্দ কুপন রয়েছে—৫০০, ১০০০ ও ২৫০০ টাকা

১। মহামানবের মাধ্যমে আল্লার প্রথম বাণী ঃ পড়। —আল-কোরআন

২। বই সংগ্রহ করে আমরা আনন্দকেই সংগ্রহ করি। —ভিনসেন্ট স্টারেট

৩। বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক। —জসীমউদ্দীন

৪। মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫। কেবল বই পড়েই মানুষ তার পরিপূর্ণ জীবনের একটা ইঙ্গিত, একটা সঙ্কেত আভাস লাভ করতে পারে। —ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক

৬। চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি ? প্রথমত—বই পড়া এবং তার জন্য দরকার বই পড়ার প্রবৃত্তি। —সৈয়দ মুজতবা আলী

৭। বই কিনে কেউ কোনদিন দেউলে হয় না। —প্রমথ চৌধুরী

৮। বরং প্রচুর বই নিয়ে গরিব অবস্থায় চিলে কোঠায় থাকব, তবু এমন রাজা হতে চাই না যিনি পড়তে ভালবাসেন না। —মেকলে

৯। জীবনকে বুঝতে হলে, অভ্যাসের সংস্কারের বেড়া ভাঙতে হলে বই চাই। —সরোজ আচার্য

১০। একটি ভাল বই বর্তমান ও চিরদিনের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু।
—টুপার

১১। জীবনে মাত্র তিনটে জিনিসের প্রয়োজন—বই, বই এবং বই।
—লিও টলস্টয়

১২। ব্যায়ামের দ্বারা যেমন শরীরের উন্নতি হয়, তেমনি পড়াশোনার দ্বারা মনের উন্নতি হয়ে থাকে। —এডিসিথ

১৩। দুঃখ দুর্দশাগ্রস্তদের কাছে বই প্রিয় ও মধুর সঙ্গীতের মত।
—অলিভার গোল্ডস্মিথ

১৪। আমার মধ্যে উত্তম বলে যদি কিছু থাকে তার জন্যে আমি বইয়ের কাছেই ঋণী। —ম্যাক্সিম গোর্কি

১৫। বই আমাদের জীবনকে উপভোগ করতে সহায়তা না করলেও জীবনকে অদ্ভুত সহ্য করতে শিক্ষা দেয়। —অলিভার গোল্ডস্মিথ

একুশের গ্রন্থমেলায় মুক্তধারার বই

উপন্যাস

রশীদ করীম
মায়ের কাছে যাচ্ছি
সরদার জয়েনউদ্দীন
কদম আলিদের বাড়ি
দিলারা হাশেম
শঙ্খ করাত
গোপাল হালদার
একদা/অন্যদিন
শওকত ওসমান
ক্রীতদাসের হাসি (৮ম সং)
সেলিনা হোসেন
জলোচ্ছ্বাস (২য় সং)
হরিপদ দত্ত
অজগর—১ম খণ্ড
পার্ল এস. বাক
মা

ছোটগল্প

হাসনাত আবদুল হাই
নির্বাচিত গল্প
রাবেয়া খাতুন
নির্বাচিত গল্প
হাসান আজিজুল হক
আমরা অপেক্ষা করছি
রফিকুল্লাহ খান সম্পাদিত
হাসান হাফিজুর রহমানের
অপ্রকাশিত গল্প
মীর নুরুল ইসলাম
স্বৈরিণী ফিরে এসো
নাজমা জেসমিন চৌধুরী
মেঘ কেটে গেলে
রিপ্রদাশ বড়ুয়া
স্বপ্ন মিছিল
মঞ্জু সরকার
অবিনাশী আয়োজন (২য় সং)
জাফর তালুকদার
ইন্দোনেশিয়ার গল্প

সমালোচনা সাহিত্য

মোবাশ্বের আলী
রবীন্দ্রনাথ : অন্তরঙ্গ আলোকে
নজরুল প্রতিভা (৩য় সং) ঐ
গোপাল হালদার
ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা (৫ম সং)
অন্নদাশংকর রায়
টলস্টয়

প্রবন্ধ সাহিত্য

আবু জোবের
সাহিত্যের দিগন্ত
মুহম্মদ নূরুল হুদা
রবীন্দ্র প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
আলী রীয়াজ
গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম
মমতাজউদ্দীন আহমদ
সাহসী অথচ সহাস্য

চিকিৎসা বিজ্ঞান

ডা; এস. খলিলউল্লাহ
মধ্যবয়স ও বার্ধক্যে স্বাস্থ্য পরিচর্যা
ডাঃ বরেন চক্রবর্তী
আরো বেশি দিন বাঁচুন
এ. বি. এম. জামাল
চিকিৎসা বিজ্ঞানের মজার কথা

কাব্যগ্রন্থ

মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত
বাংলাদেশের নির্বাচিত কবিতা
মহাদেব সাহা
নির্বাচিত কবিতা
সৈয়দ হায়দার
কে বিতর্কিত কে তর্কাতীত

রোজনামচা

শহীদুল্লাহ কায়সার
রাজবন্দীর রোজনামচা

কাব্যগ্রন্থ

ফয়েজ আহমদ
আধুনিক চীনা লিরিক
ওমর আলী
ফেরার সময়
জাহিদুল হক
সেই নিশ্বাসগুচ্ছ
ইকবাল আজিজ
ফিরে আসে প্রাচীন পুরুষ
শামসুল ইসলাম
নষ্ট চন্দ্রার চাঁদ

নাটক

সাঈদ আহমদ
শেষ নবাব
শেখ আকরাম আলী
নাট্য চতুরঙ্গ
ইনামুল হক
গৃহবাসী
আবদুল্লাহ আল মামুন
ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার(৩য় সং)
সুবচন নির্বাচনে (ষষ্ঠ সং)
এখন দুঃসময় (৫ম সং)
এবার ধরা দাও (৪র্থ সং)
অরক্ষিত মতিঝিল (৩য় সং)
আয়নায় বন্ধুর মুখ (৩য় সং)
শপথ (২য় সং)
সেনাপতি (৪র্থ সং)
মামুনুর রশীদ
ওরা আছে বলেই (৩য় সং)

ছোটদের বই

কিশোর বিজ্ঞান

আলী আসগর
বিজ্ঞান আন্দোলন
আনোয়ার করিম খান
এসো অজানার রাজ্যে

কিশোর গল্প

মঈনুল আহসান সাবের
লালবাড়ির অদ্ভুত ভূত
সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
গল্পে শেক্সপীয়ার (৫ম সং)
নাজম আস সাকীব
কিশোর সোভিয়েত গল্প

কিশোর জীবনী

আলী ইমাম
আলোর পাখি
কানাইলাল রায়
ছোটদের বঙ্কিমচন্দ্র
ছোটদের শৎচন্দ্র (২য় সং)
প্রণব চৌধুরী
ছোটদের মধুসূদন

ছড়া

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন
তাধিন ধিনতা
সুজন বড়ুয়া
বাড়ির সঙ্গে আড়ি (২য় সং)
মাহমুদউল্লাহ
নিরালা দুপুর
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
একাত্তরের দত্যি
জাহানারা জামান
মন হারানোর দেশে

প্রশ্ন কমন, উচ্চ নম্বর এবং পরীক্ষায়
নিশ্চিত সাফল্যের জন্য
কথাকলির সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী
বই পড়ুন

H. S. ENGLISH DIGEST
[PAPER I & II]
FAZLEY RABBI & RAHMAN

* উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা ডাইজেস্ট
[১ম ও ২য় পত্র]
মতিয়ার রহমান ও এইচ. রশিদ

* THE BEST GUIDE TO H. S. C. ENGLISH
[PAPER I & II]
M. A. KHALEQUE & HOSEN ARA

BEST GUIDE SERIES

* A KEY TO SUCCESS IN
পৌরনীতি/অর্থনীতি/ইসলামের ইতিহাস/
মুসলমানদের ইতিহাস/রসায়ন গাইড/
জীববিজ্ঞান গাইড

কথাকলি
গাইবান্ধা ও ঢাকা

বিউটি বুক হাউস প্রকাশিত সৃজনশীল বই

গল্প ও উপন্যাস

শামসুর রাহমান
আক্টোপাস ৪০.০০
শওকত ওসমান
চৌরসন্ধি ৫০.০০
বিগত কালের গল্প ৩৫.০০
হুমায়ুন আহমেদ
একা একা ৩০.০০
প্রথম প্রহর ৩০.০০
নক্ষত্রের রাত ৪০.০০
রজনী ৪০.০০
ইমদাদুল হক মিলন
কথা ছিলো ১০০.০০
প্রেমের গল্প ৩০.০০
দুজনে ৩৫.০০
আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন
ফুলবানু ২৫.০০
রেবার প্রেমকথা ৩০.০০
রম্য গল্প (প্রথম খণ্ড) ২৫.০০
রম্য গল্প (দ্বিতীয় খণ্ড) ২৫.০০
শেখ আবদুর রহমান
আমার একজন বন্ধু দরকার ৩০.০০
হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ
আসা যাওয়ার পথের ধারে ৪০.০০
মোবারক হোসেন খান অনূদিত
পৃথিবীর সেরা গল্প ৫০.০০
সাকিলা সাইফুল্লাহ
নীল বেদনায় ছোঁয়া ৩০.০০
আখতার-উন-নবী অনূদিত
কৃষণ চন্দর প্রেমের গল্প/৫০ ২৫.০০
আলী ইমাম
রক্ত দিয়ে কেনা ৪০.০০
লুৎফর রহমান রিটন
অন্ধকারে ২৫.০০
সাইফুল্লাহ্ মাহমুদ দুলাল
তুমি ৩০.০০

কবিতা

শামসুর রাহমান
দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে ৩০.০০
বুকতার বাংলাদেশের হৃদয় ৩০.০০
অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই ৩০.০০
উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ ৩০.০০
স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার ৩০.০০
শূন্যতায় তুমি শোক সভা ৩০.০০
যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে ৩০.০০
এক ফোঁটা কেমন অনল ৩০.০০
ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ ৩০.০০
শামসুর রহমানের প্রেমের কবিতা ১০০.০০
আসাদ চৌধুরী
দুঃখীরা গল্প করে ২৫.০০
রফিক আজাদ
অঙ্গীকারের কবিতা ২০.০০
নির্মলেন্দু গুণ ০
দুরূহ দুঃশাসন ২০.০০
শান্তির ডিক্রি ৩০.০০
নেই কেন সেই পাখি ৩০.০০
দুঃখ করো না, বাঁচো ২৫.০০
নির্মলেন্দুগুণের রাজনৈতিক কবিতা ৮০.০০

ছোটদের বই

উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী
গুপী গাইন বাঘা বাইন ১৫.০০
মোহাম্মদ নাসির আলী
গদাধরের উইল ২০.০০
হামিদুল ইসলাম সম্পাদিত
বাংলার শ্রেষ্ঠ রূপকথা ২৫.০০
দাদুমনির ঝুলি ২৫.০০
দম ফাটানো হাসির গল্প ২৫.০০
শ্রেষ্ঠ বাণী ৬০/৪০.০০
ডেল কার্নেগী
বড় যদি হতে চান ২০.০০

বিউটি বুক হাউস

৩৭ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ ফোন : ২৩৩৩৬০

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে
অংশ গ্রহণের মাধ্যমে
আমরা আমাদের ভূমিকা
পালন করছি।

প্রগতিশীল
ব্যাংকিং-এ
আমরা উৎসাহী

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

কি উপহার দিচ্ছেন ?

১। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে বেশ কিছু উৎসব ও অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পুরস্কার বিতরণী সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—এ ধরনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

২। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসাবে ফ্লাস্ক, টি-সেট, প্লেট, তোয়ালে, কাপ, শিল্ড ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

৩। এ সকল দ্রব্য আপাতদৃষ্টিতে মনোহর মনে হলেও পুরস্কার হিসাবে এগুলো প্রদান সঙ্গত এবং উপযোগী কি-না তা বিবেচনার অবকাশ আছে।

৪। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন: দেশের আর্থ-সামাজিক দূরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমেই প্যাঁস-বিমুখ হতে চলেছে। বইয়ের প্রতি তাদের অনীহা লক্ষ্য করে দেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রই উদ্‌বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন।

৫। ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনেও বিবাহ, জন্মদিন, আকিকা প্রভৃতি উৎসবে উপহার দেওয়া হয়।

৬। জনগণকে গ্রন্থমনা করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের মন-মানসিকতার সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের মনে হয়: যে কোনো অনুষ্ঠানে বই এবং শুধু বই-ই পুরস্কার ও উপহার দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭। আপনাদের দেশপ্রেম ও শিক্ষানুরাগের কাছে আমাদের আবেদন: সমাজের ক্রমাবনতির দিকে লক্ষ্য রেখে এবং দেশবাসীর মনের পরিবর্তনের কথা ভেবে এখন থেকে যত বেশি সম্ভব তাঁদের বইয়ের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিন।

৮। দেশের সর্বত্রই আমাদের এজেন্ট আছেন। তাই আমাদের কাছে সরাসরি বইয়ের অর্ডার না দিয়ে আপনাদের এলাকার এজেন্টের দোকান থেকে আপনাদের পছন্দ মত বই বাছাই করে কেনার অনুরোধ জানাচ্ছি।

৯। পরিশেষে পুনরায় আমাদের মিনতি, যে-কোনো অনুষ্ঠানে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হোক:

বই বই আর বই

মুক্তধারার
গ্রন্থ-পরিবেশকদের তালিকা

ঢাকা মহানগরী

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

দীপিকা
২১/২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

ফেয়ারডিল
১৮৪ গুলশান নিউ মার্কেট, ঢাকা।

ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

আদর্শ প্রকাশনী
২১/২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

সাহিত্য কোষ
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুক্তধারা
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

রূপসী বাংলা লিঃ
১৩৬/৪ নয়াটোলা, ঢাকা।

ইস্ট বেঙ্গল বুক হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

পুথিনিলয়
৫২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

মুক্তধারা
২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি
১৫০ ঢাকা নিউমার্কেট, ঢাকা।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি
১৫০ নিউ মার্কেট, ঢাকা।

কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা।

নিউ বিশ্ব বিচিত্রা
৫৯ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

বিশ্ব পরিচয়
বাংলাবাজার, ঢাকা।

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

গ্রীণ লাইব্রেরী
দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা।

নন্দন প্রকাশন
১৫/২ তোপখানা রোড, ঢাকা।

সাদেক বুক ডিপো
নিউ মার্কেট, ঢাকা।

পুথিভবন
প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

কারেন্ট বুক সাপ্লাই
৯০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার, ঢাকা।
নিউ মার্কেট, ঢাকা।

সবুজ লাইব্রেরী
১৫৯ নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা।

মেসার্স নাতেকিয়া লাইব্রেরী
৩/৯/১মীরপুর, সেকসন এ ঢাকা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
৫/সি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসংস্থা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
সবুজ বুকস্ এণ্ড স্টেশনারী
২৬ চামেলীবাগ
শান্তিনগর, ঢাকা।
মেসার্স নলেজ হোম
১৪৬ নিউ মার্কেট
ঢাকা।
মেসার্স আইডিয়াল লাইব্রেরী
১৮০-১৮১ নিউমার্কেট
ঢাকা।
মেসার্স বর্ণ বিচিত্রা
প্যারীদাস রোড, ঢাকা।
মেসার্স ডানা পাবলিশার্স
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।
বইঘর
প্যারীদাস রোড, ঢাকা।
নবীন প্রকাশনী
প্যারীদাস রোড, ঢাকা।
নভেল হাউস
১৬৮ নিউ মার্কেট, ঢাকা।
বই জগৎ
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
পুস্তক বিতান
প্যারীদাস রোড, ঢাকা।
প্যারাগণ বুক এজেন্সী
১৩/৫ আউটার সার্কুলার রোড
ঢাকা।
সাহিত্য সম্ভার
বাংলাবাজার, ঢাকা।
আলীগড় লাইব্রেরী
১৫৮ নিউ মার্কেট, ঢাকা।
বাংলাবাজার, ঢাকা।
জলী পুস্তকালয়
বাংলাবাজার, ঢাকা।
বিক্রমপুর বুক হাউস
মগবাজার ঢাকা।
আনন্দ পাবলিশার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা।
প্রগতি প্রকাশন
মগবাজার, ঢাকা।

গাজীপুর জেলা

এন, আই, ভূইয়া
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

ভাষা ও কথা
১/১১ ডি, আই, টি, মার্কেট
নারায়ণগঞ্জ।
সাহিত্য মালা
১/৪ ডি, আই, টি, মার্কেট
নারায়ণগঞ্জ।

নরসিংদী জেলা

বুকমার্ট, নরসিংদী।

মুন্সীগঞ্জ জেলা

অন্বেষা, মুন্সীগঞ্জ।

মানিকগঞ্জ জেলা

পপুলার লাইব্রেরী
মানিকগঞ্জ।

প্রগতি ট্রেডার্স
বড়াইল, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।

চট্টগ্রাম জেলা

দি তাজ লাইব্রেরী
১১ আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

সুপ্রীম লাইব্রেরী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

জনতা বুক হাউস
১৫৫ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

পাঠক বন্ধু লাইব্রেরী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

কথাকলি
মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

বিতরণী লাইব্রেরী
আঞ্জুমান বিপনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মডার্ণ লাইব্রেরী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রগতি ট্রেডার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মিল্লাত লাইব্রেরী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

বুক অরবিট
বিপনী বিতান, চট্টগ্রাম।

রাজশাহী জেলা

বুকস প্যাভেলিয়ন
নিউমার্কেট, রাজশাহী।

রাজশাহী জেলা

বইপত্র
নিউ মার্কেট, রাজশাহী।

বীনাপাণি বুকডিপো
২০ সমবায় সুপার মার্কেট
রাজশাহী।

ইম্পিরিয়াল বুক ডিপো
রাজশাহী।

আলীগড় লাইব্রেরী
মালোপাড়া, রাজশাহী।

নবাবগঞ্জ জেলা

জামান বুক হাউজ
দাউদপুর রোড, নবাবগঞ্জ।

খুলনা জেলা

সাহিত্য সন্ধানী, খুলনা।

নিউজ কর্ণার, খুলনা।

নিউ বুক এজেন্সী,
কে. ডি. ঘোষ রোড, খুলনা।

ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং হাউজ
খুলনা।

দৌলতপুর বুক ডিপো
দৌলতপুর, খুলনা।

সাতক্ষীরা জেলা

জাহান লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।

কোরাণ মঞ্জিল
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বাগেরহাট জেলা

আল আমিন লাইব্রেরী
বাগেরহাট।

প্যারাডাইস লাইব্রেরী
মোড়লগঞ্জ বাগেরহাট।

নওগাঁ জেলা

কিশোর লাইব্রেরী, নওগাঁ।
আনন্দমেলা, নওগাঁ।

ময়মনসিংহ জেলা

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
রামবাবু রোড, ময়মনসিংহ।
রহমানিয়া লাইব্রেরী
রামবাবু রোড, ময়মনসিংহ।
পারুল লাইব্রেরী
গাঙ্গিনার পাড়, ময়মনসিংহ।
কবীর লাইব্রেরী
গাঙ্গিনার পাড়, ময়মনসিংহ।
শাহজাহান লাইব্রেরী
গাঙ্গিনার পাড়, ময়মনসিংহ।
সংকলন
সি. কে. ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ।
ওসমানী এণ্ড কোং
৩৪ স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ।
বই বিতান
সি. কে. ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ।
বই বিচিত্রা
রামবাবু রোড, ময়মনসিংহ।
বাণী বুক ডিপো
শাখারী পট্টি, ময়মনসিংহ।
মিতালী লাইব্রেরী
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
মতি লাইব্রেরী
রামবাবু রোড, ময়মনসিংহ।

কিশোরগঞ্জ জেলা

কিশোর বুক হাউস
নিউ মার্কেট, কিশোরগঞ্জ।

জামালপুর জেলা

তারকা বুক স্টোর
স্টেশন রোড, জামালপুর।
ওরিয়েন্টাল বুক ডিপো
জামালপুর।

টাঙ্গাইল জেলা

আদর্শ পুস্তকালয়
টাঙ্গাইল।
আহমদিয়া লাইব্রেরী
টাঙ্গাইল।

কুমিল্লা জেলা

নিউ আইডিয়াল লাইব্রেরী
কুমিল্লা।
শাহীন গ্রন্থাগার
নিউ মার্কেট, কুমিল্লা।
প্যানোরমা বই বিপনী
ভিকটোরিয়া কলেজ রোড, কুমিল্লা।
মেসার্স বই নিকেতন
কুমিল্লা।

চাঁদপুর জেলা

কিশোর লাইবেরী, চাঁদপুর।
তাজমহল লাইব্রেরী
চাঁদপুর।
আজাদ লাইব্রেরী
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা

ফয়েজ লাইব্রেরী
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

নোয়াখালী জেলা

পুথিঘর লিঃ
চৌমুহনী, নোয়াখালী।

শাহজাহান বুক স্টোর্স
মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।

তাজ লাইব্রেরী
চৌমুহনী, নোয়াখালী।

জ্ঞানালোক
বসুর হাট, নোয়াখালী।

বুক সোসাইটি
চাটখিল নোয়াখালী।

গ্রন্থালোক
হাতিয়া, নোয়াখালী।

লক্ষ্মীপুর জেলা

কোহিনুর লাইব্রেরী
রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

হক লাইব্রেরী
দত্তপাড়া, লক্ষ্মীপুর।

ফেনী জেলা

শাহজাহান লাইব্রেরী
স্টেশন রোড, ফেনী।

সুমিতা লাইব্রেরী
ফেনী।

ফিরোজ লাইব্রেরী
স্টেশন রোড, ফেনী।

সবুজ লাইব্রেরী
ফেনী।

সিলেট জেলা

প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী
জিন্দাবাজার, সিলেট।

সিলেট জেলা

জনতা লাইব্রেরী
আম্বরখানা, সিলেট।

বন্ধু লাইব্রেরী
সিলেট।

আদর্শ লাইব্রেরী
জিন্দাবাজার, সিলেট।

বইঘর
সিলেট।

মৌলভীবাজার জেলা

শ্রীলক্ষ্মী লাইব্রেরী
মৌলবীবাজার।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
মৌলভী বাজার।

পপুলার লাইব্রেরী
কুলাউড়া, মৌলভী বাজার।

কায়সার ট্রেডার্স
আদালত সড়ক, মৌলভী বাজার।

সুরমা রেলওয়ে বই বিতান
কুলাউড়া রেল স্টেশন, মৌলভী বাজার।

মোবারক লাইব্রেরী এণ্ড স্টেশনারী
বরমচাল বাজার, মৌলভী বাজার।

চন্দ্রনাথ লাইব্রেরী
মৌলভী বাজার।

রংপুর জেলা

রেলওয়ে বুকস্টল
বদরগঞ্জ, রংপুর।

ইস্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী
স্টেশন রোড, রংপুর।

রংপুর জেলা

টাউন স্টোর্স
স্টেশন রোড, রংপুর।

বিপনী বিচিত্রা
স্টেশন রোড, রংপুর।

কোহিনূর লাইব্রেরী
স্টেশন রোড, রংপুর।

কুড়িগ্রাম জেলা

বাংলাদেশ লাইব্রেরী
বাজার রোড, কুড়িগ্রাম।

আদর্শ লাইব্রেরী
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

গাইবান্ধা জেলা

টাউন লাইব্রেরী
স্টেশন রোড
গাইবান্ধা।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
গাইবান্ধা।

নীলফামারী

বুক সেন্টার
বড় মসজিদ রোড
নীলফামারী।

বগুড়া জেলা

নিউ সাহিত্য ভবন
চাঁদনী বাজার, বগুড়া।

মোহাম্মদী বুকস্টল
বগুড়া।

মঞ্জিলে কোরআন লাইব্রেরী
শেরপুর, বগুড়া

জয়পুরহাট জেলা

স্টুডেন্টস লাইব্রেরী
জয়পুরহাট।

পাবনা জেলা

গ্রন্থ অন্বেষা
স্টেশন রোড, ঈশ্বরদী, পাবনা।

শাহনাজ বুক কর্ণার
আতাইকুলা রোড, পাবনা।

পাবনা বুক ডিপো
বেনিয়াপট্টি রোড, পাবনা।

সানরাইজ বুক ডিপো
পাবনা।

বরগুণা জেলা

পূর্বাশা লাইব্রেরী
বেতাগী, বরগুণা।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
বরগুণা।

সিরাজগঞ্জ জেলা

উল্কা লাইব্রেরী
বাহিরগোলা সড়ক, সিরাজগঞ্জ।

আজাদ লাইব্রেরী
সিরাজগঞ্জ।

দিনাজপুর জেলা

নেহার লাইব্রেরী
নিমতলা, দিনাজপুর।

নূরন্নবী লাইব্রেরী
দিনাজপুর।

ব্রাদার্স লাইব্রেরী এণ্ড পাবলিকেসন্স
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

দিনাজপুর জেলা

টাউন লাইব্রেরী এণ্ড স্টেশনারী
সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

ঠাকুরগাঁও জেলা

পুথিঘর, ঠাকুরগাঁও।

টাউন লাইব্রেরী
ঠাকুরগাঁও।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
ঠাকুরগাঁও।

যশোর জেলা

হাসান বুক ডিপো
দড়াটানা রোড, যশোর।

কোহিনুর লাইব্রেরী
মুজিব সড়ক, যশোর।

আল হেলাল লাইব্রেরী
কেশবপুর বাজার, যশোর।

কুষ্টিয়া জেলা

সংবাদ বিতরণী, কুষ্টিয়া।

লিয়াকত বুক ডিপো
এন. এস রোড়, কুষ্টিয়া।

আরাফাত লাইব্রেরী
৩৯ আবদুল ওয়াহেদ সুপার মার্কেট
এন. এস. রোড, কুষ্টিয়া।

নিউ কথাকলি
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

হাসান বুক ডিপো
কুষ্টিয়া।

কুষ্টিয়া জেলা

কিশলয়
কুমারখালি, কুষ্টিয়া।

রোকেয়া স্টোর এণ্ড লাইব্রেরী
কুষ্টিয়া।

বই জগৎ
কুষ্টিয়া।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
কুষ্টিয়া।

হবিগঞ্জ জেলা

সুলতানিয়া লাইব্রেরী
হবিগঞ্জ।

লালমনির হাট জেলা

কিশোর লাইব্রেরী
লালমনির হাট।

নাটোর জেলা

পুথিমেলা, নাটোর।
পাক লাইব্রেরী, নাটোর।

নেত্রকোনা জেলা

বর্ণমালা গ্রন্থালয়
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।

ভ্যারাইটী স্টোর্স
ছোটবাজার, নেত্রকোনা।

হাসেমিয়া লাইব্রেরী
ছোটবাজার, নেত্রকোনা।

সুধাময়ী লাইব্রেরী
ছোটবাজার, নেত্রকোনা।

বরিশাল জেলা

অরিয়েন্টাল বুক ডিপো
সদর রোড, বরিশাল।
বুক ভিলা
সদর রোড, বরিশাল।
বই বিচিত্রা
লাইন রোড, বরিশাল।
আনন্দধারা
সদর রোড, বরিশাল।
নিউ বুক সেন্টার
সদর রোড, বরিশাল।
পুথি সমাহার
গৌরনদী, বরিশাল।
বাণী বিতান লাইব্রেরী
৪৪ সদর রোড, বরিশাল।

ঝালকাঠি জেলা

বইঘর, ঝালকাঠি।

পটুয়াখালী জেলা

বীণাপাণি লাইব্রেরী, পটুয়াখালী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা

বই মেলা, চুয়াডাঙ্গা।

গোপালগঞ্জ জেলা

মডার্ণ বুক হাউস
গোপালগঞ্জ।
মডেল বুক হাউস
গোপালগঞ্জ।

ঝিনাইদহ জেলা

মুক্তি বুক হাউস
ঝিনাইদহ।

ভোলা জেলা

জাহাঙ্গীর লাইব্রেরী
ভোলা।
প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ভোলা।
বাবুল লাইব্রেরী
ভোলা।

ফরিদপুর জেলা

বই বিতান
চকবাজার, ফরিদপুর।
ইসলামিয়া বুক ডিপো
চক বাজার, ফরিদপুর।
আল হিলাল লাইব্রেরী এণ্ড স্টোর্স
ফরিদপুর।

পিরোজপুর

বুক হাউস
কাউখালী, পিরোজপুর।

শেরপুর জেলা

সরস্বতী লাইব্রেরী
শেরপুর।

রাজবাড়ী জেলা

সাহিত্য বিতান এণ্ড স্টোর্স
রাজবাড়ী।

মাগুরা জেলা

সঞ্চিতা
মাগুরা।

জহরলাল সাহা ৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রভাংশুরঞ্জন সাহা ঢাকা প্রেস ৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০ বাংলাদেশ কর্তৃক মুদ্রিত।